ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য

মধ্যম খণ্ড

মহিষাসুর বধ

মণিপুর ও অনাহত

স্বামী যোগানন্দ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য।

মধ্যম খণ্ড

[মধ্যম চরিত্র—জ্ঞান লাভ]

"তমসো মা জ্যোতি র্গময়"—তমোরূপ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, আমাকে জ্ঞানময় দিব্য জ্যোতিঃতে প্রতিষ্ঠিত কর।
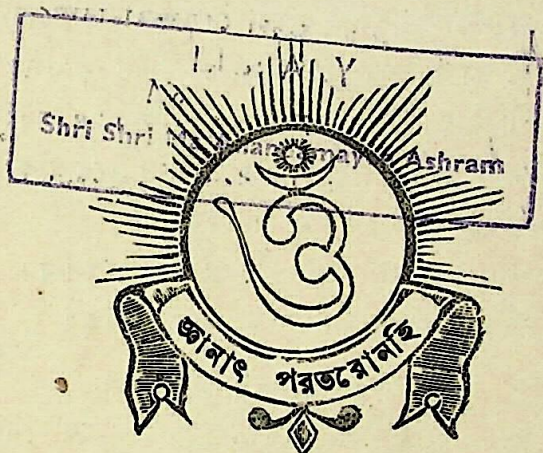
স্বামী যোগানন্দ প্রণীত

পারোহিল যোগাশ্রম হইতে
সেবক বিশ্বেশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য দুই টাকা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ!

প্রার্থনা !!

হে করুণাময়ী জগজ্জননি মা!

তোমারই অপার স্নেহ এবং করুণার বলে, তোমার মধ্যম চরিত্রের "তত্ত্ব-সুধা" তোমারই ইচ্ছায় জীব-জগতের কল্যাণার্থে প্রকাশিত হইল। মা! তুমি স্বভাব-সুলভ প্রেম-করুণা বিতরণ করিয়া, তোমার ত্রিতাপ দগ্ধ সন্তান-গণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেও—তাহারা তোমার জ্ঞানে ও প্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমারই কৃতিসন্তান-রূপে পরিণত হউক।—তোমারই মহিমা ও মধুরীমা আস্বাদন পূর্ব্বক, তাঁহারা বিশ্ব-হিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হউক। জয় মা আনন্দময়ী ॥

মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥

তোমারই কৃপাভিখারী দীন—
যোগানন্দ

মন্তব্য—"শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য" গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় নূতন তত্ত্ব ও রহস্যাদি অলৌকিক দৃষ্টান্ত সহ সন্নিবিষ্ট হইল। এরূপ দার্শনিক ও যৌগিক তত্ত্বমূলক বিশিষ্ট গ্রন্থের নূতন সংস্করণ হওয়া বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজের অগ্রগতির লক্ষণ এবং সুসংবাদও বটে।

নিউ মদন প্রেস, ৯৫, বেচু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
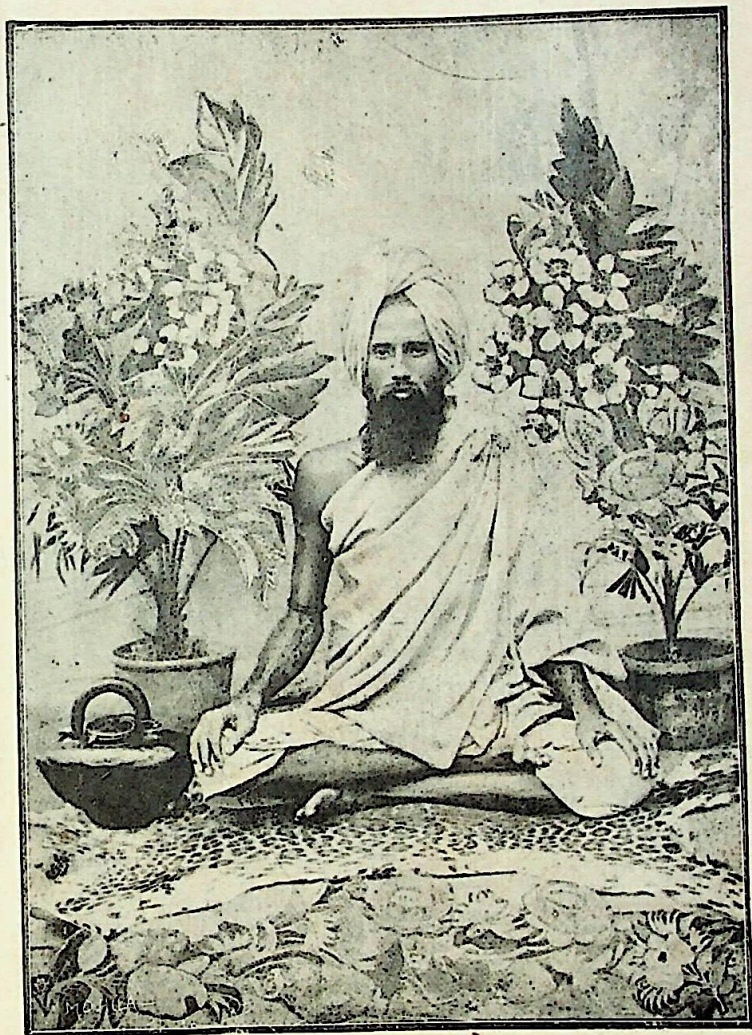
শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ

কুণ্ডলিনী জাগরণী

(গৌরি) ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ (একতালা)

জাগো কুল কুণ্ডলিনী।

(আমার দেহ মধ্যে মা) (ভারত-দেহ মধ্যে * মা)
ষটচক্রময়ী ওঁকার-রঙ্গিনী, যোগেশ্বরী স্বয়ম্ভু-তোষিণী ॥
মূল অম্বুজে ভূলোক বাসিনী, জাগো শক্তিরূপা অকুল কামিনী,
পঞ্চাশত দলে কর মধু পান, মাতৃকাবর্ণ-বিলাসিনী ॥

মূলাধার

অরুণ-বরণ চারিদল মাঝে, 'ব-শ-ষ-স' বর্ণ জ্যোতিঃরূপে সাজে,
কর্ণিকা "লং" বীজে ব্রহ্মা বিরাজে, কোলে বাগীশ্বরী ডাকিনী ;—
ব্রহ্ম-বিবরে স্বয়ম্ভু-মিলনে, সার্দ্ধত্রিবলয়ে আনন্দিত মনে,
বিলসিছ মাগো ক্ষিতি-মণ্ডলে, কামকলা স্বরূপিণী ॥

স্বাধিষ্ঠান

রক্তিম ষড়দল স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, 'বভম, যরল' শোভে দল মধ্য,
অপ্‌ তত্ত্ব সনে চন্দ্রার্দ্ধকিরণে, বিরাজে "বং" বীজ বরদায়িনী ;—
কেন্দ্রে ভুবলোকে পালন কারণ, রাজে মহাবিষ্ণু লোক-নারায়ণ,
(তাঁর) কোলে নারায়ণী ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী মাতা "রাকিনী" ॥

মণিপুর

মেঘের বরণ দশদল পুঞ্জে, 'ড—আদি—ফ' বর্ণের ভ্রমর গুঞ্জে,
(তাহে) তেজস্তত্ত্বময় প্রদীপ্ত অনলে, উজলে "রং" বীজ কালাগ্নিরূপিণী ;—
কর্ণিকা স্বলোকে রাজে জ্ঞানেশ্বর মঙ্গল কারণ রুদ্র বৈশ্বানর,
কোলে সংহারিণী তেজপারাবার ভদ্রকালী শ্যামা "লাকিনী ॥"

---

* ভারতবর্ষ মধ্যে ষট্‌চক্রময় সপ্তচক্রযুক্ত অপূর্ব্ব স্থান-বিভাগ এবং তৎতৎ প্রদেশে মহাকুণ্ডলিনী শক্তির লীলা-বিলাসাদি, মৎপ্রণীত "করুণা-ধারা বা সংসার-রহস্য" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।—গ্রন্থকার

অনাহত

দ্বাদশ রক্তদল অনাহত কুঞ্জে, 'ক—আদি—ঠ' বর্ণ শোভে দলপুঞ্জে;-
কেন্দ্রে মহলোকে হরি-হর ভুঞ্জে, প্রাণময় তত্ত্ব "যং" রূপিণী ;—
(সেথা) জীবাত্মা দীপবৎ রাজে প্রাণারূঢ়, সহক্ষেত্রাধিপ বাণলিঙ্গ হর,
কর্ণিকা-মণ্ডলে ত্রিগুণ ঈশ্বর কোলে মহেশ্বরী "কাকিনী" ॥

বিশুদ্ধ

ধূম্র ষোড়শ দলে বিশুদ্ধ কমল, স্বরবর্ণ প্রতি দলে ঝলমল,
মহাশূন্যময় জনলোক অটল, রাজে সেথা "হং" ব্যোমরূপিণী ;—
শব্দতত্ত্বময় অপূর্ব্ব এই স্থান, নির্ব্বাণ-কলা সদা দীপ্তিমান,
কেন্দ্রে সদাশিব শম্ভু পঞ্চানন, কোলে জ্ঞানময়ী "শাকিনী" ॥

আজ্ঞা

হংস-পক্ষরূপী দ্বিদলের দলে, 'হ—ক্ষ' নাদ-বিন্দু সতত উজলে,
তপোলোক মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, শোভে "ঠং" বীজ চন্দ্রস্বরূপিণী ;—
ত্রিবেণী ত্রিকূট ভ্রূমধ্য এই স্থানে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র ত্রিগুণ ত্রিকোণে,
কর্ণিকা-মণ্ডলে পরশিব কোলে, রাজে সিদ্ধিরূপা "হাকিনী" ॥

সহস্রার

দশশত দল কমল-কুঞ্জে, অক্ষর-মালিকা অলিকা গুঞ্জে,
বিংশতি স্তরে সুধাধারা ভুঞ্জে, (ওই) প্রেমানন্দময়ী জননী ;—
(সেথা) সত্যলোক নিত্য মহাভাবময়, যেভাবে যে ভাবে সেভাবে উদয়,
রত্নবেদী পরে পরব্রহ্ম ক্রোড়ে, শোভে মহাকালী ত্রিনয়নি ॥

প্রার্থনা

অমাকলা তুমি নির্ব্বাণরূপিণী, সর্ব্বদেবময়ী জগত-বন্দিনী,
(তুমি) পরমাত্মময়ী জ্ঞান-বিধায়িনী, জাগো ব্রহ্মানন্দদায়িনী ;—
(ওগো) সাপিনী ঘুচা'য়ে হও মা কামিনী, যোগানন্দ-হৃদে সুধা-তরঙ্গিনী,

---

সহস্রারে চল প্রেম-কমলিনী, জাগো হর-মনমোহিনী ॥

—স্বামী যোগানন্দ

মধ্যম চরিত্র

অথ মধ্যম চরিত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিঃ। মহালক্ষ্মী দেবতা। উষ্ণিক্ ছন্দঃ। শাকম্ভরী শক্তিঃ। দুর্গা বীজম্। বায়ুস্তত্ত্বম্। যজুর্ব্বেদ স্বরূপম্। মহালক্ষ্মী প্রীত্যর্থং মধ্যম চরিত্রজপে বিনিয়োগঃ॥

ধ্যানম্

ওঁ অক্ষস্রক্ পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং,
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশ সুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈ প্রসন্নাননাং,
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

বিষ্ণু ঋষি—প্রথম চরিত্রে সাধক, ধর্ম্মে ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; সাধকের প্রাণ-চৈতন্য বা মহাপ্রাণ জাগ্রত হওয়ায়, এক্ষণে তাঁহার ধর্ম্মভাবসমূহকে আসুরিক প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া যথাসাধ্য পুষ্ট ও সম্পদময় করিতে হইবে; কোন্ অংশ কি ভাবে পুষ্ট করিয়া বিকশিত করিলে, উহা হিতকর হইবে, এ বিষয়ে ধর্ম্মভাবপালনকারী বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল দ্রষ্টা, তাই মধ্যম চরিত্রের ঋষি—বিষ্ণু।

মহালক্ষ্মী দেবতা—আধ্যাত্মিক জগতের ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্সমূহ সম্যক্রূপে আয়ত্ব করিয়া, যাহাতে সাধক মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন, এজন্য মধ্যম চরিত্রে, প্রাণের ও জ্ঞানের চরম বিকাশ এবং সমন্বয় হইয়াছে; তাই এই চরিত্রের দেবতা—ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী ভগবতী মহালক্ষ্মী।

উষ্ণিক্ ছন্দ—ঋগ্বেদের মতে, উষ্ণিক্ ছন্দে মন্ত্র পাঠ করিলে পাঠকের আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়; এজন্য বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারক বিচিত্র ভাবযুক্ত মধ্যম চরিত্রের ছন্দ উষ্ণিক্।

শাকম্ভরী শক্তি—সাধকের ধর্ম্মভাবসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও বিশুদ্ধ করিয়া যথাযোগ্য ভাব ও রস প্রদানে পুষ্টি বিধান করিতে হইবে; এজন্য এই চরিত্রের শক্তি, সত্ত্বগুণময়ী পালনকারিণী শাকম্ভরী।

দুর্গা বীজ—সমস্ত দেব-শক্তি একত্রিত ও সম্মিলিত হইয়া, সর্ব্ব-কারণের কারণরূপা দুর্গা-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিতা হন; ভক্তগণের সর্ব্ববিধ দুর্গতি নাশ করাই এই অসুরদলনী দুর্গা-মূর্ত্তি ধারণের প্রধান কারণ; আর দুর্গম সাধন-পথ দুর্গা মায়ের কৃপাতে সুগম ও সহজসাধ্য হয়; এই সকল প্রাণময় ও জ্ঞানময় ভাব মধ্যম চরিত্রে অভিব্যক্ত—এজন্য এই চরিত্রের কারণ বা বীজ দুর্গা। **বায়ু তত্ত্ব**—বায়ুই সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে জীব-দেহকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকে; আধ্যাত্মিক জগতেও, মহাপ্রাণ জাগ্রত হইলেই সাধকের আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় হইয়া ধর্ম্মভাবসমূহ সুরক্ষিত হয়, আবার বায়ু স্থির করিতে পারিলে, চঞ্চল মনও স্থির হইয়া যায়; এজন্য চণ্ডী-সাধনায় প্রাণময় ও জ্ঞানময় দ্বিতীয় স্তরের তত্ত্ব—বায়ু।

যজুর্ব্বেদস্বরূপ—সাধক প্রথম চরিত্রে যে সকল আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এখানে একত্রিত করত অসুর-দলনী মহা-শক্তিরূপে পরিণত করিয়া, আধ্যাত্মিক সম্পদ্‌রূপ দিব্য অলঙ্কার দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিতে হইবে—অর্থাৎ নানাবিধ উপায়ে আত্ম-নিবেদন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বিক্ষিপ্ত মন্ত্রসমূহকে একত্রিত করিয়া উহা পাদপূরণাদিরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করাই যজুর্ব্বেদের লক্ষণ; এই সকল কারণে মধ্যম চরিত্রের স্বরূপ—যজুর্ব্বেদ। ঐশ্বর্য্য-রূপিণী প্রাণময়ী ও জ্ঞানময়ী মহালক্ষ্মী জগন্মাতাকে প্রসন্না করিতে পারিলেই, সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে—এজন্য তাঁহার প্রীতি ও প্রসন্নতার নিমিত্ত মধ্যম চরিত্র জপের ব্যবস্থা।

বিশিষ্ট সূচীপত্র

মধ্যম খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

দ্রষ্টব্য—স্বামীজির নূতন পুস্তিকা "জয়গুরু কীর্ত্তন-মালা" যাহতে অষ্টোত্তর শতনামের আকারে সমগ্র গুরু-তত্ত্ব, চৌষট্টি মাতৃনাম-প্রশস্তি এবং কতিপয় উৎকৃষ্ট গুরু-সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, সমস্ত বই এক বৎসর মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায়, বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ডার মধ্যে লাল কালিতে ছাপা হইয়াছে, মূল্য—।/০ মাত্র।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।
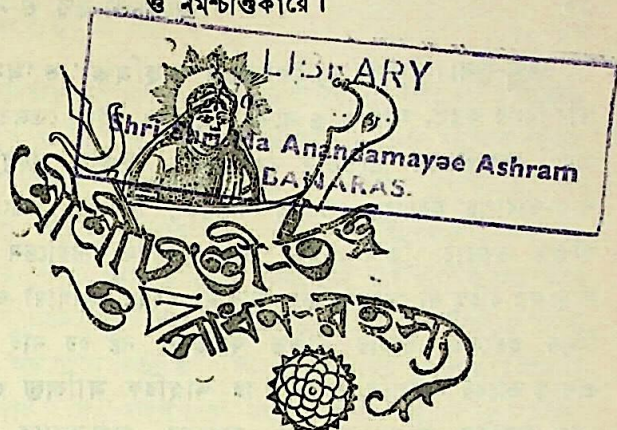
মধ্যম চরিত্র

মণিপুর ও অনাহত চক্রভেদ

(পৌরাণিক সত্য বিবরণ ও "তত্ত্ব-সুধা" নামক ব্যাখ্যা)

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর-সৈন্য বধ।

ঋষিরুবাচ॥ ১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥ ২
তত্রাসুরৈ মহাবীর্য্যৈ দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবান্ ইন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৩

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—পূর্ব্বকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের অধিপতি এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল।—(১।২)॥ সেই যুদ্ধে মহাবলী অসুরগণ দেবসৈন্যগণকে পরাজিত করিল; সকল দেবতাগণকে পরাস্ত করিয়া মহিষাসুর * পুরন্দর (ইন্দ্র) হইল।—(৩)

তত্ত্ব-সুধা। সাধক মধু-কৈটভরূপী 'অহমিকা' ও 'মমতার' স্থূল-ভাব বিলয় করত, অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তেজতত্ত্বে উপনীত এবং তেজস্বীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন; তাঁহার বহির্ম্মুখী চাঞ্চল্য শান্ত-ভাবাপন্ন হইয়াছে—তাঁহার মলিনতা, বিমলতা এবং উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত হওয়ায়, তিনি প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে সাধকের বহির্মু'খী ভোগাসক্তির ভাব নষ্ট হইয়া, আগামী জন্মের কারণ বিলয় হইলেও, তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি নষ্ট হয় নাই; সাধকের প্রশান্ত ভাবের অন্তরালে, সূক্ষ্মভাবাপন্ন আসুরিক মালিন্য ও চাঞ্চল্য সমূহ লুক্কাইত আছে—তাহারা সাধকের অজ্ঞাতসারে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে; কেবল যথাযোগ্য দেশ-কাল-পাত্র সংযোগের অপেক্ষা মাত্র! একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন—"আত্ম-দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ হইল—দেখিলাম, পাপা-সক্তির মূল আমাতে জীবিত রহিয়াছে! অবকাশ পাইলে উহা আমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে পারে, এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া প্রাণে দারুণ আশঙ্কার উদয় হইল—এতকাল ধর্ম্ম-চিন্তা, আলোচনা,

---

* রম্ভাসুর দেব দানব ও মানবের অজেয় শিবাংশ-সম্ভূত পুত্র লাভের জন্য তপস্যা দ্বারা শিবের প্রসন্নতা সম্পাদন করিলে, শিব-বরে শিবাংশে মহিষাসুরের জন্ম হয়। মহিষাসুরও অমরত্ব লাভ করিবার জন্য তপস্যা দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তোষ বিধান করিলে, ব্রহ্মা অমরত্ব ব্যতীত তাহার সর্ব্ববিধ প্রার্থনা পূরণ করিতে স্বীকৃত হন; তখন সে 'নারী ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা বধ্য হইবেনা' এরূপ বর প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাহার অভীষ্ট পূরণ করেন। মহিষাসুর মনে করিয়াছিল—অবলা নারী জাতি, তাহার মত মহা বীর্য্যবান পুরুষকে কিরূপে বধ করিবে?—সুতরাং সে অবধ্য হইল।—ইহা দেবী ভাগবতের মত; কালিকা পুরাণ মতে—মহিষাসুর তপস্যা দ্বারা দেবীর প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়া 'দেবীর সহিত সাযুজ্যতা' বর প্রার্থনা করে; তখন দেবী তাহাকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন—"তুমি আমার পাদ-লগ্ন অবস্থাতে থাকিয়া, আমার অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত একত্রে সুরাসুর নর কর্ত্তৃক পূজিত হইবে"। অতঃপর দেবী তাহার অসুর ভাবসমূহ বিলয় করিয়া সুরভাবে পূর্ণ করত তাহাকে দেবগণেরও পূজার্হ করিয়াছিলেন। (—এজন্য দুর্গাপূজাতে মহিষাসুরেরও পূজা হইয়া থাকে)। [বৈকৃতিক রহস্যে আছে—"পূজয়েন্মহিষং যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া।"—পরমেশ্বরের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত মহিষাসুরকে পূজা করিবে]।

উপাসনা, ধ্যানধারণাদি এবং নানা দেশবিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এমন হীন ও শোচনীয়! তবে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় কি? সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই?—বুঝিলাম, দিন যামিনী ভগবৎ সহবাস ব্যতীত ইহার আর অন্য উপায় নাই—তাঁহার সহিত আমার সমস্ত প্রাণের যোগ ভিন্ন, এই মহাব্যাধির অন্য ঔষধ নাই।"—পাপসক্তির বীজ সম্বন্ধে মহাপুরুষের এই চৈতন্যময় উপলব্ধি বা সত্যবাণীর অন্তরালে, চণ্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুরের যুদ্ধ-সজ্জার ভাবটী নিহিত!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্রে অভিব্যক্ত; চণ্ডী-সাধনায় আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম ভাব-চাঞ্চল্য এবং তদ্দ্বারা দেবভাবসমূহের পরাজয়ের অন্যতম কারণ বা রহস্য। আধ্যাত্মিক জগতে যাহারা সাধনার উন্নত স্তরে আরোহন করিয়াছেন, তাঁহারা এই আসুরিক সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য সতত অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এই মালিন্য ও চাঞ্চল্যময় সূক্ষ্ম অসুরগণকে নিজ খণ্ড খণ্ড দেবশক্তিদ্বারা জয় করা যায় না; পরমাত্মময় মাতৃচরণে শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহার কৃপা দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল দেবশক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলে, সেই সম্মিলিত মহাশক্তিই অসুর নিধন করিতে সমর্থ—শরণাগত সাধকের পক্ষে মা, স্বয়ং সাধক-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করত দেবভাবসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও দীপ্ত করিয়া, আসুরিক ভাবসমূহকে দলন পূর্ব্বক সাধককে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন—এই সকল সাধনা মধ্যম চরিত্রে অভিব্যক্ত।

দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে সাধক অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দৃঢ়ভাব অবলম্বন করিয়াছেন—ত্যাগ ও সংযমের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ দ্বারা নিজেকে তেজস্বী এবং কঠোররূপে পরিণত করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাকে প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সত্যের স্বভাব দৃঢ়তা, প্রাণের স্বভাব কোমলতা; সুতরাং জ্ঞানের আঁচ দ্বারা,

দৃঢ় ভাবাপন্ন সত্যময় প্রাণকে গলাইতে হইবে—এজন্য মধ্যম চরিত্রে প্রাণ ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠারূপ মহা "মহোৎসব" সুসম্পন্ন করিবার অপূর্ব্ব আয়োজন। যাহাকে বড় হইতে হইবে, তাহার পাষাণের মত শক্ত ও কঠিন হইলে চলিবে না। প্রাকৃতিক-জগতে দেখা যায় যে, যে সকল বৃক্ষ বা লতা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহারা সাধারণতঃ অতিশয় কোমল ভাবাপন্ন থাকে; এইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত পাষাণের মত দৃঢ় ভাবাপন্ন সাধকের হৃদয়ে প্রাণ-সঞ্চার করত কোমলতায় এবং আরও উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত হইয়া, তাঁহাকে প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে! —পাষাণময় হিমালয় ভেদ করিয়া স্বর্গীয় মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করাইতে হইবে—পাষাণসম কঠোর হৃদয়-সিংহাসনে শৈলপুত্রী উমাকে বসাইয়া তাঁহার কৃপায় ধন্য হইতে হইবে। প্রাণই মানবের অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণত্ব আনয়ন করে; সুতরাং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা সচেতন হইয়া ভগবানের বিশ্ব-লীলাক্ষেত্রে জ্ঞানময়, দৃষ্টি প্রসারিত করা মানব-জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য—এইরূপে মধ্যম চরিত্রে চৈতন্যময় বিচিত্র প্রাণের খেলাই নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত।

যখন বর্ষাকালে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের প্রতিবন্ধকতায় বাহিরের কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা জন্মায়, তখন মানব-হৃদয়ের অপূর্ণতা বা অভাবের শূন্যতার মধ্যে চিরবিরহী-প্রাণে ব্যথায় এবং অতৃপ্তির তুফান উদ্বেলিত হয়!—কি যেন একটা অজানার দিকে টান—যেন চিরঅপরিচিতের সহিত মিলনের জন্য অজ্ঞাতভাবে অভিসার বা গোপন-যাত্রা, মানবের মানস-সরোবর আন্দোলিত ও তরঙ্গায়িত করিতে থাকে! —চির-বিরহী জীবের পরমপুরুষের প্রতি এই স্বাভাবিক টানই—বর্ষার রথোৎসবলীলারূপে অভিব্যক্ত এবং আচরিত! এইরূপে বর্ষার অবসানে এবং শরতের আগমনে বাহ্য প্রকৃতিতে প্রাণের অপূর্ব্ব

সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়—আকাশে বাতাসে বৃক্ষ-লতায় প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামল সজীবভাব প্রাণের অন্তঃস্থলে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ও চেতনা উদ্দীপন করিতে থাকে! —বর্ষার বন্ধনভাব ক্রমে বিদূরিত করিয়া শরৎ, মুক্তির ও শান্তির শুভ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে। তাই বর্ষা কালে অজ্ঞানাকে পাইবার জন্য অতৃপ্তির ভাব, শরতের শুভ আগমনে ক্রমে বিদূরিত হইয়া, যেন সেই অজানাকে জানার সন্ধান জানাইয়া দেয়! তাই শরৎ কোমলতায়, বিমলতায় এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ—এজন্য শরৎকালেই প্রাণময়ী ও জ্ঞানময়ী মহামায়া মা মর্ত্ত্য-ধামে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের পূজা গ্রহণ করত তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন—আনন্দময়ী মায়ের শারদীয় উৎসবানন্দে সকলেই মাতোয়ারা হইয়া থাকেন; পরিশেষে 'বিজয়া'তেও শত্রু-মিত্র, ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত ভেদাভেদ ভুলিয়া 'কোলাকুলী' করত, প্রাণের বিকাশ দেখাইয়া যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন! —মধ্যম চরিত্রে সেই মহাপ্রাণময়ী দুর্গামায়ের আবির্ভাব-রহস্য এবং যুদ্ধরূপে করুণা-প্রকাশ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

মহাশক্তিময় ভগবানের পরস্পর বিরোধী দুইটী বৃহৎশক্তি জগতে সতত ক্রিয়াশীলা; যথা—(১) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি; (২) অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি *। মায়া-শক্তি জীবকে আত্ম-স্বরূপ ভগবানের দিক্ হইতে ফিরাইয়া ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে লইয়া যায়—পরিচ্ছিন্ন সুখ এবং বহুত্বের মোহে ভুলাইয়া অসত্যকেই সত্য বলিয়া প্রতিভাত করে; এজন্য এই মায়াশক্তিকে 'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী' বলা হয়। আর অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি—সাক্ষাৎ করুণারূপিণী; তিনি জীবকে সততই সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন—বিবেকরূপে সততই শ্রেয়স্কর হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন। জীবের ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সমূহ

* এ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

যখন চিৎশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আত্মাভিমুখী হয় এবং সপ্তপুর (লোক) সমন্বিত দেহ-পুরের অধীশ্বর, হৃদয়-রাজ্যে অধিষ্ঠিত প্রাণময় বিবেক চৈতন্যরূপ পুরন্দরের অধীন ও আজ্ঞাধীন হইয়া পরিচালিত হয়, তখন ঐ ইন্দ্রিয়াদি ও বৃত্তিসমূহ, দেবতা ও দেবসৈন্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আর যখন ঐ ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহ জীব-মায়া অবিদ্যার প্রভাবে উদ্দাম ভোগাসক্তির দিকে প্রধাবিত হয়, তখন উহারা সকলেই অসুরতুল্য হইয়া থাকে। অবিদ্যা বিমোহিত জীব, নিরন্তর 'আমি-আমার' রূপ "মোহগর্ত্তে" ও "মমতাবর্ত্তে" পতিত হইয়া অহমিকার মালিন্যে এবং মমতার চাঞ্চল্যে অভিভূত হয়; এইরূপে জীব, অসুররূপী ভোগপরায়ণ ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহের অধীশ্বর হইয়া রজোগুণময় সাক্ষাৎ অহংকাররূপে * প্রতিভাত হয়—এই ক্রোধভাবাপন্ন রজোগুণময় অহংকার-প্রতিমূর্ত্তিই মহিষাসুর; মহীরূপ অজ্ঞানতামূলক জড়ভাবকে সতত পাইবার জন্য যে ইচ্ছা করে, তাহার নাম—মহিষ। প্রথম চরিত্রে মধু-কৈটভ বধদ্বারা অহংকারের স্থূলভাব নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে অহং-কারের সূক্ষ্মভাব এবং তাহার সহকারী অনুভাবসমূহ যেরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া পরিশেষে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই মধ্যম চরিত্রে ক্রমে প্রদর্শন করা হইবে।

অবিদ্যা ও চিৎশক্তির পরস্পর বিরোধী ক্রিয়াশীলতায় দেবাসুর যুদ্ধ, জন্মজন্মান্তরে এবং আত্মাভিমুখী হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তীব্রভাবেই চলিতে থাকে—ইহাই মন্ত্রে "পুরা" বা পূর্ব্বকালে বলার তাৎপর্য্য। অহংকারের ভোগাসক্তিময় মায়িক অবস্থায়, চিৎশক্তি প্রভাবিত দেবভাব সমূহ পরাজিত হইয়া থাকে এবং বিবেক-চৈতন্যের ক্ষীণকণ্ঠের উপদেশ বা অনুরোধও সর্ব্বথা অবজ্ঞাত ও ব্যর্থ হয়। অনন্তর আত্মাভিমুখী হইয়া তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন হইলেও, সাধককে কিরূপে মায়াশক্তিদ্বারা প্রভাবিত

* পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশটি বহিরিন্দ্রিয় বা করণ এবং মন-বুদ্ধি অহংচিত্ত এই চারিটী অন্তঃকরণ; এই চতুর্দ্দশ করণের মধ্যে অহংকারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী—কেননা কর্ত্তৃত্বের এবং ভোক্তৃত্বের অভিমান অহংকারই করিয়া থাকে।

অসুরগণের অত্যাচারে 'অতিদুঃখিত' হইতে হয়, তাহা প্রথম চরিত্রে মহারাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যের ইতিবৃত্তে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মাভিমুখী হওয়ার পর, সাধকের দেবভাব সমূহ সংঘবদ্ধ হইয়া, আসুরিকবৃত্তি সমূহের সহিত সংগ্রাম করত মহাশক্তিরূপে তাহাদিগকে পরাজিত করে—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বা সাধন-রহস্য। মানুষের আয়ুর পরিমাণ মোটামুটি শতবর্ষ ধরা যাইতে পারে; জীবনব্যাপী প্রবৃত্তির সহিত নিবৃত্তির, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত অসত্যের এবং অবিদ্যার সহিত চিৎশক্তির পরস্পর বিরোধী সংঘর্ষই মন্ত্রোক্ত শতবর্ষব্যাপী দেবাসুর সংগ্রাম। জীব-দেহে এইপ্রকার দেবাসুর যুদ্ধের বিষয়, বেদ এবং উপনিষদাদিতেও উল্লেখ আছে; ভগবান শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকে এবং অন্যান্য স্থানে নিজভাষ্যে দেববৃত্তি এবং অসুরবৃত্তি সমুহের সংগ্রামের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান, দেহস্থ সপ্তবিংশতি দৈবী সম্পদ এবং তদ্বিপরীত ভাবাপন্ন সপ্তবিংশতি সংখ্যক আসুরী সম্পদ প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়া, দেবাসুর যুদ্ধের উপকরণসমুহ বিবৃত করিয়াছেন। কারণ-স্বরূপ সেই উপকরণগুলিই, দেবী-মাহাত্ম্যের সত্য বিবরণের মধ্য দিয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হওয়ায়, উহা আধ্যাত্মিক সাধনার পথ আরও সুগম ও সরস করিয়া দিয়াছে।

যোগশাস্ত্রমতে—কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া দেহস্থিত ষট্চক্র বা পদ্মগণের মধ্যে, যখন যে পদ্মে আরোহণ করেন, তখন সেই পদ্মটী সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয়; অর্থাৎ সেই পদ্মস্থিত সৎ এবং অসৎ ভাবাপন্ন বৃত্তিসমুহ ক্রমে বিকশিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎপর ঐ পদ্মের ভোগ শেষ হইলে, মহামায়া কুলকুণ্ডলিনীর দেহে উহারা সকলেই বিলীন হইয়া থাকে; অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী যখন পরবর্ত্তী পদ্মে সম্পূর্ণ আরোহণ করেন, তখন পূর্ব্ব পদ্মটী সঙ্কুচিত মুদিত হইয়া হয়, আর নবাশ্রিত

পদ্মটীতে ঐ স্থানের আসুরী ও দেবভাবীয় বৃত্তিগুলি ক্রমে জাগ্রত ও বিকশিত হইতে থাকে ; এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথম চরিত্র বা চণ্ডী-সাধনার প্রথম স্তর শেষ হওয়ায়, সাধক অহিংসা ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও তেজস্বী হইয়া তেজতত্ত্বময় মণিপুর চক্রে আরোহণ করিয়াছেন—এইরূপে মহাশক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মা রজোগুণপূর্ণ মণিপুর চক্রে সম্পূর্ণ আরোহণ করায়, সাধকের যে সকল তেজময় দৈবী ও আসুরীবৃত্তি স্থূলে নিরোধ হইয়া সুক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল, উহারা তেজময় সূক্ষ্মজগতে ক্রমে বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠিল —সাধক স্থূলভাবাপন্ন আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় পুর্ব্বক তেজস্বী হইয়া যে একরস আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিতেছিলেন. তাহাতে পুনরায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল এবং পরস্পর বিরোধী বৃত্তিসমূহের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল —এইরূপে সাধকেয় চিত্তে তেজতত্ত্বে উদ্দীপিত রজোগুণময় সূক্ষ্ম অহংকার প্রবল হইয়া তাঁহার দেব-ভাবসমূহকে পুনরায় পরাস্ত করিল— ইহাই মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবগণের পরাজয়।

এই প্রকার আসুরিক অভিব্যক্তি দ্বারা দেবভাব সমূহের পরাজয়ের সূক্ষ্মভাব ব্যতীত এবিষয়ে স্থূলভাবে বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, মানুষ যখন কাম-ক্রোধাদি রিপুদ্বারা সম্পূর্ণ আক্রান্ত বা অভিভূত হয়, সেই অবস্থায় তাহার দেহস্থ প্রকাশময় দেবভাব সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া পরে— ইহা নিঃসংশয়ভাবে অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা সতত অহংকারে পরিপূর্ণ হইয়া মোহমুগ্ধ থাকে, তাহাদের দেবভাব সমূহের ক্রিয়াশীলতাও লুপ্ত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে—অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশময় বৃত্তি ও ভাব সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও জড়ভাবাপন্ন হইয়া পরে! —ইহাও অহংকাররূপী মহিষাসুরের জয় এবং দেবগণের পরাজয়।—(১-৩)

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধ্বজৌ ॥ ৪

সত্য বিবরণ। অনন্তর পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যেখানে ঈশ্বর ও বিষ্ণু (হরি-হর) অবস্থান করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেন —(৪)

তত্ত্ব-সুধা। মানব-দেহে হৃদয়-প্রদেশেই ঈশ্বর ও প্রাণময় বিষ্ণুর বাসস্থান ; জীবের জীবনী-শক্তিরূপী প্রাণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে হৃদ্দেশেই অধিষ্ঠিত আছেন ; সুখ-দুঃখের সাড়া প্রাণেতেই অভিব্যক্তি হইয়া স্পন্দন সৃষ্টি করে ; জীবাত্মারূপী ঈশ্বর বা জীব-চৈতন্য দেহ-পুরে হৃদ্দেশেই অবস্থিত। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃসর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয় প্রদেশে বিরাজিত। হৃদয়রূপ দেহপুরের সূক্ষ্মভাব কেন্দ্রটীই অনাহত পদ্ম বা চক্র ; যোগশাস্ত্র মতে এই পদ্মটীতে বায়ুবীজ, বাণলিঙ্গ, প্রাণবায়ুতে সমারূঢ় জীবাত্মা * প্রাণরূপী পুরুষোত্তম অচ্যুত এবং ত্রিগুণাধিপতি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। যখন জীব ত্রিতাপ জ্বালায় সন্তাপিত ও দগ্ধ হয়, তখন আপন প্রাণেরই শরণাগত হইয়া থাকে—প্রাণে প্রাণেই অন্তর্যামীর নিকট শান্তিলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা বা আত্ম-নিবেদন করে। সাধক মণিপুর রাজ্যে রজোগুণের সূক্ষ্ম আক্রমণ ও চাঞ্চল্যে পরাস্ত হইয়া হৃদয়-রাজ্যে প্রাণময় ও আত্মময় হরি-হরের শরণাপন্ন হইলেন! কুলকুণ্ডলিনী শক্তি একমুখে পরাজিত এবং নিষ্ক্রিয় দেবগণকে লইয়া মণিপুর হইতে অনাহত চক্রে আরোহণ করিলেন ; তথায় দেবভাবসমূহ বিক্ষোভিত হইয়া প্রাণময় হইলেন এবং চৈতন্যময় মহাপ্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যতদিন জীব অহংকারী হইয়া আত্ম-কর্ত্তৃত্বে এবং আত্ম-ভোক্তৃত্বে বিশ্বাস করিয়া পরিচ্ছিন্নভাবে আত্ম-তৃপ্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করে, ততদিনই দুঃখ প্রাপ্ত হয় ; কেননা অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তিদ্বারা নিত্যানন্দ

---

* প্রাণারূঢো ভবেজ্জীবঃ সর্ব্বজীবেষু সর্ব্বদা" অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই জীবাত্মা নিয়ত এই প্রাণবায়ুতে সমারূঢ় আছেন। —যোগীযাজ্ঞবল্ক্যম্।

প্রয়াসী জীবের বুভুক্ষা বা অভাব কিছুতেই মিটিবেনা, বিশেষতঃ সংহতি বা মনপ্রাণের ঐক্য অবস্থাব্যতীত অর্থাৎ মনঃস্থির ও বায়ুস্থির না হইলে আসুরিক বৃত্তির চাঞ্চল্যসমূহ জয় করা যায় না। মনকে স্থির করিতে পারিলে, প্রাণ বা বায়ুও স্থির হইয়া যায়, পক্ষান্তরে বায়ুস্থির করিতে পারিলে মনও তৎসঙ্গে স্থির হইয়া থাকে—ইহা সার্ব্বভৌমিক ও যৌগিক বিধান। যতদিন জীব প্রতি কার্য্যে ভগবৎ অধিষ্ঠান এবং ভগবৎ নিয়ন্তৃত্ব অনুভব না করে, ততদিনই ভাব-চাঞ্চল্যে পুনঃপুনঃ পরাজিত হয়; কেননা আত্ম-কর্ত্তৃত্বই দুঃখের কারণ, আর ভগবৎ কর্ত্তৃত্বানুভবই আনন্দ বা প্রেম! ভগবান মঙ্গলময়, তিনি আমার কর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ যাহা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই জীবন-স্তরে ক্রমে ক্রমে অবশ্যই অভিব্যক্ত বা উপস্থিত হইবে—দুঃখময় অবস্থা বলপূর্ব্বক কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না, সুতরাং উহা ভগবানের দানরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, দুঃখের মধ্যেও শান্তি লাভ হইবে। বিশেষতঃ সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বমঙ্গলা মা, জাগতিক দুঃখের অগ্নিতে পোড়াইয়া পরিণামে তাঁহার অমর সন্তানগণকে অমৃতের অধিকারী করত ধন্য করেন। এইরূপে ভগবৎ শক্তির সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সাক্ষীভাবে জীবনের কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করাই চণ্ডী-সাধনার বিশিষ্ট স্তর! এইপ্রকার শরণাগতির ভাব দেবী-মাহাত্ম্যের আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত।

দেবগণ নিজ নিজ খণ্ড শক্তির উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া, দেব-বিরোধী অসুরগণকে দলন করিবার প্রয়াসী হওয়ায়, পরাজিত হইয়াছেন; কেননা, খণ্ড খণ্ড আত্ম-শক্তিদ্বারা অসুরসমূহকে পরাস্ত করা যায় না; এক্ষণে অবস্থার চাপে দেবগণ অসুরনিধনের প্রকৃত উপায়ের সন্ধান পাইয়াছেন—তাই নিজ নিজ দুর্ব্বলতা অনুভব করত সংঘবদ্ধ হইয়া প্রাণময় আত্ম-চৈতন্যরূপী হরি-হরের শরণাগত হইয়াছেন।

এতকাল সাধকের ইন্দ্রিয়সমূহ দশদিকে প্রধাবিত ও বিক্ষিপ্ত ছিল; অর্থাৎ রজোগুণাত্মক বিশুদ্ধ মনোময় ধর্ম্মভাবসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণময় বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা মহাপ্রাণরূপী বিষ্ণু, তমোগুণময় জ্ঞানরূপী রুদ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিপতিগণ এবং অন্যান্য দেবগণ বা দেবশক্তিসমূহ স্ব স্ব বিশিষ্টতার মধ্যদিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ক্রিয়াশীল ছিলেন; আজ আসুরিক অত্যাচারে তাঁহারা হৃদয়-কেন্দ্রে সংঘবদ্ধ হইয়াছেন। সংহতি না হইলে জগতে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না; এজন্য ইন্দ্রিয়পথে দশদিকে ধাবমান বৃত্তিসমূহকে প্রত্যাহার করিয়া এককেন্দ্রে আনয়ন করিবার জন্য যোগশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। সূর্য্য-রশ্মিতে দাহিকাশক্তি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বিশিষ্ট কাচ-সংযোগে কতকগুলি রশ্মি একীভূত বা কেন্দ্রীকৃত করিতে পারিলে, উহা দাহিকাশক্তিযুক্ত উজ্জ্বল তেজ-বিন্দুতে পরিণত হয়—ইহাই দেবগণের একত্রে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাৎপর্য্য।

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুর চেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসু র্দেবাভিভববিস্তরম্॥ ৫
সূর্য্যেন্দ্রাগ্ন্যানিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ ৬
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥ ৭
এতদ্ বঃ কথিতং সর্ব্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥ ৮

সত্য বিবরণ।—দেবগণ হরিহরের নিকট তাঁহাদের পরাজয় বিষয়ক, মহিষাসুরের কার্য্যকলাপ সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন।—(৫)॥ (তাঁহারা বলিলেন) সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি বায়ু চন্দ্র যম বরুণ এবং অন্যান্য দেবগণের অধিকার সে নিজেই গ্রহণ করিয়াছে।—(৬)॥ সমস্ত দেবগণ দুরাত্মা মহিষাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মনুষ্যগণের

ন্তায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন।—(৭)॥ অসুরের এইসব অত্যাচার আপনাদের নিকটে বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে আপনারা তাহার বধের উপায় চিন্তা করুন।—(৮)॥

তত্ত্ব-সুধা। সাধক যখন উন্নত হইয়া বুদ্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তখন নিজের দুর্ব্বলতা এবং দোষগুলি নিজেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারেন; সাধারণ জীবের পক্ষে আত্ম-দোষ দর্শন সম্ভবপর হয়না; সর্ব্ববাদীসম্মত নিরেট বোকা ও মুর্খ ব্যক্তিও নিজকে বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করে—সে কিছুতেই নিজকে তুচ্ছ বা হীন বলিয়া ভাবিতে পারেনা। প্রাকৃতিক বিধানে জীবের চৈতন্যোদয় হইয়া আত্মময় ভগবানের দিকে যখন প্রগতি হয়, তখন ক্রমে সে নিজের দোষগুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থাতেও, সূক্ষ্ম আসুরিক মালিন্যে ও চাঞ্চল্যে ব্যথিত হইয়া, প্রাণময় ও জ্ঞানময় অন্তর্যামীর নিকট নিজ দুর্ব্বলতা এবং আসুরিক পরাজয় নিবেদন করে।

দর্শনশাস্ত্রমতে রজোগুণের আদি বিকারই অহংতত্ত্ব, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি অহংতত্ত্বের বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অংশে বহিরিন্দ্রিয় (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং অন্তরেন্দ্রিয় (মন বুদ্ধি অহং চিত্ত), এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি-দেবগণের উদ্ভব হইয়াছে; অহংতত্ত্বের রাজস অংশে মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব, আর তামস অংশে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্য—দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিপতি; চন্দ্র - পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি; অগ্নি—বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি; বায়ু—ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিপতি; চন্দ্র—মনাধিপতি; যম—পায়ুরিন্দ্রিয়ের অধিপতি; বরুণ—রসনেন্দ্রিয়ের অধিপতি; মন্ত্রোক্ত অন্যান্য দেবগণ :—দিক্—শ্রবণেন্দ্রিয়াধিপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিপতি; বামন—পাদ ইন্দ্রিয়াধিপতি; প্রজাপতি—উপস্থ ইন্দ্রিয়াধিপতি; ব্রহ্মা—বুদ্ধির অধিপতি, রুদ্র—অহংকারের অধিপতি,

বাসুদেব—চিত্তের অধিপতি। এতদ্ব্যতীত "দেবী-কবচে" দেহের অন্তর বাহির রক্ষাকারী বহু শক্তিগণের নাম বিবৃত হইয়াছে;—ইহারাও জীবদেহে ক্রিয়াশীল দেবতা বা দেবশক্তিগণ। দেহের সমষ্টি অখণ্ড চৈতন্যই বিভিন্নভাবে ও রূপে ক্রীড়াযুক্ত ও দ্যোতনশীল হইয়া বিশিষ্ট চৈতন্যময় দেবতা বা দেবশক্তিরূপে প্রকটিত হন।

সর্ব্বত্র ভগবৎরূপ দর্শন, দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই সূর্য্য দেবতার অধিকার ভোগ; ভগবৎ সেবা বুদ্ধিতে স্বহস্তে কর্ত্তব্য কার্য্যনির্ব্বাহ করা পাণীন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই ইন্দ্র দেবতার অধিকার ভোগ; ভগবানের নাম জপ, গুণ ও লীলাকীর্ত্তনাদি বাগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই অগ্নি দেবতার অধিকার ভোগ; সর্ব্ববিধ স্পর্শে ভগবৎ স্পর্শ অনুভব করাই ত্বগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই বায়ু দেবতার অধিকার ভোগ; আত্মময় ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে ও তাঁহার ধ্যানে মন নিবিষ্ট করিয়া আনন্দ-সুধা পান করাই মনের সার্থকতা—ইহাই সুধাকর চন্দ্রের অধিকার ভোগ; দেহের পক্ষে যাহা অপকারী মলস্বরূপ, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করত দেহকে বিশুদ্ধ করিয়া ভগবানের মন্দিররূপে পরিণত করাই পায়ুরিন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই যম দেবতার অধিকার ভোগ; খাদ্য দ্রব্যের আস্বাদনে ভগবৎ পরিতৃপ্তি অনুভব করাই রসনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা—ইহাই বরুণ দেবের অধিকার ভোগ। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া, বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে ভগবৎ সত্তা, ভগবৎ চেতনা এবং ভগবৎ আনন্দ উপলব্ধি করাই দেহের বিশিষ্ট চৈতন্যময় দেবগণ বা দেবশক্তিগণের স্ব স্ব অধিকার রক্ষা এবং তাঁহাদিগকে যথাযথ ভোগ প্রদান!—তাই সাধ্য শিরোমণি প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধারাণী সখিগণকে বলিয়াছিলেন—

(১) কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী, তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে। সুধামাখা বাঁশীর তান, যার না জুড়ায় প্রাণ, তার

জন্ম হ'ল অকারণে ॥ (২) অপরূপ মদন মোহন, যে না দেখে সে চাঁদ বদন, সে নয়ন রহে কি কারণ। শত ধিক সে পামরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে সে নয়ন অন্ধের সমান ॥ (৩) কৃষ্ণের লাবণ্যা-মৃত, নাম গুণ চরিত, অকৈতব প্রেম অনুপম। তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে, সে রসনা ভেক জীহ্বা সম ॥ (৪) মৃগ-মদনীলোৎ পল, কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমল, সে সৌরভ যে না লয় ঘ্রাণ। সেই নাসা রন্ধ্র সম, বিধি হত অনুপম, প্রাণ হীন ভস্ত্রীর * সমান ॥ (৫) কৃষ্ণ কর পদতল, কোটি চন্দ্র সুশীতল, তার স্পর্শ, যেন পরশ মণি। সেই পরশ নাহি যাঁর সে হোক্ ছারখার, সেই বপু লৌহ সম মানি ॥

পক্ষান্তরে যখন জীব কর্তৃত্বাভিমানে এবং ভোক্তৃত্বাভিমানে পূর্ণ হইয়া অহংকারী হয় ; যখন আত্ম-পরিতৃপ্তির জন্যই বিষয় সেবা করিতে উদ্যত হয়, কিম্বা বিষয় ভোগ করে, তখনই মহিষাসুরের প্রভাবে দেবগণ বা দেবশক্তিসমূহ স্ব স্ব ভোগ এবং অধিকার হইতে বিচ্যুত হন—এইরূপে মহিষাসুরই দেহ-রাজ্যের অধীশ্বর হইযা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া থাকে।

অহংকারই জীবকে দুঃখময় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দুঃখ প্রদান করে ; এজন্য মন্ত্রে মহিষাসুরকে 'দুরাত্মা' বলা হইয়াছে। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র ভগবৎ অনুভূতিদ্বারা কিম্বা ভগবৎ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীদ্বারা, দেহস্থ দেবতা ও দেবশক্তিগণ তুষ্ট ও পুষ্ট হন, আর তদ্বিপরীত কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের দেবত্ব ও কর্তৃত্ব নষ্ট হয় ; এইরূপে তাঁহারা মর্ত্যবাসীদের মত সাধারণ বা জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। নিরন্তর বিষয় চিন্তাদ্বারা জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, পক্ষান্তরে ভগবৎ চিন্তা, সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে ভগবৎ অধিষ্ঠান অনুভব দ্বারা, জীবের স্বরূপত্ব লাভ হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। সাধক যখন প্রাক্তন

* কামারের 'হাফর' অর্থাৎ বায়ু পরি চালনার যন্ত্র।

কর্ম্মবশে আত্মময় ভাব কিম্বা ভগবৎ সাধনা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগাসক্তিময় অসুরের প্রভাবে পুনরায় বিষয় ভোগের জন্য লালায়িত হয়, কিম্বা বিষয়ভোগ করিয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন সে নিজের দুর্ব্বলতা বা আত্ম-দোষ এবং বিষয়ের দোষ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া উহা বর্জ্জন পূর্ব্বক আসুরিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মস্বরূপ প্রাণময় ভগবানের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করে এবং তাঁহার শরণাপন্ন হয়।—(৫-৮)

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ ॥ ৯
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১০
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১১
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১২
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং ত্বিষা ॥ ১৩

সত্য বিবরণ। দেবগণের এই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুসূদন এবং শম্ভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন (ব্রহ্মাও কুপিত হইলেন); তাহাতে তাঁহাদের বদনমণ্ডল ভ্রুকুটী হেতু অত্যন্ত কুটিলভাব ধারণ করিল।—(৯)॥ অনন্তর অতিকোপপূর্ণ চক্রপাণি বিষ্ণুর বদনমণ্ডল হইতে তেজরাশি নির্গত হইল; তৎপর কোপপূর্ণ ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ হইতেও প্রচুর তেজ নির্গত হইল।—(১০)॥ ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের দেহ হইতেও প্রচুর তেজ বিনির্গত হইল এবং সেই তেজ-পুঞ্জ পরস্পর একীভূত হইতে লাগিল।—(১১)॥ দেবগণ তথায় দেখিলেন, সেই সুমহৎ তেজপুঞ্জ জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় শিখামালায় দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত।—

(১২)॥ অনন্তর সর্ব্বদেবশরীর সম্ভূত অনুপম তেজরাশি একীভূত হইয়া একটী নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাঁহার প্রভাতে লোকত্রয় উদ্ভাসিত হইল।—(১৩)॥

তত্ত্ব-সুধা। জাগতিক ভোগাসক্তির বন্ধনকে যতদিন বন্ধন বলিয়া বোধ না হইবে, ততদিন উহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিন্তা ও চেষ্টা হয় না; ক্ষুধা বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সুধা বণ্টন করিলেও উহা অবজ্ঞাত বা উপেক্ষিতই হইয়া থাকে। উহা জাগতিক নিয়ম। সাধক মর্ম্মস্থলে আসুরিক অত্যাচার ও পরাজয় উপলব্ধি করিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছেন; উহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, দেহস্থ দেবভাব সমূহকে সংঘবদ্ধ করত,শত্রু মর্দ্দনকারী মহাপ্রাণরূপী বিষ্ণু এবং আত্ম-চৈতন্যরূপী জ্ঞানময় শম্ভুর শরণাগত হইয়াছেন। দেহস্থ দেবতাগণ প্রাণময় ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া অসুরগণের অত্যাচার আলোচনা দ্বারা অত্যন্ত কুপিত হইলেন; মন-প্রাণ বুদ্ধি যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত একযোগে আসুরিক বৃত্তিসমূহের উচ্ছেদ কামনায় বদ্ধ-পরিকর হইয়া অতি ক্রুদ্ধ হয়, তখন জীবন-যুদ্ধে সুনিশ্চিতরূপে জয়লাভ হইয়া থাকে।

বিষয়ের দোষ এবং নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব করত, সাধক যখন কায়মনোবাক্যে পবিত্র ও সমাহিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হন, তখন ক্রমে আত্ম-নিবেদনের পুর্ণতাহেতু তাহার চিত্ত-ক্ষেত্রে ভগবৎ প্রেমানুরাগ প্রকাশ পায়—উহা সাধকের মুখমণ্ডলেও ক্রমে রক্তিম আভা বা বিশিষ্ট উজ্জ্বলতারূপে পরিস্ফুট হয়; রজোগুণ বিষয়মুখী হইলে, অহংকার ও কাম ক্রোধাদিরূপে প্রকাশ পায়; আর সেই রজোগুণই পরমাত্মাভিমুখী হইলে,—পরাভক্তি, প্রেমানুরাগ বা পরাবৈরাগ্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করে! চণ্ডী-সাধনায় ইহাই রক্ত-প্রবাহের মহানদী!—আবার ভাগবতে, ইহাই আবির কুমকুমাদি বিচিত্র প্রেম-ভক্তিময়

সন্তান! সাধকের প্রেমানুরাগযুক্ত অবস্থায় আসুরিক অজ্ঞান-তমসা আপনা হইতে তিরোহিত হয়; সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারেনা, সেইরূপ প্রেমানুরাগরূপ আত্ম-জ্যোতির বিকাশে আসুরিক ভাব সমুহ প্রকট হইতে পারেনা; হৃদয় আসনে ভগবানকে সম্যকরূপে বসাইলে, সেখানে ভোগাসক্তি স্থান পাইতে পারেনা; আর যে হৃদয় কাম-কামনার বোঝা দ্বারা ভারাক্রান্ত, সেখানে ভগবানকে বসাইবার স্থান বা অবসর কোথায়?

সাধারণতঃ দেখা যায়, বৈষয়িক সর্ব্ববিধ কার্য্য নির্ব্বাহ ব্যাপারে মন বেশ স্থির থাকে, উহাতে তেমন বিঘ্নকারক চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয়না—এইরূপ স্থিরতার প্রধান কারণ তীব্র বিষয়ানুরাগ বা অর্থপ্রীতি; পক্ষান্তরে সন্ধ্যা-পূজাদি সাধনায় মন স্থির হয়না—ইহার অন্যতম কারণ, তাদৃশ ঐকান্তিক অনুরাগের অভাব! সুতরাং সাধককে একদিকে আসুরিক চাঞ্চল্য, উৎপীড়ন বা পরাজয় প্রভৃতি দুর্ব্বলতার প্রতি রাগ বা ক্রোধ প্রকাশ করত উহাদিগকে বিদূরিত করিবার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন পূর্ব্বক তেজস্বী হইতে হইবে, অপরদিকে—আত্মভাবে বা ভগবৎ ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজকে প্রেমানুরাগে অভিরঞ্জিত করত, দেহের প্রকাশশীল বিশিষ্ট চৈতন্যসমূহকে একীভূত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তিরূপে পরিণত করিতে হইবে; তখন অসুর নিধন অতি সহজ-সাধ্য হইবে; কেননা এই অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে নিজের কিছুই করিতে হইবে না—মা স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক অসুর নিধন করিবেন! এইরূপে সাধক আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছার উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করেন এবং দেহস্থ প্রকৃতিরূপিণী গুণময়ী মাতৃ-শক্তিগণের কার্য্যাবলী ও অসুর নিধন লীলা সাক্ষীভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রকাশময় ভাব সমূহ সত্ত্বগুণাত্মক দেবগণের কার্য্য; আর অপ্রকাশময় অজ্ঞানতামূলক স্বার্থপর ভাব সমূহ

রজঃ ও তমোগুণময় অসুরগণের কার্য্য। সুতরাং আসুরিক প্রভাব বিলয় করিতে হইলে, দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল দেবভাবাপন্ন জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বগুণ সমষ্টিতে, ক্রমে রজোগুণের প্রেমভক্তিময় রক্তিম আভা প্রতিফলিত হইবে; অতঃপর সর্ব্ববিলয়কারী তমোগুণের পীত বা কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা উহা অভিরঞ্জিত হইবে, পরিশেষে ঐ রূপময় জ্যোতিঃ রাশি, ভক্ত-চিত্ত হারিণী শত্রু মর্দ্দনকারিণী ত্রিগুণময়ী মহাশক্তি দুর্গারূপে বা ইষ্টদেবরূপে পরিণত হইয়া ভক্তের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিবেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি সাধনার তারতম্য অনুসারে এই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত বা আস্বাদিত হইয়া লীলানন্দ প্রকট করেন—প্রথমে মহাশক্তি মা জ্যোতির্ম্ময়ী সচ্চিদানন্দ স্বরূপা হইয়া প্রতিভাত হন—এই অবস্থা ব্রহ্মবাদী জ্ঞানিগণ দর্শন ও আস্বাদন করেন—জ্যোতির্ম্ময়ী হইলেও ইহার বিশেষরূপে ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমান, এই জ্যোতিতে বাহ্যতঃ বিগ্রহ বা মূর্ত্তির অভাব দৃষ্ট হইলেও, অর্থাৎ ইনি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত বোধ হইলেও ইন্দ্রিয়াদির সর্ব্ববিধ ধর্ম্মই ইহাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত থাকে*। দ্বিতীয় স্তরে, মায়ের জ্যোতিঃরাশি ঘনীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ঘনরূপে প্রকাশ পায়—এই আত্মময় অবস্থাই কর্ম্মী বা যোগী দর্শন ও আস্বাদন করিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন সংসাধিত করেন। তৃতীয় স্তরে, জ্যোতির্ম্ময়ী মা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান বা ইষ্টমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পান! —ভক্ত এই অনির্ব্বচনীয়া পরমাত্মময়ী মাতৃমূর্ত্তি বা ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অভীষ্ট লাভে কৃতকৃতার্থ হন—এইরূপে

---

* ইহাই গীতার ভাষায়—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।......নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।—১৩ অঃ ১৪ শ্লোক। অর্থাৎ ইনি [পরব্রহ্ম] সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় বিহীন হইলেও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় [চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়] ব্যাপারের দ্বারা অবভাসিত! [অর্থাৎ চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পারেন, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পারেন ইত্যাদি] এবং নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণ ভোক্তা।

আত্মসাধক, সর্ব্ববিধ মায়া-পাশ ও ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া, সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভ করেন।

জীব-দেহের কারণরূপ **মহত্তত্ত্বই** সত্ত্বগুণের আদি বিকার। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের সত্ত্বগুণময় দেবগণের বিভিন্ন তেজরাশি একত্রিত হইলে, উহা মহত্তত্ত্বরূপ কারণে লয় হইয়া, সাধকের চিদাকাশে জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত তেজপুঞ্জরূপে প্রকাশ পায়—মন্ত্রে ইহাই 'সুমহৎ তেজ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। জনৈক তান্ত্রিক মহাপুরুষ তাঁহার নিজ সিদ্ধির বিষয়ে বলিয়াছেন যে—তিনি যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করত, তদীয় গুরুদেবকে নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া মহাশ্মশানে জপ করিতে-ছিলেন; আধিভৌতিক বিভূতিসমূহ প্রকাশ পাইয়া সাধনা পণ্ড করিবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সাধক অচল অটলভাবে জপ করিতে লাগিলেন; অতঃপর সাধকের প্রতি লোমকূপ দ্বারা জ্যোতিঃরশ্মি নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিভাত হইলেন—তাঁহার দেহের জ্যোতিঃধারাতে শ্মশানভূমি আলোকিত হইল। তৎপর তাঁহার জ্যোতিঃরশ্মি-সমূহ সম্পূর্ণ নির্গত হইয়া, উহা দিক্‌দিগন্ত উজ্জ্বলকারী মহাজ্যোতিতে পরিণত হইল; সেই জ্যোতিঃ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উহার মধ্য স্থলে সাধকের ইষ্টদেবী প্রকাশিতা হইলেন; অতঃপর সেই জ্যোতির্ম্ময়ী-মূর্ত্তি ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক সাধকের নিকটে আসিয়া কথোপকথনান্তে, তাঁহাকে বর প্রদান করত অন্তর্ধান করিলেন!—মহাপুরুষের এই ব্যষ্টিভাবে সিদ্ধিলাভ বা দেবীদর্শন লীলার সহিত এখানে মন্ত্রে বর্ণিত মহাশক্তির আবির্ভাব লীলার অতি সুন্দর সাদৃশ্য এবং শিক্ষণীয় অপূর্ব্ব সার্থকতা আছে। উপরোক্ত সাধকের প্রতি লোমকূপ দ্বারা বহির্গত রশ্মিসমূহই তাঁহার দেহের প্রকাশভাবযুক্ত অনন্ত দেবতাগণ—ইহাই ত্রিদশ অর্থাৎ অনন্ত ব্যাপক ত্রিশ বা তেত্রিশ কোটী দেবতা বা দেবশক্তি সমূহ। তান্ত্রিক-

সাধকের এবম্বিধ সিদ্ধি 'বহিরঙ্গা', আর যখন দেহের অনন্ত জ্যোতিঃ রশ্মিসমূহ অন্তর্ম্মুখীভাবে একীভূত হইয়া সাধকের চিদাকাশে প্রকাশিত হয় এবং সাধককে পরমানন্দ প্রদান করে, তখন ঐরূপ সিদ্ধিকে 'অন্তরঙ্গা' বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ বহিরঙ্গভাবে—সাধক তদীয় ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যজগতে সচেতন রাখিয়া, ইষ্টদেবদেবীকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল মূর্ত্তিতে প্রকট্ করত দর্শন করেন; আর অন্তরঙ্গভাবে—নিজেকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত করিয়া চিদাকাশ অভিব্যক্ত করত, তথায় জ্যোতিঃ সমষ্টি মধ্যে সাধক আপন আপন ইষ্ট দেবদেবী দর্শন করেন! —এই প্রকার অনন্ত তেজপুঞ্জের একীভূত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিকেই মন্ত্রে, "সর্ব্বদেবশরীর সম্ভূতা নারীমূর্ত্তি"রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

যৌগিকভাবে—কুণ্ডলিনী-শক্তি নিক্রিয় দেবগণকে লইয়া একমুখে অনাহত পদ্মে উত্থিত হওয়ার পর, সেখানে ক্রমে দেবভাব সমুহ পুর্ণরূপে বিকাশ করিলেন; তৎপর তেজময় দীপ্ত দেবগণের তেজসমূহ আকর্ষণ করিয়া নিজ কারণময় দেহে বিলয় পুর্ব্বক বিশ্ববিমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী নারীমূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। —(৯-১৩)

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥ ১৪
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যঞ্চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥ ১৫
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥ ১৬
তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥ ১৭

ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮॥

সত্য বিবরণ। শম্ভুতেজদ্বারা সেই দেবীমূর্ত্তির মুখ, যমের তেজে কেশরাশি, বিষ্ণু-তেজে বাহু সকল।—(১৪)॥ সুধাকরের তেজে স্তন যুগল, ইন্দ্রতেজে দেহের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়, পৃথীবীর তেজে নিতম্বদেশ।—(১৫)॥ ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্য্যের তেজে পাদ অঙ্গুলি, অষ্টবসুর তেজে করাঙ্গুলি এবং কুবেরের তেজে নাসিকা।—(১৬) প্রজাপতি দক্ষগণের তেজে দন্তসমূহ এবং অনল তেজে ত্রিনয়ন।—(১৭)॥ সন্ধ্যাদেবীর তেজে ভ্রূযুগল এবং অনিল তেজে শ্রবণ যুগল; এইরূপে অন্যান্য দেবগণের তেজে অন্যান্য অবয়ব গঠিত হইয়াছিল; এইরূপে **সর্ব্বমঙ্গলা** মা আবির্ভূতা হইলেন।—(১৮)

তত্ত্ব-সুধা। বিভিন্ন দেবতার তেজদ্বারা মায়ের চিন্ময় অবয়ব গঠন লীলার অন্তরালে দেবতাগণের প্রতি মায়ের অপার করুণাই উৎসারিত—মা যেন দেবতাগণের বিশিষ্ট ভাবযুক্ত তেজসমূহ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন। জগন্মাতার এইপ্রকার দেহ-ধারণে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়াদির স্থূল বিকাশ দৃষ্ট হইলেও, উহা ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম পালনের জন্য প্রয়োজন হয় নাই—উহা ভক্তগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই সর্ব্বরূপময়ী মায়ের রূপের **শোভাবর্দ্ধন লীলামাত্র!** অর্থাৎ মায়ের দর্শনের জন্য চক্ষুর বিকাশ হয় নাই, কিম্বা শ্রবণের জন্যও কর্ণ, অথবা চলিবার জন্য পদের প্রয়োজন হয় নাই; কেননা মা যে গীতার ভাষায়—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে-সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" —অর্থাৎ মা সর্ব্বত্র হস্তপদ-বিশিষ্টা, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্টা এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া বিরাজিতা। বিশেষতঃ জীব দেহের সহিত মাতৃরূপের আকারগত সাদৃশ্য থাকিলেও, উহাতে বস্তু-

গত সাদৃশ্য নাই ; কেননা জীব-দেহ স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদে * পরিপূর্ণ ; কিন্তু মা যে সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত ত্রিবিধভেদ শূন্য— "একমেবাদ্বিতীয়ং।"

এক্ষণে কোন দেবতার তেজ মাতৃদেহের কোনস্থানে সুশোভিত তাহা মন্ত্রে ক্রমে প্রদর্শন করা হইয়াছে ; এখানেও তাহা কারণ সহ ক্রমে বিবৃত হইল (১) শম্ভু তেজ দ্বারা দেবীর মুখ—মস্তকই মন, বুদ্ধি অহং চিত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুহের অবস্থান কেন্দ্র, এজন্য মস্তক জ্ঞানের রাজ্য ; আর কণ্ঠ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত কর্ম্মের রাজ্য এবং উরুসন্ধি হইতে পদতল পর্য্যন্ত জড়ের রাজ্য। মায়ের মুখমণ্ডল জ্ঞানে ও প্রেমে সদা প্রদীপ্ত— এজন্য জ্ঞান মুর্ত্তি শম্ভুর তেজদ্বারা উহা গঠিত ; বিশেষতঃ দেবী-মাহাত্ম্যের অনেক মন্ত্রেই মায়ের বিলয় ভাবটিকে – 'মা ভক্ষণ করেন,' এরূপভাবে উক্তি করা হইয়াছে—এজন্য জ্ঞানময় সংহারকর্ত্তা শম্ভুর তেজেই মায়ের মুখমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। (২)যমের তেজদ্বারা মায়ের কেশরাশি—যম প্রলয়ের মুর্ত্তি, কাল বর্ণে সমস্ত রং মিশিয়া কাল হইয়া যায়; তাই কালবরণী কালী, যম বা কালেরও কালরূপা ; অর্থাৎ প্রলয়েরও প্রলয়রূপিণী ! এজন্য লয়ের প্রতীক্ নীলাঞ্জনমিশ্রিত কাল রঙ্ যুক্ত যমের তেজেই মায়ের কেশরাশি গঠিত ;

---

* স্বগত ভেদ যথা—নখ, চুল, রক্ত, মাংস, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির পরস্পর পরস্পরের সহিত ভেদ। স্বজাতীয় ভেদ—স্থুলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ ; অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি পঞ্চবিধ কোষ। বিজাতীয় ভেদ—দেহ এবং দেহী (আত্মা) ইহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতি-বাক্য উক্ত ত্রিবিধ ভেদ শূন্যত্বের পরিচায়ক যথা—ভগবান কিরূপ ? তিনি একং—এক অর্থাৎ স্বগতভেদ শূন্য ; 'এব'—সেইরূপ অর্থাৎ স্বজাতীয় ভেদশূন্য , অদ্বিতীয়ং—বিজাতীয়ভেদ পরিশূন্য। এই ত্রিবিধ ভেদ ব্যষ্টিভাবে জীব-দেহে যেরূপে অভিব্যক্ত, সেইরূপ সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডেও পরিব্যক্ত, যথা—জাগতিক বিভিন্ন বস্তুগত ভেদ—স্বগত ভেদ ; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অবস্থা এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত প্রভৃতি—স্বজাতীয় ভেদ , আর বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য সত্তা প্রভৃতি পরমাত্মময় স্বরূপভাবে এবং মায়াময় জগৎভাবে—বিজাতীয় ভেদ।

মহামুক্তির প্রতীক্ মায়ের মুক্তকেশ দর্শনকারী ভক্তগণের যম বা কালের ভয় বিদূরিত হইয়া অমরত্ব এবং অমৃতত্ব লাভ হয়। (৩) বিষ্ণুতেজে মায়ের বাহুসমূহ—দেহের শক্তি বা শারীরিক বল বাহুতেই সমধিক বিকশিত; বাহু দ্বয়ের অভাব হইলে, দৈহিক কর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত বাধা জন্মে; সুপ্রসিদ্ধ "বন্দেম'তরম্" সঙ্গীতে আছে—বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। মহাশক্তিরূপিণী কালিকা বিশ্বের সমস্ত বাহুবলরূপ শক্তিসমূহ একত্রিত করিয়া স্বকীয় কটি-দেশে বেষ্টনী করিয়াছেন। বিষ্ণু, বাহুরূপ প্রহরণ বা শক্তিদ্বারাই সুদীর্ঘকাল মধু-কৈটভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুই মহাশক্তির প্রতীক্ * আর বাহুতেই শক্তির বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; এজন্য বিষ্ণু তেজে মায়ের বাহুসকল। [মন্ত্রে বাহুসকল উক্তির অভিপ্রায় এই যে—মা চতুর্ভুজা অষ্টভুজা দশভুজা অষ্টাদশভুজা সহস্রভুজারূপে কথিতা এবং পূজিতা হন।]

(৪) সুধাকরের তেজে স্তনযুগল—অমৃতস্রাবী সুধাকর চন্দ্রমার জ্যোৎস্নাতেই ধান্য গম শাকসব্জী প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং ঔষধিসমূহ পুষ্টি প্রাপ্ত হয়; এইরূপে মাতৃদেহরূপ জগত দেহে সুনির্ম্মল সুধাকরতেজে পুষ্ট খাদ্য এবং ঔষধাদি আমরা মাতৃস্তন্য পানের ন্যায় গ্রহণ করত দেহ পুষ্ট করিয়া থাকি; মাতৃসাধক ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দরূপ স্তন্যসুধা পান করিয়া সচ্চিদানন্দময় নিত্যমুক্ত স্বভাববান হইয়া থাকেন। দেবী-মাহাত্ম্যের পরিশিষ্টে 'মূর্ত্তি-রহস্যে', ঋষি জগদ্ধাত্রী জগন্মাতার যুগ্ম-স্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ভক্তান্ সংপায়য়েদ্দেবী সর্ব্বকামদুঘৌ স্তনৌ"॥ —সেই

---

* তন্ত্র দিতে মধুকৈটভ-বধ বিষ্ণুরূপা কালিকার কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে;—"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে। ভোগে ভবানি পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপে চ কালী সমরে চ দুর্গা"॥ এই তন্ত্র বচনও বিষ্ণুকে শক্তিরূপা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং শক্তিমান বিষ্ণুর পৌরুষ প্রকাশও, শক্তিলীলা বলিলে ভুল হইবে না। দেবী-মাহাত্ম্যের অর্গলা স্তোত্রেও মাকে "মধুকৈটভবিধ্বংসি" বলিয়া স্তব করা হইয়াছে! বিশেষতঃ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

মহাদেবী ভক্তগণকে সর্ব্ববিধ কামনা পূরণকারী স্তনযুগল সযত্নে পান করাইয়া থাকেন। —এই সব কারণে সুধাকরের জ্যোৎস্নারূপ সুকোমল তেজে মায়ের স্তনমণ্ডলদ্বয় সুগঠিত।

(৫) ইন্দ্রতেজে দেহের মধ্যভাগ—নাভি প্রদেশ বা তেজময় মণিপুর পদ্মই দেহের মধ্যভাগ; দেহস্থ সপ্ত লোক মধ্যে স্ব বা দেবলোক মণিপুর চক্রেই অবস্থিত. সুতরাং দেব লোকের অধিপতি ইন্দ্রের তেজেই মায়ের মধ্যভাগ গঠিত। আর দেহের ভার-কেন্দ্র মধ্যভাগেই বিশেষরূপে পতিত হয়; এজন্য অধিক ভারবাহীগণ 'কোমরে' (কটিতে) বেদনা অনুভব করে; আবার বৃদ্ধকালে দেহ-মধ্যটী উর্দ্ধদেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া বাঁকিয়া যায়। ইন্দ্র সুবৃহৎ বজ্রধারী এজন্য তাঁহার কটিদেশ খুব সুদৃঢ়—তাই ইন্দ্র তেজে মায়ের মধ্যভাগ গঠিত। (৬) বরুণের তেজে মায়ের জঙ্ঘা ও উরুদ্বয়—জীবদেহে মুলাধার হইতে উর্দ্ধদিকে ক্রম-প্রকাশক অবস্থা, আর উরু-সন্ধি হইতে নিম্নদিকে ক্রম-অপ্রকাশ বা জড় অবস্থা; শ্রুতি বরুণকে দুঃখদায়ীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; অজ্ঞানতা মূলক অপ্রকাশ বা জড় অবস্থাই জীবের দুঃখের কারণ, এজন্য অপ্রকাশ অবস্থাময় রাত্রাভিমানী দেবতা বন্ধনকারী বরুণের তেজেই মায়ের জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় গঠিত। আবার, বরুণের বিশেষ প্রবাহ বা গতি-শক্তি আছে, এজন্য গতি-শক্তির মূল আশ্রয় স্বরূপ মায়ের জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় বরুণের তেজে গঠিত! (৭) পৃথিবীর তেজে নিতম্বদেশ—জীবদেহে মূলাধার-চক্র ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ ক্ষিতি-তত্ত্বময়; ইহা প্রথম চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে; নিতম্ব ক্ষিতি-তত্ত্বের বা পৃথিবীর জমাট্ অংশ বিশেষ; সুতরাং পৃথিবীর তেজে বা ক্ষিতি-তত্ত্বে মায়ের নিতম্ব।

(৮) ব্রহ্মার-তেজে মায়ের পদযুগল—জ্ঞানভক্তির রত্নাকরস্বরূপ সর্ব্বজ্যোতিঃ ও তেজের আধার, অলক্তরাগ-রঞ্জিত মায়ের অভয় পদযুগল—বিশুদ্ধ রজোগুণময় রক্তবর্ণ অতি পবিত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার তেজে গঠিত;

পরম তেজস্বী ক্রিয়াশক্তিময় ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চারিটী বেদ-গাঁথা উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মময়ী মায়েরই স্তব করিতেছেন—তাঁহারই জ্ঞান ভক্তি ও ক্রিয়া মিশ্রিত তেজরাশি মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পিত!—ব্রহ্মা যেন 'অলক্ত জল' বা 'আলতা'রূপে মায়ের শ্রীচরণতলে সুশোভিত! পদতলকে আশ্রয় করিয়াই ইতস্ততঃ গমনাগমন করা সম্ভব হয়; আবার ইতস্ততঃ সঞ্চালনে স্পন্দন বা কম্পনের অভিব্যক্তি হয়; এই কম্পনই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আদি কারণ। এজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ বা আদি দেবতা ব্রহ্মা, ক্রিয়াশক্তিময় কম্পন বা স্পন্দনভাবসহ, সর্ব্বত্র গমনশীলা মায়ের শ্রীপাদপদ্মে রজোগুণময় প্রেমানুরাগরূপে সুশোভিত এবং আশ্রিত! (৯) সূর্য্যের তেজে পাদ-অঙ্গুলি—সূর্য্যদেব মাতৃশক্তিতে ও মহিমাময় মাতৃতেজে পূর্ণতেজস্বী এবং উজ্জ্বল হইয়া সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হইয়াছেন; ভক্তগণের আনন্দদায়ক, মায়ের জ্যোতির্ম্ময় শ্রীপদকমলের অঙ্গুলিসমূহে সতত প্রেমের বিজলী খেলিতেছে!—ঝলকে ঝলকে যেন প্রেমানন্দময় উজ্জ্বল জ্যোতিঃসহ সুধা ক্ষরিত হইতেছে!—মায়ের এই তেজময় পদাঙ্গুলি অর্কতেজে গঠিত—মায়ের পদ-নখরে যেন আদিত্যদেব আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং শোভা বিস্তার করিতেছেন।

[বৈকৃতিক রহস্যে মায়ের যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত উপরোক্ত বর্ণনার সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে, যথা—রূপ-সৌভাগ্যশালিনী বিচিত্র-মাল্যাম্বরধারিণী মহিষ-মর্দ্দিনীর মুখমণ্ডল শুক্লবর্ণ, বাহুসমূহ নীলবর্ণ, স্তনযুগল উৎকৃষ্ট শুক্লবর্ণ, মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা ও উরু নীলবর্ণ এবং চরণযুগল রক্তবর্ণ। মুখের শুক্লবর্ণ—শম্ভুতেজ; বাহুর নীলবর্ণ—বিষ্ণুতেজ, উৎকৃষ্ট শুক্লবর্ণ—চন্দ্রতেজ; মধ্যভাগ রক্তবর্ণ—অগ্নিতত্ত্বময় মণিপুরস্থ স্বর্লোক-অধিপতি রজোগুণান্বিত ইন্দ্রতেজ; জঙ্ঘা উরু নীলবর্ণ—জড়ত্ব ও অজ্ঞানতা প্রতিবিম্বিত, নীলাভ জলধিপতি বরুণের তেজ এবং চরণ-যুগলের রক্তবর্ণ—ব্রহ্মতেজ।]

(১০) অষ্টবসুর-তেজে করাঙ্গুলি—করাঙ্গুলিই দেহের অভাব পূরণকারী বসুগণের প্রধান সহায়ক; আর যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত অতুলনীয় ভক্তিধনে ধনী গঙ্গা-নন্দন বসুগণ, সৌম্য এবং বরদাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ; এজন্য মায়ের স্নেহময় অতিসৌম্য বরাভয়দাতা করাঙ্গুলিসমূহ সত্ত্বগুণময় বসুগণের-তেজে গঠিত। (১১) কুবেরের তেজে নাসিকা—পৃথিবীর গুণ গন্ধ; শব্দাদি পঞ্চ-বিষয় গন্ধতত্ত্বেই পর্য্যবসিত; গন্ধতত্ত্বের পূর্ণবিকাশযুক্ত সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ঐশ্বর্য্য ও ধনরত্নাদি, ভুমণ্ডলের কেন্দ্রস্বরূপ সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থিত কুবেরের ভাণ্ডারে সঞ্চিত—এজন্য কুবেরের তেজদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা গঠিত।

(১২) প্রজাপতির তেজে দন্তসমূহ—প্রজাপতি দক্ষগণ. ক্রিয়াশীলতা, বিশুদ্ধতা, এবং দৃঢ়তার জন্য প্রসিদ্ধ; এই ভাবত্রয় সৃষ্টি-স্থিতি লয়ের দ্যোতক—অর্থাৎ ক্রিয়াশীলতা (রজোগুণ) দ্বারা সৃষ্টি, বিশুদ্ধতা (সত্ত্বগুণ) দ্বারা স্থিতি এবং দৃঢ়তা (তমোগুণ) দ্বারা লয় কার্য্য হইয়া থাকে। এজন্য মায়ের সুদৃঢ়. বিশুদ্ধ এবং হাস্যবিকাশরূপ আনন্দভাবে সতত ক্রিয়াশীল দন্ত পঙ্‌ক্তি, প্রজাপতি তেজে গঠিত। শ্রুতি বলেন—আনন্দেই ভূতগণের সৃষ্টি, আনন্দেই স্থিতি এবং আনন্দেই লয়; মায়ের হাসিতেও এইরূপ পরিপূর্ণ আনন্দের বিকাশ!—জীব-সৃষ্টিতে মায়ের আনন্দযুক্ত হাস্য বিকাশ, আর খাদ্যদ্রব্য দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করত পরিপাক বা পালন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়াও মায়ের হাসির অভিব্যক্তি; আবার ধ্বংস-লীলাতেও মা করাল বদনে জীবজগতকে চর্ব্বণদ্বারা লয় করিয়া অট্টহাস্য করত আনন্দ প্রকাশ করেন—এইরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে জগন্মোহন আনন্দরূপ হাস্যের অপূর্ব্ব শোভায় মায়ের দন্ত-মুক্তাপাতি সুবিকশিত। (১৩) অনল-তেজে ত্রিনয়ন—মায়ের তিনটী নয়নেও সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ভাব বিরাজিত; যথা—প্রথম নয়ন, সূর্য্যস্বরূপ (সৃষ্টিকারক ভাবযুক্ত); দ্বিতীয় নয়ন—সুধাকর চন্দ্রস্বরূপ (পালন বা পুষ্টিকারক ভাবযুক্ত) এবং

তৃতীয় বা ঊর্দ্ধ নয়ন—কালাগ্নি স্বরূপ (লয়কারক জ্ঞানভাবযুক্ত); আর সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নি তিনটীই তেজ-তত্ত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি—এজন্য মায়ের ত্রিনয়ন তেজরূপী অনল হইতে উদ্ভব।

(১৪) সন্ধ্যা দেবীর তেজে ভ্রূযুগল—প্রকৃতি দেবীর প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ং সন্ধ্যার অপূর্ব্ব দৃশ্যময় মহিমা ও মধুরীমা, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই দর্শন করিয়া মোহিত হন—নীল বর্ণের সহিত পীত ও রক্তিম বর্ণ যুক্ত হইয়া প্রাতঃ এবং সান্ধ্য আকাশকে সুচিত্রিত করে—এই সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজ, মায়ের ভ্রূযুগলে প্রতিফলিত ও সুশোভিত। বিগত ১৩২৪ সালে গারোহিল-যোগাশ্রমে যোগ-সাধন করা কালীন আমার একটী প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়ে এখানে জানাইতেছি যে—বিভিন্ন বেদে এবং অন্যান্য গ্রন্থে ত্রিসন্ধ্যায় ধ্যেয় গায়ত্রী মূর্ত্তির রং বা বর্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখিয়া কোন্ কোন্ রং বর্ত্তমান কালের উপযোগী বা ধ্যেয় ইহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হই; তৎপর একদিন সন্ধ্যাকালে তন্ময় ভাবে বসিয়া আছি, হঠাৎ অন্তরে দৈববাণী শুনিলাম—"এই দেখ গায়ত্রীর রং"—এই বাণী শোনামাত্র আমার চিত্ত অন্তর্ম্মুখী হইয়া গেল; তখন আমি লাল, নীল এবং পীত এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত সুদীর্ঘ পতাকার ন্যায় সমুজ্জ্বল একটী দৃশ্য দ্বারা অর্দ্ধ-আকাশ পরিব্যাপ্ত, এরূপ অন্তরাকাশে দর্শন করিলাম—এইরূপে গায়ত্রী মায়ের একত্রে ত্রিমুর্ত্তির অপূর্ব্ব রঙ্ দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম! অর্থাৎ প্রাতে—ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণীরূপা গায়ত্রী, রক্তবর্ণা; মধ্যাহ্নে—বিষ্ণু বা বৈষ্ণবীরূপা গায়ত্রী, নীলবর্ণা; আর সায়াহ্নে রুদ্র বা রুদ্রাণীরূপা গায়ত্রী, পীতাভশুক্ল বা পীতবর্ণা *। ঐরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতির

---

* প্রাকৃতিক জগতে বৃক্ষপত্রে সৃষ্টিস্থিতি লয়াত্মক্ ত্রিগুণের ত্রিবিধ রংযুক্ত ভাব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অশ্বথ, বিল্ব, আম্র, নিম্ব প্রভৃতি অনেক বৃক্ষেরই পত্রগুলি সৃষ্টি বা কচি অবস্থায় রক্তাভ রংযুক্ত হয়, তৎপর স্থিতি অবস্থায় সবুজ রং ধারণ করে, পরিশেষে ঝরিয়া পড়ার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পীত বর্ণযুক্ত হয়—উহাই লয়কারী রং।

পর আমি সর্ব্বত্র বেদমাতা গায়ত্রীর সুরঞ্জিত ত্রিবর্ণ দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি! অর্থাৎ বিভিন্ন দৃশ্যে গায়ত্রী দর্শন করিয়া থাকি, যথা—রামধনুতে প্রধানতঃ ত্রিবর্ণের বিকাশ; আকাশে কোন নক্ষত্রে পর পর উপরোক্ত ত্রিবর্ণ প্রতিফলিত হয়। জলে তেল পড়িলেও ত্রিবর্ণময়ী গায়ত্রীর অভিব্যক্তি. রান্না করাবস্থায় অগ্নির উত্তাপে পিতলের হাড়ির গায়েও ত্রিবর্ণ চিত্রিত হয়; মটরগাড়ী চলিয়া গেলে, তৈলাক্ত গ্যাস ভিজা রাস্তায় পড়িয়াও গায়ত্রীর বিকাশ; ত্রিধারযুক্ত কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক দেখিলেও গায়ত্রীর উজ্জ্বল ত্রিমূর্ত্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়; এইরূপে প্রাতঃ সন্ধিতে পূর্ব্বাকাশে এবং সায়ংকালে পশ্চিমাকাশে, বিচিত্র রংএর খেলা এবং ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত গায়ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আমি মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ ও আনন্দিত হইয়া থাকি। বর্ণ বা রং সাতটি হইলেও উপরোক্ত তিনটি রঙ্‌ই মূল এবং প্রধান, আর অবশিষ্ট রঙ্‌ মিশ্রভাবে উৎপন্ন। গায়ত্রীরূপিণী ত্রিবর্ণের এবং সপ্তবর্ণের মিলিত অবস্থায় সূর্য্যরশ্মিবৎ জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ কিম্বা সর্ব্ববর্ণের লয়কারী কৃষ্ণবর্ণ—এই শ্বেত এবং কৃষ্ণের মিলনই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক্ ব্রহ্ম বা শিবকালী! —এইরূপে প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ং সন্ধ্যাতে অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্যময়ী ত্রিবর্ণরূপিণী গায়ত্রীর রূপ দ্বারাই মায়ের ভ্রূযুগল সুগঠিত, বিশেষত; রাত্রিকালে মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে পর পর লাল নীল এবং হলদে (পীত) এই ত্রিবর্ণ, কোন কোন নক্ষত্র মধ্যে পর্য্যায় ক্রমে উদ্ভাসিত হয়—ইহাতেও গায়ত্রী মূর্ত্তি অনায়াসে দর্শনকরা যাইতে পারে।

(১৫) অনিল-তেজে শ্রবণ যুগল—শব্দ আকাশতত্ত্ব হইতে উদ্ভব হইলেও উহা বায়ুর সাহায্যেই পরিচালিত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়—বায়ূ হীন স্থানে স্থূল শব্দের বিকাশ হয়না। জলে ছোট বা বড় ঢিল ছুড়িলে যেমন বিভিন্ন প্রকার তরঙ্গাঘাতে বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বায়ুর স্তরে, বাক্য বা শব্দের আঘাতে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া রূপ বা আকার

ধারণ করে ; সেই রূপ-তরঙ্গই কর্ণ-কুহরে আঘাত করিলে, পুনরায় শব্দের অভিব্যক্তি হয়। শব্দ-তরঙ্গ কোনপ্রকারে উচ্চ আকাশে উত্থিত করিতে পারিলে, উহা সেখানে বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায়, এক স্তর সঙ্গীয় অপর স্তরকে ধাক্কা দেয়, ক্রমে উহা অনন্তে বিলীন হয় ; যন্ত্রদ্বারা ঐরূপ তরঙ্গ ধরিতে পালিলে, সুদূর স্থানেও ঐ রূপ-তরঙ্গের আঘাতে অনুরূপ শব্দের অভিব্যক্তি হইবে—উহাই বর্ত্তমান কালে "রেডিও" দ্বারা শব্দ পরিচালনা ও গ্রহণ করা। গ্রামোফোনের গানেও—বায়ু পরিচালিত শব্দ-তরঙ্গ বিভিন্নভাবে ও আকারে 'রেকর্ডে'র নরম অবস্থায় আঘাত করিয়া সূক্ষ্ম দাগ বা রূপরাশি সৃষ্টি করে—এইরূপে উহাতে তরঙ্গায়িত রূপসমষ্টি সঞ্চিত হইবার পর, ক্রমে উহা দৃঢ়ভাব ধারণ করে ; তৎপর ঐ সঞ্চিত রূপসমষ্টি পুনরায় আঘাত প্রাপ্ত ও তরঙ্গায়িত হইয়া শব্দ বা সঙ্গীত বিকাশ করে। এইরূপ নিয়মে, প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারিত হইয়া বায়ুস্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে, এইসব কারণে বীজ মন্ত্রাদির যথাযথ রূপ এবং রাগ-রাগিণী প্রভৃতির বিশিষ্ট রূপময়ী মূর্ত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। জাগতিক প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির নাম যেমন সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অভেদ ও অচ্ছেদ্য, কোন ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিলে যেমন, সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয় এবং সেই ডাকে অভিলষিত ব্যক্তিই আসিয়া উপস্থিত হয় ; সেইরূপ শব্দময় নাম, তৎপ্রতিপাদ্য রূপময় দেবদেবী বা ইষ্টভাবের সহিত অভেদভাবে বিজড়িত। এজন্য যথাবিধি মন্ত্র জপ দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্য রূপময় দেবতার আবির্ভাব সম্ভবপর হয় !—এইসব কারণে, অনিল বা বায়ুর তেজে মায়ের শ্রবণ যুগল গঠিত। এইরূপে দেহ-পুরের সমস্ত দেবতাগণ আপন আপন প্রকৃতি বা তেজময় বিশিষ্ট স্বভাব মাতৃ-দেহে সমর্পণ করতঃ মাতৃ-দর্শনে আত্মহারা হইয়া পরমানন্দিত হইলেন।—(১৪—১৮)

ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশি-সমুদ্ভবাম্ ।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ ॥ ১৯

সত্য বিবরণ।—অনন্তর মহিষাসুর-নিপীড়িত দেবগণ তাঁহাদের তেজোরাশিসম্ভূতা সেই দেবীকে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।—(১৮)

তত্ত্ব-সুধা।—আসুরিক ভাব-চাঞ্চল্যে পরাজিত ও নির্য্যাতিত আর্ত্ত-সাধক নিজের দৈন্য ও দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়াছেন; মাতৃকৃপায় তাঁহার দেবভাব সমূহ সম্মিলিত হইয়া মহাশক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। সাধক চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্র করিয়া শরণাগত হওয়ায়, তদীয় চিদাকাশে মায়ের আবির্ভাব-লীলা দর্শন করিয়াছেন—মাতৃদেহে বিভিন্ন দেবভাবীয় বিশিষ্টতা এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য দর্শন করিয়াও পুলকিত হইয়াছেন। ক্রমে তিনি নিঃসংশয়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে—দেহস্থ বিভিন্ন প্রকৃতি বা খণ্ড খণ্ড শক্তি সমূহ একমাত্র মহাশক্তিরই অংশস্বরূপ! এইরূপে জ্যোতিঃ বা মাতৃদর্শনে কৃতার্থ সাধক নিজ প্রকৃতিরূপিণী শক্তিসমূহকে মহাশক্তিতে বিসর্জ্জন দিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে মহাশক্তিরূপে অনুভব করত আহ্লাদিত হইলেন।

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্ ।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ ॥ ২০

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈহুতাশনঃ ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী ॥ ২১

সত্য বিবরণ—পিণাকধারী মহেশ্বর নিজ শূল হইতে শূল নিষ্কাসিত করিয়া দেবীকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণও স্বীয় চক্র হইতে চক্র (ও গদা) তাহাকে দান করিলেন।—(২০)॥ বরুণ স্বীয় শঙ্খ হইতে একটি শঙ্খ বাহির করিয়া দান করিলেন; এইরূপে অগ্নি, শক্তি নামক অস্ত্র এবং পবনদেব ধনু ও অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীরযুগল দান করিলেন।—(২১)

তত্ত্ব-সুধা—প্রত্যেক দেবতার অস্ত্র তাঁহার নিজ বল বা শক্তির প্রতীক্; সুতরাং অস্ত্রত্যাগ দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভাবাপন্ন শক্তি বা বলসমূহ দেবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। দেবতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তিরূপ অস্ত্রগুলি একমাত্র মহাশক্তি হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দান লইয়াই ব্যস্ত বা উন্মত্ত থাকায়, দানীর কথা ভুলিয়া গেলেন—প্রসাদ ভোগের বিহ্বলতায় জগন্নাথকে বিস্মৃত হইলেন! তাই তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য, অসুরের অত্যাচাররূপ মাতৃকৃপা প্রকাশিত হইয়া খণ্ড খণ্ড দেবশক্তিসমুহ পরাজিত করিল। তৎপর আত্ম-দোষ দর্শনকারী দেবগণ সংঘবদ্ধ হইয়া, আত্ম-তেজ বা শক্তি, যাহা মহাশক্তি হইতেই পাইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও শরণাগত হইলেন।

লক্ষ্মী-তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর উক্তিদ্বারা অস্ত্র সমর্পণের তাৎপর্য্য সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—মহিষ-মর্দ্দিনী ইন্দ্রকে বলিতেছেন— "হে দেবগণ! আমারই শক্তিলেষ সমুহ, যাহা তোমাদের শরীরে নিহিত ছিল; এক্ষণে তাহা আমি আকর্ষণপূর্ব্বক একত্রিত করিয়া, এই পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছি; আমারই বিভিন্ন অস্ত্র সমূহ যাহা এতকাল আমারই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে তোমাদের নিকটে নানা প্রকার অস্ত্রের আকারে অবস্থান করিতেছিল, তাহা এক্ষণে আমি গ্রহণ করিলাম"। এখানে উপনিষদের সুপরিচিত গল্পটিও উল্লেখযোগ্য, যথা—দেবগণ কতিপয় অসুর নিধন করিয়া অতিগর্ব্ব প্রকাশ করাবস্থায়, হৈমবতী উমা তথায় একটি তৃণ খণ্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং গর্ব্বিত দেবতাগণকে উহা নষ্ট করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন বায়ু ঐ তৃণ খণ্ড উড়াইতে সক্ষম হইলেন না, অগ্নি উহাকে দগ্ধ করিতে অক্ষম হইলেন, ইন্দ্র বজ্রাঘাতে উহা কিছুমাত্রও বিকৃত করিতে পারিলেন না; এইভাবে সকল দেবগণের

গর্ব্ব চূর্ণ হইল। মহাশক্তির বিকাশে, দেবগণের স্ব স্ব খণ্ড শক্তিসমূহের অস্তিত্ব আত্ম-হারা বা লুপ্ত হইয়া যায়, ইহাই প্রতিপন্ন হইল—এইরূপে দেবগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শক্তি সমূহ যে এক মাত্র মায়েরই শক্তি, ইহা উপলব্ধি করত মাতৃ-চরণে প্রণতি পূর্ব্বক শরণাগত হইলেন। সত্ত্বগুণময় সাধকগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রকাশময় বা দেবভাবাপন্ন যে সকল বৃত্তি বা ভাবের অভিব্যক্তি হয়, উহা যে মায়েরই শক্তি বা কৃপা, ইহা উপলব্ধি করাও অস্ত্রসমর্পণ—এইরূপে মাতৃ-চরণে সৎ অসৎ সর্ব্ববিধ ভাবরাশি অর্পণ বা নিবেদন করত, নির্ভরশীল ও শরণাপন্ন হওয়াই অস্ত্র সমর্পণের তত্ত্ব ও রহস্য।

শূল হইতে শূল, চক্র হইতে চক্র নিষ্কাসন ভাবটী এই—দেবগণের অস্ত্রগুলি যে মহাশক্তিরই বিভিন্ন শক্তি বিশেষ, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে; যে অস্ত্রটী দেবী গ্রহণ করিলেন—উহা প্রাণময় ও শক্তিময়; আর যে অস্ত্রটি দেবতার হাতে রহিল—উহা শক্তিহীন ও প্রাণহীন কায়ামাত্র। ঐ জড়ভাবাপন্ন কায়াটীও যদি দেবতার হাতে না থাকে, তবে সর্ব্ববিমোহন দেবতার রূপটী অশোভন হইয়া পড়ে; এজন্য দেবতাগণের শোভা সম্পাদনের নিমিত্তই যেন এক একটী কৃত্রিম অন্তঃসার শূন্য অস্ত্র তাঁহাদের হস্তে ধৃত রহিল—ইহাই শূল হইতে শূল এবং অন্যান্য অস্ত্র নিষ্কাসনের তাৎপর্য্য।

মহাশক্তির হস্তে ধৃত শক্তিময় প্রধান আঠারটী অস্ত্রের *

* শিব কৃষ্ণ ব্রহ্মা ইন্দ্র বায়ু অগ্নি বরুণ যম বিশ্বকর্ম্মা ও কুবের, এই দশজন প্রধান দেবতা দেবীকে মোট আঠারটি প্রধান অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন; অম্বুপতি বরুণেরই নামান্তর, আর কাল যমের নামান্তর; সুতরাং মন্ত্রে এই চারিটি দেবতার নাম থাকিলেও, প্রকৃত গননায় দুইজন দেবতাই ধরিতে হইবে। বৈকৃতিক রহস্যে মায়ের হস্তধৃত এখানকার অনুরূপ আঠারটি অস্ত্রের উল্লেখ আছে, এজন্য মা অষ্টাদশ ভুজা মহালক্ষ্মীরূপে পূজিতা হন; আর দশ জন দেবতা ঐ অস্ত্রগুলি প্রদান করেন, এজন্য দেবী দশভুজা দুর্গারূপে পূজিতা হন। আর অন্যান্য দেবগণও দেবীকে অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন, এজন্য দেবীকে বহুত্বের পরিজ্ঞাপক সহস্রভুজাও বলা হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্য ও **সমর্পণ-রহস্য** ক্রমে সংক্ষেপে পৃথক্ ভাবে এখানে এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র সমূহে বিবৃত হইবে; কেননা এখানে প্রতিপাদ্য মন্ত্র-সমুহের তাৎপর্য্যই, যুদ্ধকালে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত ক্রমে যথাযোগ্য স্থানে প্রদর্শন করা হইবে। (১) ত্রিশূল—সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্যোতক; এই ত্রিশূলের মধ্য শূলটিই লয়কারী ভাবযুক্ত জ্ঞানস্বরূপ, আর অন্য দুইটী শাখা সৃষ্টি ও স্থিতি জ্ঞাপক। ইহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান এবং দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন—পরমাত্মশক্তির এই ত্রিধা অভিব্যক্তির ভাব বা ত্রিপুটী বিভাগ বিদ্যমান। ব্যষ্টি ভাবে, জ্ঞাতারূপে রজোগুণময় অহং বা আমি; জ্ঞেয়রূপে তমোগুণাত্মক বিষয়-প্রপঞ্চ আর জ্ঞানরূপে প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণেরই অভিব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত দেহের জ্ঞানরূপী চৈতন্য বা মহেশ্বরও, জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, কিম্বা দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন, এই ত্রিধারূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া, অর্থাৎ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাহিরে (বাহ্য জগতে) অখণ্ড চেতনাকে উপরোক্ত ত্রিপুটীরূপে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, নিজেই নিজকে দর্শন ও আস্বাদন করিতেছেন! ত্রিগুণময় ত্রিশূল অর্পণ দ্বারা সাধকের জ্ঞানের ত্রিধা বিভাগ, অখণ্ড চৈতন্যে লয় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইল - ইহাই শূল নিষ্কাসনের তাৎপর্য্য। (২) চক্র—পালন বা স্থিতিকারিণী বৈষ্ণবী শক্তির অস্ত্র; মহামায়া সংসার-স্থিতি কার্য্যে, এই চক্রাস্ত্র দ্বারা সংসার-চক্রে জীবকে মোহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেন; আবার তিনিই প্রসন্না হইলে, ঐ চক্রাস্ত্র দ্বারাই মায়া-মোহ ছেদন করিয়া জীবকে মুক্তি প্রদান করেন। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি-কারী প্রাণরূপী বিষ্ণু, বৈষ্ণবীশক্তি চক্রের প্রভাবে 'আমি-আমার' রূপ মোহ-মমতাতে সংসার-চক্রে জীবকে আবদ্ধ করায়, সে প্রাণ ঢালিয়া বিষয়-সেবাপরায়ণ হইয়াছিল; এক্ষণে স্বাভাবিক নিয়মে ভোগাসক্তির দিক্ হইতে ফিরিয়া আত্মাভিমুখী বিলোমগতি হওয়ায় মাতৃ-কৃপা লাভে সাধক সংসার লীলাকে মহামায়ার চক্র বলিয়া বুঝিতে পারায়, তাহার সংসারের

৩

ঐকান্তিক মোহ এবং আসক্তি দূর হইল, সাধক নিষ্কাম ও অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন—ইহাই 'চক্র সমর্পণের' তাৎপর্য্য।

(৩) গদা—লয়কারী আত্মজ্ঞান; সাধক সংসার-ভোগে বিতৃষ্ণ ও ত্যাগ-বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করাইবার জন্য যোগ-পথ অবলম্বন করিলেন; তাহার এই সংসার বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্য ভাবই তাহার পক্ষে সর্ব্বলয়কারী গদারূপে ক্রিয়াশীল হইল। তৎপর ক্রমে মাতৃকৃপা প্রাপ্ত হওয়ায়, সাধক বুঝিতে পারিলেন—বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, তিনি যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও মাতৃময় আত্মময় এবং ভগবন্ময়! এই প্রকার জ্ঞানময় দৃষ্টি প্রসারিত হইলে, ত্যাগের বা বৈরাগ্যের কিছুই থাকে না; তখন অনুভব হয়—"মদাত্মা সর্ব্ব-ভূতাত্মা" এইরূপে সাধকের সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব ও অজ্ঞানতা লয় হইয়া আত্মজ্ঞানের উদয় হইল!—ইহাই গদা সমর্পণের তাৎপর্য্য। (৪) শঙ্খ—শব্দ ও স্পন্দনময় সৃষ্টিকার্য্যের প্রতীক্। যাবতীয় মাঙ্গলিক কার্য্যাদির সৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রারম্ভে শঙ্খ-নিনাদ করা হয়—ইহাতে একদিকে ধর্ম্মভাব সৃষ্টিহেতু ধার্ম্মিকের হৃদয়ে আনন্দ-স্পন্দন উৎপাদন করে; আবার অধার্ম্মিক বা পাপীর হৃদয়ে উহা দুঃখময় কম্পন বা ভীতি সৃষ্টি করে; তাই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান স্বয়ং শঙ্খ নিনাদ করিয়াছিলেন—উহাদ্বারা একদিকে ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণকে স্বধর্ম্ম পালনে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছিল, আবার অন্যদিকে অধার্ম্মিক কৌরবগণের বা শত্রুগণের অন্তরে দুঃখময় ভীতি উৎপাদন করা হইয়াছিল! এজন্য গীতার উক্তি—"সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি দুর্য্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করিল।" অপ্রকাশ অবস্থাময় দুঃখদায়ী বরুণদেব জীবকে দুঃখময় কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন—মৃত্যুর মধ্য দিয়াই জীবকে অমৃতের দিকে পরিচালনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বিষয় ভোগ করাইয়া ক্রমে উহার দোষ প্রদর্শন করত, বিষময় জ্বালা অনুভব করান; তখন সাধকের চিত্ত-

ক্ষেত্রে শঙ্খরূপ ধর্ম্মভাব সৃষ্টিকারী স্পন্দনের অভিব্যক্তি হয়, তৎপর ক্রমে সাধক যখন মাতৃকৃপা লাভ করেন, তখন তিনি দুঃখকে বা ত্রিতাপ জ্বালাকে মায়ের আশীর্ব্বাদ এবং দানরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কিম্বা দুঃখের মধ্যেও মাতৃরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন—এইরূপে সুখে দুঃখে সমভাব রক্ষা করিয়া অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন—ইহাই মাতৃ করে শঙ্খ সমর্পণ।

(৫) শক্তি—পূর্ণবল বা প্রাণপণ সামর্থ্যের প্রতীক্—ইহাতে প্রাণময় বায়ুতত্ত্বও নিহিত। প্রাণপণে বা পূর্ণবল প্রয়োগ না করিলে, সামর্থ্যবান শত্রুকে জয় করা যায় না। আর হুতাশন বা অগ্নি বায়ুর সাহায্যেই প্রজ্বলিত এবং বায়ু-ভরে সম্বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; শারীরিক বা মানসিক শক্তিও বায়ুর সহায়তায় লাভ হইয়া থাকে। ব্যায়ামাদি দ্বারা প্রাণ বায়ুর ব্যতিক্রমে ও উৎকর্ষে স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি শক্তি লাভ করে ; অবার আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণায়ামাদি বায়ুর ক্রিয়াদ্বারা সাধক মানসিক শক্তি লাভ করিয়া তেজস্বী হন। এই সব কারণে শক্তির সহিত বায়ুতত্ত্ব একাত্মভাবে জড়িত। বিশেষতঃ বায়ুরূপী প্রাণই জীবের জীবনী-শক্তি। সাধক প্রাণপণে কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক সংযমী হইয়া প্রাণবায়ুকে আয়ত্ব করত শক্তিময় ও তেজস্বীরূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে কোমল ও প্রেম-দৃষ্টসম্পন্ন হইতে হইবে ; (এবিষয়ে, এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে) ; সুতরাং মাতৃকরে শক্তি অর্পণ দ্বারা সাধকের উগ্র ও কঠোর ভাব সমূহ বিদূরিত হইয়া, তিনি সর্ব্বতোভাবে কোমল ও প্রেমভাবাপন্ন হইলেন !—ইহাই শক্তি অর্পণের তাৎপর্য্য।

(৬) চাপ—ধনুর 'জ্যা' নিঃসৃত টঙ্কারে বা প্রলয়কারী শব্দে শত্রুগণ হৃতবল ও স্তম্ভিত হয় ; আকাশের গুণ শব্দ, ধনু হইতেও শব্দ উৎপাদিত হয়, আকাশে রামধনুও প্রতিফলিত হয় ; আর ধনুর অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারের সহিত ঊর্দ্ধাকাশের অর্দ্ধমণ্ডলের সাদৃশ্য আছে—এইসব কারণে

ধনুতে আকাশ-তত্ত্বের ভাব বিদ্যমান। সাধক প্রণব-ধনুতে, জপরূপ শব্দ ও রূপময় 'জ্যা' আরোপ করত, চিত্তের একাগ্রতারূপী বাণ যোজনা করিয়া পরমাত্মময় ভগবানকে লক্ষ্য করত সাধনা করিতেছিলেন, মাতৃকৃপায় আত্মজ্যোতিঃ বা ইষ্টস্বরূপ প্রকাশ পাওয়ায়, তিনি শব্দময় জপ এবং রূপময় ধ্যান জনিত নিঃসঙ্গভাব পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন—ইহাই 'চাপ' সমর্পণের তাৎপর্য্য। (৭) বাণ —তূণীরস্থিত বাণ বহুসংখ্যক হইলেও উহার লক্ষ্য-বস্তু একসঙ্গে একটি ব্যতীত দুইটি হইতে পারে না; যুগলতূণীরের তাৎপর্য্য এই যে, একটীর লক্ষ্য পরমাত্মা, আর অপরটীর লক্ষ্য পরিচ্ছিন্ন বিষয়ভোগ। বহুত্বের ভাব নষ্ট করিয়া, বিভিন্ন দিক্ হইতে অন্তঃকরণেকে ফিরাইয়া একলক্ষ্যে সমাহিত করাই বাণ অস্ত্রের ক্রিয়া; বিশেষতঃ লক্ষ্যস্থির না হইলে, বাণদ্বারা কোন অভীষ্ট বস্তুই বিদ্ধ করা যায় না। পরমাত্ম-লক্ষ্যে চিত্ত-স্থির ক্রিয়ার সাফল্যে আনন্দ-রসের অভিব্যক্তি; আর বৈষয়িক লক্ষ্য বা আকাঙ্খিত বস্তু প্রাপ্তিতেও রস বা আনন্দ লাভ হয়; আবার লক্ষ্য বস্তু বাণবিদ্ধ করিতে পারিলে, ধনুর্ব্বাণধারীও আহ্লাদিত হয়—এজন্য বাণে অপ্ বা রস-তত্ত্বের ভাব নিহিত আছে। শ্রুতি, প্রণব-ধনুতে জীবাত্মারূপ শর বা বাণ যোজনা করিয়া, ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সাধক পরমাত্মাকে লক্ষ্য করত জপ ধ্যানাদি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিতেছিলেন, এক্ষণে মাতৃকৃপা প্রাপ্ত হওয়ায়, সাধনা ও তজ্জনিত আনন্দ বা রসময় ফল মাতৃকরে অর্পণ করত নির্ভরশীল ও নিশ্চিন্ত হইলেন—ইহাই বাণ সমর্পণের তাৎপর্য্য।—(২০।২১)

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ॥ ২২ ॥

সত্য বিবরণ। দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্র

উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবত হস্তীর ঘণ্টা হইতে ঘণ্টা নিষ্কাষণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।—(২২)

তত্ত্ব-সুধা। অস্ত্র-সংখ্যা (৮) বজ্র—আত্ম-চৈতন্য-প্রবুদ্ধকারী অজ্ঞান-তিমির নাশক, নাদ ও স্পন্দনভাবযুক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুৎ-শক্তি। [পার্থিব স্থূল বজ্রপাতেও শব্দ ও জ্যোতিঃ বিকাশ হইয়া থাকে]। দধীচিমুনির জীবনব্যাপী তপঃ প্রভাবদ্বারা লব্ধ পুঞ্জীকৃত ব্রহ্মণ্য-তেজদ্বারা অর্থাৎ পরমাত্মাভিমুখী সূক্ষ্ম বিদ্যুৎসমষ্টিদ্বারা ইন্দ্রের বজ্র গঠিত। ভোগাসক্তির মূলেও বিদ্যুৎশক্তির স্পন্দন বা তরঙ্গরাজি ক্রিয়াশীল; এবিষয়ে নিম্নে ঐরাবতের বিবরণ সম্পর্কেও আলোচিত হইয়াছে। জাগতিক ভোগমুখী বিদ্যুতের ক্রিয়াশীলতাকে, পরমাত্মভাবে উদ্দীপিত বা পরিচালিত করাই, দেহস্থ দেবভাবসমূহের অধিপতি পুরন্দরের হস্তে ধৃত বজ্রের কার্য্য। তপঃ প্রভাবযুক্ত মহাঐশ্বর্য্যময় গুরুভারযুক্ত বজ্র ইন্দ্রদেব নিজ হস্তে ধারণ করিয়াছেন—এজন্য তাঁহার হস্তেও অসীম শক্তির বিকাশ হইয়াছে; এই নিমিত্ত তিনি পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি হইয়াছেন। আর ভোগাসক্তিময় এবং পরমাত্মাভিমুখী কার্য্যময় বিদ্যুৎ সমষ্টিই ঐরাবত—অখণ্ড ও খণ্ড আনন্দ উৎপাদক এই ঐরাবত-শক্তিতে ইন্দ্র বা দেহস্থ দেব-রাজ্যের অধিপতি পুরন্দর অধিষ্ঠিত—তাঁহারই ইচ্ছামত ঐরাবতরূপী বিদ্যুৎ সমষ্টি পরিচালিত হয়। তপস্যাপরায়ণ সাধক, তাঁহার বিদ্যুৎশক্তিদ্বারা উৎপাদিত আনন্দভাব সমূহ, সর্ব্ববিধ বিদ্যুতের আধারস্বরূপ মাতৃচরণে অর্পণ করিয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলেন—ইহাই বজ্রসমর্পণের তাৎপর্য্য। ব্রজলীলা-কীর্ত্তনে শ্রীরাধার উক্তি—"বংশীধ্বনি বজ্রাঘাতে, পড়ে গেল অকস্মাতে, সমভূমি করিল আমারে" —ইহাতেও বজ্রশক্তি কৃপারূপে অভিব্যক্ত।

(৯) ঘণ্টা—জাগতিক ভাবে ইহা সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারী ত্রিগুণময় শব্দ-সমষ্টি। পূজার প্রারম্ভে ঘণ্টাধ্বনি রজোগুণময় সৃষ্টিজ্ঞাপক, পূজার মধ্য-

ভাগে ঘণ্টার শব্দ সত্ত্বগুণময় স্থিতিভাবাপন্ন, আর পূজার অন্তে ঘণ্টাধ্বনি তমোগুণময় ধ্বংস-ভাব জ্ঞাপক। এতদ্ব্যতীত ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী; এজন্য অন্য বাদ্যের অভাবে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়াও পূজা করার ব্যবস্থা আছে। জীব-দেহে ঘণ্টা—চিত্তবৃত্তি নিরোধকারী প্রণবধ্বনি বা ত্রিগুণময় ত্রিবিধ নাদ-শক্তি। জাগতিক ঘণ্টার শব্দেও ওম্ বা ব্যোম্ ধ্বনি উত্থিত হইয়া ভক্তগণের চিত্ত সমাহিত করে।

দেহের বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সমষ্টিই **ঐরাবত**—অনন্ত ভোগ-বিলাসের মূলেও তড়িৎ, আবার ভগবৎ প্রেমানুরাগের মূলেও তড়িৎ। প্রথম চরিত্রে বর্ণিত রাজা সুরথের ভোগাসক্তিময় সদামদস্রাবী শূর-হস্তীই সমষ্টি বিদ্যুৎরূপী ঐরাবতের বহির্ম্মুখী স্থূল অভিব্যক্তি; আর এই চরিত্রে বর্ণিত ঐরাবত—বিদ্যুৎশক্তির অন্তর্ম্মুখী বা পরমাত্মাভিমুখী সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। শক্তিময়ী তড়িতের স্থূল বা বহির্ম্মুখী প্রভাবেই বাহ্য-জগতে নন্দনের বিচিত্র বিলাস তরঙ্গায়িত!—বৈদ্যুতিক আলো, পাখা, সুদূর স্থানে সঙ্গীত বা শব্দ সঞ্চালন, ট্রামগাড়ী, সর্ব্বপ্রকার কল ও যন্ত্রাদি পরিচালনা, এই ঐরাবতের সাহায্যেই সম্পন্ন হইতেছে। মানব-দেহের ভোগসক্তির মূলেও এই ঐরাবতের নৃত্য বা পরিচ্ছিন্ন আনন্দের স্পন্দন ক্রিয়াশীল!—কটাক্ষে বা চোখে চোখে বিদ্যুতের খেলা, স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও বিদ্যুতের আকর্ষণ, কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর আক্রমণে বা ক্রিয়াশীলতাতেও বিদ্যুতের গতি বা প্রবাহ তরঙ্গায়িত।

বিদ্যুতের অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াশীলতাও নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত হয়; সমাহিতভাবে পূজা বা সাধনা করাবস্থায় সূক্ষ্ম-দেহে এবং স্থূল-দেহেও বিশেষরূপে তড়িৎ প্রকাশ পায়, সাধকগণ উহা নানাপ্রকারে অনুভব করেন। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইলেও সূক্ষ্ম তড়িৎরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যদিয়া চক্রে চক্রে গমনাগমন করিয়া থাকেন। সাধনা বা পূজা করা কালীন উৎপন্ন তড়িৎ সমূহকে সর্ব্ববিধ তড়িতের কেন্দ্র-

স্বরূপ পৃথিবীর লয়কারী আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই কুশাসন, কম্বলাসন, মৃগাসন, ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন প্রভৃতি ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। ভগবৎ প্রেমানুরাগ, শ্রদ্ধা, প্রীতি প্রেম প্রভৃতিতেও বিশিষ্ট তড়িৎশক্তির অভিব্যক্তি!—ইহাই ঐরাবতরূপী তড়িতের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশীলতা! এই ঐরাবত-শক্তি ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধরূপে আত্মবিকাশ করেন; অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস পাত্রভেদে বিদ্যুৎশক্তিও ত্রিবিধরূপে স্পন্দিত বা কম্পিত হইয়া ত্রিবিধ গুণময় কার্য্যাদি, উৎপাদন করেন—এই শব্দ-স্পন্দনই ঐরাবতের ঘণ্টাধ্বনি। সাধক প্রণব জপ বা ধ্যান ধারণাদি সাধনাদ্বারা বিদ্যুৎশক্তিময় নাদ উৎপাদন করত, অবিদ্যার মালিন্য ও চাঞ্চল্য লয় করিয়া আনন্দের স্পন্দন অনুভব করেন—এই সমস্ত সাধনা এবং তৎ ফল মাতৃ-করে সমর্পণ করিয়া প্রশান্তি ও প্রীতি লাভ করাই ঘণ্টা সমর্পণের তাৎপর্য্য।

মন্ত্রে ইন্দ্রকে সহস্র-লোচন বলা হইয়াছে; দেহের দেবভাব সমূহকে একত্রিত করিয়া উহাদের অধিপতি হইতে পারিলে, পরমাত্মময় দেব-দর্শন হইয়া থাকে; তখন দুনয়ন দ্বারা রূপ-দর্শন দূরের কথা, সহস্র নয়ন দ্বারা দর্শন করিলেও যেন পরিতৃপ্তি হয়না বা আশা মিটে না! তাই ব্রজলীলায় গোপীগণও দুনয়নদ্বারা কৃষ্ণ-দর্শনে অতৃপ্ত হইয়া বিধাতার নয়ন-সৃষ্টি বিষয়ে নিন্দা করত বলিয়াছিলেন—"তুমি সহস্র নয়ন সৃষ্টি করিলেনা কেন? তাহা হইলে আমরা সহস্র লোচনে কৃষ্ণ-রূপ-সুধা পান করিতাম।" —ইহাই মন্ত্রে সহস্রাক্ষ বলার তাৎপর্য্য। আর পরমাত্মাভিলাষী দেবভাবাপন্ন সাধকের ক্রটী বা দোষ সমূহ সহস্র নয়নে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান করিয়া উহা সংশোধন করিতে হইবে—ইহাও মন্ত্রোক্তির অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য। —(২২)

কালদণ্ডাদ্ যমোদণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥ ২৩

সমস্ত রোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম্ম চ নির্ম্মলম্ ॥ ২৪

সত্য বিবরণ। এইরূপে যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড, বরুণ পাশ হইতে পাশ তাঁহাকে প্রদান করিলেন; প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রদান করিলেন—(২৩) দিবাকর তদীয় রোমকূপ সমূহে নিজ রশ্মি অর্পণ করিলেন; কাল তাঁহার খড়্গ ও সূক্ষ্ম চর্ম্ম (ঢাল) প্রদান করিলেন। —(২৪)

তত্ত্ব-সুধা। অস্ত্রসংখ্যা (১০) দণ্ড—দম্ভ দর্প অভিমান চূর্ণকারী প্রলয়-শক্তি। যমরাজ মৃত্যুরূপ দণ্ডাঘাতে সর্ব্বপ্রকার অহংকারীর অহংকার বিচূর্ণ করিয়া থাকেন। আর রজঃ ও তমোগুণের ভোগাসক্তিময় অহংভাব ও চাঞ্চল্য জীবদেহের অপকারী মল স্বরূপ; এজন্য ইহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দেহকে মন্দিররূপে পরিণত করাই যম দেবতার কার্য্য বা 'অধিকার ভোগ'। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কায়িক বাচিক ও মানসিক সংযমরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা—অর্থাৎ কায়-দণ্ড বাক্-দণ্ড ও মানসিক-দণ্ড রূপ 'যম' সাধনা দ্বারা সাধক তদীয় জীব-ভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া পরমাত্মভাবে বিভাবিত করেন। অতঃপর দণ্ডরূপ সংযম সাধনার ফলাফল মহাশক্তিময় ভগবানের প্রীত্যর্থে সমর্পণ করত আত্মম্ভরিতা বা দর্প হইতে বিমুক্ত হইয়া সাধক নির্ম্মল হন—ইহাই দণ্ড সমর্পণ (১১) পাশ—বন্ধন-রজ্জু; মায়িক বিষয়াদিতে আসক্ত হইলে, যেরূপ জীব, পাশ-বদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রতপূজাদি সাধনা চিরকাল একভাবে অনুষ্ঠান করা এবং তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাও বন্ধন সদৃশ—উহাও সোনার শৃঙ্খল-পাশে আবদ্ধ হওয়া। সুতরাং এইপ্রকার একঘেয়ে সাধনা এবং তৎফলাফল জগন্মাতাকে সমর্পণ করিয়া, শরণাগত হওয়াই পাশ সমর্পণ; তাই গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। (১২) অক্ষমালা—প্রজাপতি ব্রহ্মার অক্ষমালারূপ

পঞ্চাশৎ বর্ণমালা, বেদ বেদান্ত এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মজ্ঞানভক্তি-মূলক শাস্ত্রাদির প্রকাশক; সুতরাং শাস্ত্রপাঠ, স্তব স্তুতি এবং জ্ঞানভক্তির চর্চ্চা প্রভৃতি সমস্তই ভগবৎ প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠান করাই অক্ষমালা সমর্পণ।
(১৩) কমণ্ডলু—সৃষ্টির সংস্কার বা বীজযুক্ত চিত্তরূপ কারণাধার; চিত্তের সংস্কারই দেশ-কাল-পাত্র সংযোগে বীজ হইতে অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া জীবকে দুঃখদায়ী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক্ কর্ম্মে নিয়োজিত করে; সুতরাং ঐ কারণাধাররূপ কমণ্ডলুটী মাতৃকরে সমর্পণ করিতে পারিলে, ভাবী আসুরিক উৎপীড়নের দায় হইতে মুক্ত হওয়া যায়—অর্থাৎ চিত্ত-ক্ষেত্রে মাকে বসাইয়া সতত স্মরণ মনন করিতে পারিলে, আসুরিক চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা থাকে না—ইহাই কমণ্ডলু সমর্পণ। উত্তম চরিত্রে শরণাগত সাধকের পক্ষে ব্রহ্মাণী, কমণ্ডলু হইতে কারণ-জল ছিটাইয়া অসুরগণকে কারণ-বারিতে অর্থাৎ বীজাংশে লয় করিয়াছিলেন।

(১৩) খড়্গ—অজ্ঞানতা নাশক তত্ত্বজ্ঞান—তেজ-তত্ত্ব; জগন্মাতা খড়্গাঘাতে জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তককে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিময় এবং জড়তাভাবাপন্ন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভক্তকে স্বরূপ-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন। খড়্গরূপ দিব্য-জ্ঞানের প্রভাবেই কাল, অনন্তরূপে খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত হইয়াও তিনি সর্ব্ববিস্ময়কারী—জ্ঞানময় অখণ্ড মহাকাল। ব্যষ্টিভাবে সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান ধারণা করিতে সক্ষম হন, তখন তিনি কালাতীত অতি তেজস্বী কালপুরুষরূপে প্রতিভাত হন! —কাল বা মৃত্যুকে জয় করিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী শিবময় ভাব প্রাপ্ত হন। জ্ঞানের তেজ বা বিমল জ্যোতিঃ দ্বারাই অজ্ঞানান্ধ-তমসা বিদূরিত করা সম্ভবপর হয়; আর তেজস্বী না হইলে, কেহ খড়্গধারী 'বলিকর'ও হইতে পারে না; মধ্যম চরিত্রে দেবগণ স্তবকালীন বলিয়াছেন—"উগ্র খড়্গ-প্রভাসমূহের বিস্ফুরণ দ্বারা" এই উক্তিতেও খড়্গ—তেজতত্ত্ব, ইহা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায়। তেজস্বী শরণাগত সাধকের বুদ্ধি-ক্ষেত্রে

মা স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানরূপে প্রকটিত হইয়া তাহার মোহ এবং অজ্ঞানতা-মূলক চাঞ্চল্য প্রভৃতি লয় করিতেছেন! —ইহা অনুভব করাই খড়্গ সমর্পণ। (১৫) চর্ম্ম—আত্ম-রক্ষাকারী আবরণ বা অস্ত্র—পৃথিতত্ত্ব; পৃথিবীর গুণ গন্ধ, আর চর্ম্মেতেও গন্ধ আছে, এজন্য চর্ম্ম—গন্ধতত্ত্বময় আবরক অস্ত্র। বাহ্যিক পদার্থ-সমষ্টি দ্বারা প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মার রক্ষা হয় না, কেননা পদার্থে জড়িত হওয়াই বন্ধন আবার পদার্থ মাত্রকেই শক্তিময় ও মাতৃময়রূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হইয়া মুক্তি হয়। এইরূপ জড়ত্ব প্রতীতি হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বত্র শক্তিময় ও চৈতন্যময়ভাব উপলব্ধিই মাতৃ-করে চর্ম্ম সমর্পণ—এজন্য মন্ত্রেও "নির্ম্মল-চর্ম্ম" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাকাল নিজ অখণ্ড সত্তা ও চেতনা যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া, বাহ্যিকভাবে অনন্তরূপে খণ্ডিত হইয়া মহামায়া মায়ের ইচ্ছা পরিপূরণ করিতেছেন। এই যবনিকারূপী আবরণই চর্ম্মস্বরূপ; আর এই আবরণ শক্তিকে মহামায়ারূপে অনুভব করাও চর্ম্ম সমর্পণ।

প্রতিরোমকূপে দিবাকরের রশ্মি-সমূহ সমর্পণ—মাতৃ-কৃপা প্রাপ্ত দিবাকরতুল্য তেজস্বী সাধকের প্রতি রোম-কূপ হইতে জ্যোতিঃ-রশ্মি নির্গত হইয়া সিদ্ধির অবস্থা আনয়ন করিতে পারে, এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐসকল ব্রহ্মানন্দপ্রদ রশ্মিসমূহও মায়ের জ্যোতিঃ বা মহাশক্তির ব্যষ্টি-লীলাতে অনন্ত শক্তি-রেখারূপে প্রকাশ—ইহা অনুভব করাই রশ্মি সমর্পণ। মা জ্যোতিঃ-রশ্মি দ্বারা কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় ভক্ত-সাধককে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। এবিষয়ে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—আমার আত্মীয় ও সতীর্থ স্বামী সরূপানন্দ একটি সুন্দর অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। সাধনা করাবস্থায় একদা তাঁহার প্রতি রোম-কূপ হইতে জ্যোতিঃ রেখাসমূহ নির্গত হইতেছিল এবং পুনরায় রোম-কূপে প্রবেশ করিতেছিল! তিনি বাহিকভাবে ইহা নিজ-দেহে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; আর অন্তরে ইহা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন

যে—তাঁহার দেহ যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি—প্রত্যেকটি রোম-কূপ যেন ব্রহ্ম-যোনি এবং তাহাতে অধিষ্ঠিত জ্যোতিঃ রশ্মিটী যেন শিব-লিঙ্গ! এই শিবশক্তিময় অবস্থাযুক্ত তাঁহার প্রত্যেকটী রোম-কূপ যেন এক একটী ব্রহ্মাণ্ড; আর সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রতি রোম-কূপে যেন, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক শিবশক্তির ব্রহ্মানন্দময় বিলাস হইতেছে! এইরূপে কিছু কাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করার পর, তিনি সেই অবস্থা আর সহ্য করিতে পারিলেন না—আনন্দের আতিশয্যে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তখন তিনি এইভাব সংহরণের নিমিত্ত, শ্রীশ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন; ক্রমে ঐ ভাবটী তিরোহিত হইল। এবম্বিধ ব্রহ্মানন্দ ভোগ এবং জ্যোতিঃ রেখাসমূহ ব্যষ্টি দেহগত, আর তিনি 'জীবভাবে উহা যেন আস্বাদন করিতেছেন,' এরূপ সংস্কার থাকায়, ঐরূপ ব্রহ্মানন্দে অধিক কাল অবস্থিতি করা সম্ভবপর হয় নাই; তিনি যদি উহা ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমর্পণ করিয়া, ঐ ব্যাপারকে মহাশক্তিময় ভগবানের লীলা-বিলাসরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় উহা অসহ্য হইত না এবং ক্রমে তিনি সমাধিস্থ হইতেন—ইহাও রোম-কূপে রশ্মি সমর্পণ।

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ। ২৫
অর্দ্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ব্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্‌গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্।
অঙ্গুরীয়ক রত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ॥ ২৬

সভ্য বিবরণ। ক্ষীরোদ-সমুদ্র তাঁহাকে নির্ম্মল হার, চির নূতন বস্ত্রদ্বয়, দিব্য চূড়ামণি (শিরোরত্ন), কুণ্ডলদ্বয়, বলয়সমূহ, শুভ্র-অর্দ্ধচন্দ্র (ললাট ভূষণ), বাহু সমূহে কেয়ূর (বাজু), নির্ম্মল নূপুরদ্বয়, অত্যুত্তম বিশুদ্ধ গ্রীবাভরণ এবং অঙ্গুলী সমূহে উৎকৃষ্ট রত্নখচিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন— (২৫।২৬)

তত্ত্ব-সুধা। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় নারায়ণের প্রিয়স্থান, সত্ত্বগুণের পরিপূর্ণ আকরস্বরূপ ক্ষীরোদ-সমুদ্র, চূড়ামণি, হার, নূপুর প্রভৃতি দশবিধ অলঙ্কার দ্বারা মায়ের শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন। ব্যষ্টিভাবে—পরমাত্মাভিমুখী—বিলোম-গতি প্রাপ্ত সাধকের বুদ্ধি-ক্ষেত্র সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইয়া 'একার্ণব' বা একরস-ভাবাপন্ন হয়; সত্ত্বগুণ হইতে জাত রজঃ এবং তমোগুণের মালিন্য ও চাঞ্চল্য, মধু-কৈটভরূপে প্রকাশ পায়, ইহা প্রথম চরিত্রে সুবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে; মধু-কৈটভ বধ হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে তেজস্বী সাধকের বুদ্ধি-ক্ষেত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে পূর্ণ হইয়াছে,—ইহাই জীব-দেহে ক্ষীরোদ সমুদ্র। এই প্রকার রজোগুণের বিশুদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞান-দৃষ্টি প্রসারিত হয়—তিনি জ্ঞানভাব পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন; কর্ম্মী বা যোগিগণের, 'অষ্ট-সিদ্ধি' লাভ হইয়া থাকে! আর ভক্তেরও অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ' প্রকাশ পায়। যোগী-সাধক অষ্টসিদ্ধি দ্বারা বিমোহিত না হইয়া ঐ সকল বিভূতিকে অগ্রাহ্য করত সাধন-পথে অগ্রগমন করেন এবং সমাধি বা সিদ্ধিলাভ করেন; আর ভক্তও তদীয় দেহে প্রকাশিত সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ ইষ্টদেবে সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন! —ইহাই ক্ষীরোদ সমুদ্র কর্ত্তৃক অলঙ্কার সমর্পণের তাৎপর্য্য ও রহস্য।

এক্ষণে প্রত্যেকটী অলঙ্কারের তাৎপর্য্য এবং সমর্পণ-রহস্য ক্রমে বিবৃত করা যাউক। (১) চূড়ামণি—দিব্যজ্ঞান; জ্ঞানী-সাধক প্রদত্ত এই দিব্যজ্ঞান মা সাদরে গ্রহণ করত মুকুটাগ্রে বা শিরোভূষণরূপে ধারণ করেন! তখন জ্ঞানী, জ্ঞানের অভিমান হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্ * হন এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন—ইহাই চূড়ামণি সমর্পণের তাৎপর্য্য। (২)

* ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীগণের জ্ঞানের অভিমান থাকেনা—তাঁহারা বালকের মত সরল স্বভাব প্রাপ্ত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বভাব বালকের মত ছিল, অথচ জ্ঞানের জটিল তত্ত্ব, সরল কথায় পণ্ডিতদিগকেও বুঝাইয়া দিতেন। শাস্ত্রেও আছে, সিদ্ধ জ্ঞানীর—বালকভাব; সিদ্ধ যোগীর—জড়ভাব (যথা—তৈলিঙ্গ স্বামী); সিদ্ধ তান্ত্রিকের—পিশাচভাব এবং সিদ্ধ ভক্তের—উন্মাদ অর্থাৎ প্রেমোন্মাদ ভাব।

নূপুর—প্রেমভক্তি ; ইহা মায়ের অলক্তরঞ্জিত শ্রীপাদপদ্মে বেষ্টিত এবং সতত আনন্দ-গুঞ্জনে ধ্বনিত। বিনয়াবনত ভক্তগণ সর্ব্বাগ্রে মায়ের চরণই দর্শন করিয়া থাকেন এবং আত্ম-নিবেদন করিয়া ধন্য হন। এইরূপে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত ভক্তগণ, তাঁহাদের প্রেমভক্তি ইষ্টদেব-দেবীর চরণযুগলে সমর্পণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন—ইহাই নূপুর সমর্পণ। (৩) হার—ভক্তের নির্ম্মল অশ্রু-সমষ্টি কিম্বা যোগের 'অণিমা' নামক ঐশ্বর্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সংহতি এবং সূত্র সহযোগে যেমন মাল্য বা হার প্রস্তুত হইয়া শোভাপায়, সেইরূপ যোগসূত্রে লব্ধ 'অণিমা' নামক ঐশ্বর্য্য-সমষ্টি মায়েতে সমর্পিত হওয়ায়, মা যেন উহা হাররূপে গলে ধারণ করিয়াছেন! আর অভিমান শূন্য বিনয়ী-ভক্তের অশ্রু-সমষ্টি, মুক্তাফলের ন্যায় উজ্জ্বল ও নির্ম্মল—উহা প্রাণময় সূত্রদ্বারা 'হার'রূপে গ্রথিত হইয়া মায়েতে সমর্পিত!—মা যেন সাদরে ঐ হার গ্রহণ করিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় ভক্তের প্রেমানন্দময় অশ্রুধারা বর্ষিত হইলেও, তিনি তাহাতে অভিমান বা গৌরব প্রকাশ করেন না ; বরং উহা ভগবৎ কৃপা এবং ভগবৎ ভাবরূপে উপলব্ধি করেন—ইহাই হার সমর্পণ। (৪) অম্বর—মায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চির-নূতন বস্ত্র—ইহা অতি লঘু এবং পাতলা ; এজন্য ইহাতে যোগের "লঘিমা' নামক ঐশ্বর্য্য বিকশিত। যোগী তাঁহার এই ঐশ্বর্য্য মাতৃ-অঙ্গে অর্পণ করিয়া ধন্য হন! আবার ইহা ভক্তগণের অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী পুলক বা রোমাঞ্চ ; সত্ত্বগুণময় ভক্ত যখন বিশুদ্ধ হৃদয়ে ইষ্টদেব-দেবীর রূপ আস্বাদন করেন, তখন অন্তরে পরমানন্দ এবং বাহ্য-দেহে সত্ত্বগুণময় পুলক বা 'রোমাঞ্চ' প্রকাশ পায় ; ভক্তসাধক এই সকল বিভূতিতে গর্ব্বিত না হইয়া, উহা ভগবৎ শক্তির অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী আনন্দময় বিকাশ বা 'চিদম্বররূপে' উপলব্ধি করেন—ইহাই অম্বর যুগল অর্পণ।

(৫) কুণ্ডল—মায়ের কর্ণভূষণ কুণ্ডলদ্বয়ে এবং শ্যামসুন্দরের চিন্ময় কর্ণে সতত দোলায়মান্ কুণ্ডলদ্বয়ে সততক্রিয়াশীল চিদানন্দের ভাব

অভিব্যক্ত এবং ইহা অপূর্ব্ব মহিমান্বিত। এজন্য ইহাতে "মহিমা" নামক যোগৈশ্বর্য্য—অভিব্যক্ত। আবার ভক্ত-দেহে এই দোলায়মান্ ভাব, "কম্প" রূপে প্রকাশ পায়। ভক্ত যখন ভগবৎ মহিমা আস্বাদন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার ভেদভাব নিবারক সত্ত্বগুণময় কম্প (বেপথু) উপস্থিত হয়। অন্তরে ত্রিতাপজ্বালা উপশমিত বোধ হওয়ায়, সুশীতল ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া, বাহ্য-দেহ এবং দন্তসমূহ কম্পিত হইতে থাকে; এই অবস্থাকে ভগবানের শক্তিময় ও চিদানন্দময় অভিব্যক্তি বলিয়া অনুভব করাই— কুণ্ডল সমর্পণ। এতদ্ব্যতীত যোগসাধন কালে যখন বায়ু ও চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন সাধকের দেহে 'ঝাকুনি' ব কম্প প্রকাশ পাইতে থাকে— ইহা দ্বারা বহুত্বের দিকে ধাববান চিত্তবৃত্তি ও ভেদভাবসমূহ একত্বে লয় হইয়া সাধককে আত্ম-তত্ত্বে বা মহিমাময় ভগবৎ-তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে— এই কম্পনকে ভগবৎ মহিমারূপে অনুভব করাও কুণ্ডল সমর্পণ!

(৬) অর্দ্ধচন্দ্র—মায়ের কপালে এবং মহাদেবের কপালে অত্যুজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত—ইহা নাদ বিন্দুময় বা জ্যোতির্ম্ময় শিবত্ব বা ঈশ্বরত্বের ভাব-ব্যঞ্জক—এজন্য ইহাতে যোগের "ঈশিত্ব" নামক ঐশ্বর্য্যভাব অভিব্যক্ত, সাধকের এবম্বিধ সিদ্ধিকে ইষ্ট দেব-দেবীতে অর্পণ করাই শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র সমর্পণ। আবার ইহা ভক্তেরও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ প্রেমানুরাগ স্বরূপ স্বেদ (ঘাম) বা প্রস্বেদ; ভক্ত যখন ভগবানের ধ্যানে বা রূপে তন্ময় থাকেন, তখন সৌভাগ্যবশে তাঁহার রজোগুণময় অন্তর্ম্মুখী প্রেমানুরাগ বহির্ম্মুখী হইয়া সর্ব্বাঙ্গে স্বেদরূপে প্রকাশ পায়, আর অন্তর প্রদেশে শিব-ময় নির্ম্মল বিশুদ্ধ ভাব দ্বারা, ভগবৎ প্রেমানন্দ আস্বাদন হইতে থাকে, রজোগুণময় প্রেমানুরাগের বহির্ম্মুখী বিকাশই—শক্তিময় ও নাদময় রক্ত-বর্ণাভ অর্দ্ধচন্দ্র; আর অন্তর্ম্মুখী বিশুদ্ধ শিবময় বা জ্যোতির্ম্ময় ভাব—ঈশিত্ব-ভাবব্যঞ্জক বিন্দুস্বরূপ—এই সম্মিলিত অবস্থাই ভক্তের অর্দ্ধচন্দ্র। ভাবাবস্থায় চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে ঐ স্বেদ, রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া রক্ত-প্রবাহের

ন্যায় বহির্গত হইত!—এই প্রকার মাধুর্য্যময় ও জ্যোতির্ম্ময় ঐশ্বর্য্যভাব, শক্তিময় ভগবৎ প্রেমানুরাগরূপে দর্শন ও আস্বাদন করাই—অর্দ্ধচন্দ্র সমর্পণ।

(৭) কেয়ূর (বাহুভূষণ বাজু)—কেয়ুর সুশোভিত মায়ের অভয় বাহু দর্শনের সৌভাগ্য উপস্থিত হইলে, সাধকের চিত্তবৃত্তি ও অন্তর প্রদেশ চিরতরে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও বশীভূত হয়—এজন্য মায়ের বাহুতে যোগের "বশিত্ব" নামক ঐশ্বর্য্য বিকশিত। এই যোগৈশ্বর্য্য মাতৃকরে সমর্পণ করাই—কেয়ূর অর্পণ। ভগবৎ ভাবে বিভাবিত রূপ-মুগ্ধ ভক্ত-সাধকেরও সর্ব্বেন্দ্রিয় স্তব্ধ হইয়া ও বায়ু স্তম্ভিত হইয়া পরমানন্দ প্রদান করে—স্তম্ভ-জনিত এই আনন্দকে ভগবৎভাবে আস্বাদন করাই—কেয়ূর সমর্পণ! তাই সাধক মাতৃ-মহিমা আস্বাদনে গাহিয়াছেন—"হুঙ্কার ঘন ঘন, কাঁপিছে ত্রিভুবন, স্তব্ধ রিপুগণ বলে হোক্ তব জয়"!

(৮) গ্রৈবেয়ক (গলভূষণ) ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয় সংসাধিত হয়—ভ্রূকুটীদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র গ্রীবা সঞ্চালনে, করাল-বদনী কালিকার আবির্ভাব হইয়াছিল—এজন্য ইহাতে যোগের "প্রাপ্তি" নামক ঐশ্বর্য্য বিকশিত।—এই ঐশ্বর্য্য মায়ের, আর ব্যষ্টি-লীলায় ইহা আমাতে অর্পিত—ইহা অনুভব করাই গলভূষণ সমর্পণ। ভক্ত যখন ইষ্ট-রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হন, তখন তাহার গলাতে "স্বরভেদ" উৎপন্ন হইয়া থাকে—কখন গদ গদ ভাষণ, কখন অস্পষ্ট স্বর, কখনও হাস্য বা অট্টহাস্য, কখনও হুঙ্কার আবার কখনও করুণ-রসে অভিষিক্ত হইয়া ভক্ত ক্রন্দন করিতে থাকেন; এই প্রকার বিশুদ্ধ ভাব এবং বিভিন্ন স্বরভেদই মায়ের গলভূষণ—ইহা ভক্তেরও গলভূষণ স্বরূপ!—এই স্বর-বৈচিত্র্যকে মায়ের শক্তি ও আনন্দ বিলাস বলিয়া অনুভব করাই গ্রৈবেয়ক সমর্পণ। (৯) কটক (বালা)—বিবিধ বর্ণের রত্নখচিত বালা-সুশোভিত মায়ের শ্রীকর কমল, শরণাগত ভক্তসাধকের পক্ষে স্বেচ্ছায় অসুর নিধন করিয়া তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্র বিশুদ্ধ

করেন ; তখন সাধকের সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, এজন্য মায়ের শ্রীকরে যোগের "প্রাকাম্য" নামক ঐশ্বর্য্য বিকশিত। এই যোগৈশ্বর্য্যকে মাতৃময় অনুভব করাই কটক সমর্পণ। ইষ্টদেবের স্বরূপ পরিচিন্তনে ভক্তের দেহে "বৈবর্ণ্য" বা বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়—ইহাই মাতৃকরে সুশোভিত কটক স্বরূপ কটক সুশোভিত বরাভয়যুক্ত মায়ের শ্রীকর দর্শনে ভক্তের মানসপট প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হয়, এজন্য তাঁহার বাহ্য-দেহে বৈবর্ণ্য প্রকাশ পায় ; আবার সুশোভিত সেই করই যখন রক্ত প্রবাহযুক্ত সদ্য ছিন্ন নৃমুণ্ড ধারণ করিয়া অভক্তের হৃদয়ে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে, তখন অভক্তের হৃদয়-প্রদেশ বিশুষ্ক হইয়া মালিন্যযুক্ত ভীতিব্যঞ্জক্ বৈবর্ণ্য প্রকাশ পায়। ভাবাবস্থায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেহটী কখনও জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ রূপ ধারণ করিত ; কখনও বা আবির-লিপ্ত দেহের ন্যায় প্রেমানুরাগে রক্তবর্ণ রূপ ধারণ করিয়া শোভা পাইত। ভাবাবস্থায় ভক্ত-দেহেও এবম্বিধ বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে—এই সকল সাত্ত্বিক ভাবদ্বারা প্রেমগর্ব্ব উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং উহা মাতৃকরে অর্পণ করাই কেয়ূর সমর্পণ। (১০) অঙ্গুরিয়ক—ভক্ত মনোহরা বরাভয়করা মায়ের পদ্মহস্তের রত্নাভরণযুক্ত অঙ্গুলী সঞ্চালনে ভক্ত-সাধকের ভব ভয় বিদূরিত হইয়া সর্ব্ববিধ কামনা বা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইয়া সংসিদ্ধি লাভ হয় ; এজন্য মায়ের শ্রীঅঙ্গুলীতে যোগের "কামবসায়িত্ব" নামক ঐশ্বর্য্য প্রকটিত ; এই সকল সিদ্ধির ভাব ভগবৎ প্রীত্যর্থে বা জগন্মঙ্গল কার্য্যে প্রয়োগ করাই সর্ব্বকামনা পূরণকারী অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ। ভক্ত যখন ইষ্ট দেবদেবীর সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি দর্শনে সক্ষম হন, তখন তাঁহার সর্ব্বপ্রকার জীব-ভাবের "প্রলয়"হয় তখন—তিনিও চিন্ময়ভাব লাভ করিয়া মূর্চ্ছিত হন বা প্রেম-সমাধি লাভ করেন।—ইষ্টদেব বা দেবী তখন, শ্রীকরকমলের অঙ্গুলী সঞ্চালনদ্বারা ভক্তকে বর প্রদানে ধন্য করেন —প্রেমিক ভক্ত, চিরতরে-প্রেমামৃত রসার্ণবে অবগাহিত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন—ইহাই অঙ্গুরীয়ক সমর্পণের তাৎপর্য্য।

বিশ্বকর্ম্মা দদৌ তস্মৈ পরশুঞ্চাতিনির্ম্মলম্।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্॥ ২৭
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্।
অদদজ্জলধিস্তস্মৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্॥ ২৮

সভ্য বিবরণ। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অতিনির্ম্মল পরশু, নানাবিধ অস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ প্রদান করিলেন।—(২৭)॥ সমুদ্র একটী সদা প্রস্ফুটিত পদ্মমালা মস্তকে এবং অপর একটী মালা বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলেন, আর অতি সুশোভন একটী পদ্ম (হস্তে) প্রদান করিলেন।—(২৮)॥

তত্ত্ব-সুধা। অস্ত্র সংখ্যা—(১৬) পরশু—অজ্ঞান-নাশক নির্ম্মল জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞান। যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র কর্ম্মের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ যিনি সকলকেই বিভিন্ন কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন, তিনিই বিশ্বকর্ম্মা। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, সকল অবস্থাতেই বিশ্বকর্ম্মা ক্রিয়াশীল হইয়া অব্যক্তকে ব্যক্ত করেন, অরূপকে রূপ প্রদান করিয়া থাকেন। কোন বিশিষ্ট শিল্প কার্য্য করিতে হইলে—(১) সে বিষয়ে নির্ম্মল জ্ঞান বা বিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন, [কেননা সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা কিছুমাত্র অজ্ঞানতা থাকিলেও সম্পূর্ণ কার্য্যসিদ্ধি হইবেনা] (২) উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র চাই, [যথা—চিত্র কার্য্যে, রং তুলি প্রভৃতি দরকার; সেলাই কার্য্যে সূচ, সুতা প্রভৃতির প্রয়োজন] (৩) আরব্ধ শিল্প কার্য্যটা সযতনে রক্ষা করা চাই। মন্ত্রোক্ত বিশ্বকর্ম্মার ত্রিবিধ দানের অন্তরালেও এই ত্রিবিধ ভাব অভিব্যক্ত। পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান বা বিজ্ঞান রূপেও মহাশক্তি, বিবিধ অস্ত্ররূপেও তাঁহারই বিকাশ; আর অভেদ্য আবরণ বা রক্ষা-কবচ রূপেও তাঁহারই বিচিত্র অভিব্যক্তি—এই প্রকার উপলব্ধি করাই বিশ্বকর্ম্মার ত্রিবিধ অস্ত্র সমর্পণের তাৎপর্য্য ও রহস্য। (২৭)

জলধি বা সমুদ্র—চিদানন্দ প্রবাহ; যিনি সম্যকরূপে আর্দ্র বা রসময় করিতে সক্ষম তিনিই সমুদ্র। দেবী-মহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে দেখান

হইয়াছে যে, একার্ণবীকৃত কারণজলে নারায়ণ অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, উহাও পরমানন্দময় অবস্থা ; আবার নারায়ণের সহিত বাহুযুদ্ধ করা কালীন মধু-কৈটভ, সমগ্র জগত আপময় বা আনন্দময়রূপে দর্শন করিয়া সত্ত্বগুণে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—এখানেও একরস আনন্দভাব অভিব্যক্ত। দেবীসূক্তেও "যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে" উক্তিদ্বারা আনন্দময়কোষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্ঞানের সপ্ত-ভূমিকাকেও কেহ আনন্দের সপ্তসমুদ্র বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন—শেষ ভূমিকাই তুরীয়াবস্থা—উহাই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় ক্ষীরোদ সমুদ্র। ভক্ত রাম প্রসাদ গাহিতেন—"ডুবদে মন কালী বলে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে। জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝেরে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে" ; যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক না কেন, সমুদ্র জ্ঞান-ভক্তির আকর বা চিদানন্দ-প্রবাহ।

সমুদ্র, মায়ের শিরে চির প্রস্ফুটিত একটী পদ্মের মালা প্রদান করিলেন—ইহাই সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম ; জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চাশৎ বর্ণমালা বা অক্ষর দ্বারা সুশোভিত রক্ত-কিঞ্জল্ক্য বর্ণের পঞ্চাশৎ দল, পর পর কুড়ি স্তরে সজ্জিত হইয়া এই অপূর্ব্ব পদ্মটী রচিত !! এজন্য মনে হয়, পঞ্চাশদলযুক্ত কুড়িটী পদ্ম যেন ক্রমে একটীর উপর আর একটী গ্রথিত করিয়া এই চির-সুন্দর পদ্মের মালা রচনা করত মায়ের শিরে প্রদত্ত হইয়াছে! আর সহস্রার পদ্মটী কোন অবস্থাতেই ম্লান হয়না, উহা সতত ঊর্দ্ধমুখী এবং চির প্রস্ফুটিত থাকে, এজন্য মন্ত্রে উহাকে অম্লান পঙ্কজের মালা বলা হইয়াছে।

সমুদ্র আর একটী পদ্মের মালা বক্ষে প্রদান করিলেন—ইহাই ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্মের মালা ; মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বিদ্যুন্ময়ী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্রিণী নাড়ী দ্বারা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টী পদ্ম সুগ্রথিত—এই ষট্‌পদ্মের মালাতে সর্ব্ববিধ তত্ত্বজ্ঞান, পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ, সপ্তলোক এবং সমস্ত দেব-দেবীগণ অধিষ্ঠিত। এই

মালা বক্ষে দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে—হৃদয়-প্রদেশই প্রাণের ও চৈতন্যের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র এবং তড়িৎশক্তিরও কেন্দ্র, আর এই স্থানই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ড রক্ষাকারী যন্ত্র সমুহেরও কেন্দ্র স্বরূপ—প্রাণেতেই সর্ব্ববিধ সুখ-দুঃখের সাড়া পড়ে, প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও বক্ষেই করা হয়—এই সব কারণে ষট্‌পঙ্কজের মালা মায়ের বক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুখ-দুঃখে বিকারগ্রস্ত, ত্রিতাপজ্বালায় তাপিত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মলিন দশাপ্রাপ্ত, জড়ত্বের অববোধক জীব দেহই 'পঙ্ক' স্বরূপ—দেহরূপ পঙ্কে জাত প্রেমানন্দপ্রদ চির-সুন্দর ষট্‌পদ্মের মালা এবং সহস্রার পদ্মমালা, মানব-দেহে করুণাময় ভগবানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবদান স্বরূপ!—এইসকল পদ্মমালাতে মন্দাকিনীর পুত প্রেমানন্দ-ধারা সতত উৎসারিত এবং লীলায়িত॥

জলধি অতি সুশোভন একটী কমলও মায়ের শ্রীকরে অর্পণ করিলেন—ইহাই লীলা-কমল—(অস্ত্রসংখ্যা ১৭)—ইহা মায়ের ইচ্ছাশক্তির দ্যোতক্। ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি-স্থিতি লয়াদি ত্রিগুণের খেলা সংসাধিত হয়; মা যখন যেরূপ লীলা * করিতে অভিলাষ করেন,তখন সেই সেই ভাবে কমলটীকে সঞ্চালিত করেন। ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি যৌগিক ক্রিয়া সম্ভূত সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও আনন্দ ভাব, মায়ের প্রীত্যর্থে অর্পণ এবং ষট্‌পদ্ম-মালা প্রভৃতিকে শক্তিময় ও মাতৃময় বলিয়া উপলব্ধি করাই—পদ্মমালা সমর্পণ।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে এতৎসম্পর্কে গুরু নানকজী কথিত "গ্রন্থ-সাহেবের" অন্তর্গত "জপজীয়" একটী বাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—"হুকমী হোবনী আকার [ভগবানের হুকুম বা ইচ্ছাতেই এই আকার বা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে]; হুকমী ন কহিয়া জাই। [এই ইচ্ছাশক্তির স্বরূপ কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ উহা বাক্য মনের অগোচর]; হুকমী হোবনী জীব। [তাঁর ইচ্ছাতেই প্রাণীগণ সৃষ্ট হইয়াছে], হুকমী

* যাহাতে ধর্ম্ম-সংস্থাপনাদি কোন প্রকার বাধ্য বাধকতা নাই, যাহা ভগবান বা ভগবতী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সংসাধন করেন, তাহার নাম—"লীলা।"

মিলে বডিয়াই ॥ [তাঁর ইচ্ছাতেই কেহ জগতে বড়াই বা প্রশংসা লাভ করিয়া যশস্বী হন], হুকমী উত্তম নীচ [তাঁর ইচ্ছাতেই কেহ উত্তম কুলে, আর কেহবা অধমরূপে জন্মিয়াছে]; হুকমী লিখি সুখ দুখ পাইয়হি। [তাঁর ইচ্ছাতেই যার ভাগ্যে যেমন লিখা হইয়াছে, সে সেইরূপ সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়]; ইকনা হুকমী বকসিস্ [তাঁর ইচ্ছাতেই কেহ বকসীস্ বা পুরস্কার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ উচ্চগতি বা মুক্তি লাভ করেন]; ইক্ হুকমী সদা ভবাইয়হি ॥ [আবার তাঁর ইচ্ছাতেই কেহ সাংসারিক ভাবনা বা দুশ্চিন্তাদিতে সদা দুঃখিত হন]; হুকমী অন্দর সভকো [জীব মাত্রই তাঁর ইচ্ছার গণ্ডীর ভিতরে রহিয়াছে, অর্থাৎ ভগবৎ ইচ্ছাকেই সকলেই রূপ দিতেছে বা পরিপূরণ করিতেছে]; বাহরি হুকুম ন কোই। [তাঁর ইচ্ছার বাহিরে কেহই কিছু করিতে পারেনা]; নানক, হুকমৈ জো বুঝৈত [গুরু নানকজী বলেন—এই ইচ্ছাশক্তিকে যিনি বুঝিতে পারেন]; হউমৈ কহৈ ন কোই ॥ [তাঁহার কাছে আমি-আমাররূপী কর্তৃত্বাভিমান থাকে না অর্থাৎ তিনি সর্ব্বতো-ভাবে ভগবৎ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইয়া থকেন!—(২৭।২৮)

হিমবান বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ ২৯

সত্যবিবরণ।—হিমালয়, দেবীর বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন দান করিলেন; ধনাধিপতি (কুবের) তাঁহাকে সদা সুরা পরিপূর্ণ পান-পাত্র প্রদান করিলেন।—(২৯)॥

তত্ত্ব-সুধা।—হিমবান বা হিমালয়—যিনি সতত সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অচল অটলভাবে ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই সত্ত্বগুণময় হিমালয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত ধর্ম্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এজন্য তাঁহাকে হিমালয়ের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে; যুধি—যুদ্ধে, স্থির= যুধিষ্ঠির বা হিমালয়। গিরিরাজ, একদিকে যেমন পাষাণবৎ সুদৃঢ় ও

সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে আবার প্রেমকরুণায় সদা আর্দ্র, এজন্য 'হিমবান' অর্থাৎ প্রাণময় ও চৈতন্যময়!—তাই তিনি হৈমবতী উমারও জনক হইতে পারিয়াছেন। ব্যষ্টিভাবে—সাধকের সত্যময় দৃঢ় ভাবের সহিত প্রাণময় চৈতন্যভাব মিলিত হইয়া, একদিকে ধর্ম্ম রক্ষা করে এবং অপরদিকে প্রেম-করুণা বিতরণ করিয়া থাকে (—ইহাই 'জীবে দয়া' রূপে প্রকাশ পায়); অর্থাৎ 'বজ্র হইতেও কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল' ভাবই জীব-দেহস্থ হিমালয়। সিংহ—জীবের ধর্ম্মভাব-সমষ্টি, জীব-ভাবরূপ অবিশুদ্ধতাকে যিনি হিংসা করেন তিনিই 'সিংহ'—পাশবিকভাবসমূহের উপর যিনি কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম, কিংবা উহাদিগকে দলন করিতে সমর্থ—তিনিই পশুরাজ সিংহস্বরূপ; ধর্ম্মই জীবভাবীয় মালিন্য অপসারিত করিয়া সাধককে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন—তখন বিশুদ্ধ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার, কিম্বা ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন সংসাধিত হয়। বৈকৃতিক রহস্যেও মায়ের বাহন সিংহটীকে 'ধর্ম্ম'রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা—"সিংহং সমগ্রং ধর্ম্মমীশ্বরম্ বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্।" অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবযুক্ত সমগ্র ধর্ম্মস্বরূপ দেবী-বাহন সিংহকে পূজা করিবে—এই ধর্ম্ম কর্ত্তৃকই সমস্ত চরাচর ধৃত। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি, যম-নিয়ম, শম-দমাদি ষটক্-সম্পত্তি প্রভৃতিই ধার্ম্মিক হিমবানের ধন-রত্ন। হিমবান স্বীয় ধর্ম্মরূপী সিংহকে মায়ের পদতলে বাহনরূপে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। সাধক তদীয় ধর্ম্মভাব এবং শম-দমাদি অমূল্য ধনরত্ন সমূহ মায়ের প্রীত্যর্থে তাঁহারই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া এবং উহাদিগকে মাতৃময় ও শক্তিময়রূপে অনুভব করিয়া ধন্য হন—ইহাই সিংহ ও ধনরত্ন সমর্পণ—এখানেই গীতোক্ত 'সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ' করিয়া শরণাপন্ন হইবার উপদেশের সফলতা ও সার্থকতা।

সুমেরু-পর্ব্বতে ধনাধিপ কুবেরের বাসস্থান; দেহস্থ মেরুদণ্ডই সুমেরু পর্ব্বত—এখানেই আনন্দরূপ ধনের অধিপতি বিরাজিত। জীব-

শক্তিই দেহস্থ ধনাধিপ, ইনিই পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ ভোগজনিত খণ্ড খণ্ড আনন্দ-মধু পান করিতেছেন, আবার যখন জীবের পরমাত্মাভিমুখী বিলোমগতি হয়, তখন ইনিই কুলকুণ্ডলিনীর সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া, খণ্ড খণ্ড ভাবসমূহ ক্রমে নিজদেহে বিলয় পূর্ব্বক সহস্রারে গমন করেন এবং পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া সুধাময় অখণ্ড পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। পানাধার—রজোগুণ-সমষ্টি (অস্ত্রসংখ্যা—১৮); ইহা যখন বিষয় ভোগের জন্য উদ্বেলিত হয়, তখন জীবকে অনন্ত ভোগ-বিলাসের কল্পনায় আসক্ত করে এবং ক্রমে তাহাকে 'মোহ-মদিরা' পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলে। আবার যখন অন্তর্মুখীভাবে ক্রিয়াশীল হয়, তখন উহা পর-বৈরাগ্য এবং প্রেমানুরাগরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং দেবগণের হস্তে ঐ পানপাত্র নিত্য আনন্দ-সুধায় পরিপূর্ণ; আর অসুরগণের হস্তে উহা ভোগাসক্তিময় মদিরা; আর ত্যাগীর পক্ষে উহা বিশুদ্ধ রজো-গুণময় **প্রেমানুরাগ**। সাধক-ভক্ত এই প্রকার প্রেমানুরাগ লাভে প্রেমগর্ব্ব অনুভব না করিয়া, উহা মহাশক্তিময় ভগবৎ চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হন—ইহাই মাতৃকরে পান-পাত্র সমর্পণ।—(২৯)

শেষশ্চ সর্ব্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্।
নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্॥ ৩০

সত্য বিবরণ। যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বনাগাধিপতি শেষ বা অনন্ত, তাঁহাকে মহামণি বিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন —(৩০)

তত্ত্ব-সুধা। মানব-দেহে অনন্ত কর্ম্ম-সংস্কার বা কর্ম্ম-বীজসমষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিই সর্ব্বনাগাধিপতি অনন্ত। কর্ম্মের অপ্রতিহত এবং অনন্ত প্রভাব দর্শন করিয়া মীমাংসক দর্শনকার কর্ম্মকেই ভগবান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মানবের অনন্ত কর্ম্ম-প্রেরণা এবং সুখ দুঃখময় কর্ম্মফল ভোগ, সমস্তই কর্ম্ম-সংস্কারের বিচিত্র, পরিণতি।

কর্ম্ম-সংস্কার ত্রিবিধ, যথা (১) 'সঞ্চিত'—যাহা ভবিষ্যতে জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ হইবে; (২) 'প্রারব্ধ'—যে সমস্ত কর্ম্ম ভোগ করিবার জন্য দেহ-ধারণ অর্থাৎ জন্ম হইয়াছে; (৩) 'বর্ত্তমান,'—'ক্রিয়মান' বা 'আগামী'—যে সকল নূতন কর্ম্ম ইহজন্মের কর্ম্মদ্বারা সঞ্চয় করা হইতেছে। এই সকল কর্ম্মের গতি এবং প্রভাব অতি সূক্ষ্ম, বিভিন্ন এবং কুটিল, এজন্য উহারা সর্পতুল্য। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" অর্থাৎ কর্ম্ম সকলের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়।—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম-সংস্কারই "নাগহার"। মন্ত্রে 'মহামণি-বিভূষিত' বলার তাৎপর্য্য এই যে—দুর্ভেদ্য এবং দুর্ব্বোধ্য কর্ম্মসমূহের বৈচিত্র্যভাব পরিপূর্ণ বিভিন্ন প্রকাশই উহাদের অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা বা অসীম প্রভাবের পরিচায়ক—কর্ম্মের এই সকল অপূর্ব্ব প্রভাবময় এবং প্রকাশময় অপ্রতিহত বাহ্যিক স্ফুরণের অবস্থাই মহামণিময় ভূষণ। সাধকের স্ব স্ব কর্ম্ম-বশে সুখ-দুঃখময় যে কোন অবস্থা আসুক না কেন, উহা মহাশক্তিময় ভগবানের দানরূপে গ্রহণ করা, কিংবা উবা মাতৃময় বা শক্তিময় বলিয়া উপলব্ধি করত সাক্ষীভাবে অবস্থান করাই 'নাগহার' বা কর্ম্ম-ফল মায়েতে সমর্পণ! ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, বিশিষ্ট এবং শেষ ত্যাগ। গীতাতেও ভগবান কর্ম্মফল ত্যাগের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্ম-ফলে নহে"; "পণ্ডিতগণ সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগকেই প্রকৃত ত্যাগ বলিয়া থাকেন"। আর কর্ম্ম-সংস্কারই দেহটীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—যে মুহূর্ত্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মের ভোগ শেষ হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই স্থূল-দেহটীরও পতন হইবে; এজন্য মন্ত্রেও আছে—"ধত্তে গঃ পৃথিবীমিমাম্" অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন—জীব-দেহই পৃথিবীস্বরূপ, আর অনন্ত কর্ম্ম-সংস্কারই উহার ধারক বাহক ও পরিচালক!

এই মন্ত্রোক্তির আরও একটী তাৎপর্য্য আছে. যথা—পদদ্বয়েই জীব-

দেহের **সপ্ত পাতাল** অবস্থিত; ইহা প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। পাতালরূপী পদদ্বয়ই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পদদ্বয়ের বিভিন্নগতি ও শক্তিসমূহও সর্পতুল্য; আর এই গতি-শক্তির অধিপতি শক্তিময় বামনদেবই বলশালী অনন্ত। এইরূপে দেহস্থ পাতালের অধিপতি শেষ-নাগ দেবীকে অনন্ত গতি-শক্তিময় নাগ-হার প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার নিজ-গতি ও শক্তিসমূহ যে মহাশক্তিরূপিণী মায়ের গতি ও শক্তি ইহা অনুভব করিয়া, মায়ের জিনিষ মাকে দান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ব্যাষ্টিভাবে—সাধকের গতি ও শক্তিসমূহ সমস্তই মায়ের নিজস্ব; কিম্বা মায়ের প্রীত্যর্থেই গতি-শক্তিময় সর্ব্ববিধ কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত এরূপ উপলব্ধি করাই 'নাগহার' সমর্পণের অন্য প্রকার তাৎপর্য্য। (৩০)

অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩১

সত্য বিবরণ। এইরূপে অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক ভূষণ ও অস্ত্র প্রদান দ্বারা সম্মানিতা হইয়া, সেই দেবী অট্টহাস সহকারে মুহুর্মুহুঃ উচ্চ নাদ করিতে লাগিলেন।—(৩১)

তত্ত্বসুধা।—গীতাতে ভগবান, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া শরণাগত হওয়ার জন্য পুনঃ পুনঃ যে সকল উপদেশ ও সাধনা শ্রীমুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন, উহাই চণ্ডীতে আত্ম-শক্তির উদ্বোধন এবং সঙ্ঘ-শক্তিতে উহা ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োগ-কৌশল রূপে এখানে এবং দেবী-মাহাত্ম্যের সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অস্ত্র-সমর্পণ দ্বারাও শরণাগতি প্রতিষ্ঠার ক্রম-সাধনা বিস্তারিত ভাবে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত। প্রথমেই ত্রিশূল সমর্পণদ্বারা জ্ঞানের ত্রিধা বা ত্রিপুটি বিভাগে মহাশক্তিময় একমাত্র ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানী সাধক জ্ঞানের অভিমান নষ্ট করিলেন, এইরূপে তাঁহার দিব্যজ্ঞান

প্রকাশ পাইল—সংসারকে মহামায়ার **লীলা-চক্ররূপে** অনুভব করিয়া সাধক চক্র-সমর্পণ করিলেন। গদা-সমর্পণ দ্বারা আত্ম-জ্ঞান লাভ করায়, সাধকের অভেদ দৃষ্টি প্রসারিত হইল; ক্রমে 'শঙ্খ' অর্পণ দ্বারা সাম্য বা সমতা লাভ এবং সংযমের উগ্রভাবকে 'শক্তি' অর্পণদ্বারা কোমল ও প্রাণময় করা হইল। জ্যোতিঃ এবং নাদ-সাধনায় 'চাপ' অর্পণদ্বারা সাধক নিঃসঙ্গ ও মাতৃময়ভাব উপলব্ধি করিলেন, 'বাণ' অর্পণদ্বারা একলক্ষ্যে চিত্ত-একাগ্রতা জনিত সাধনার আনন্দকে, শক্তিময় ভগবৎভাব বলিয়া অনুভব হইল। ক্রমে 'দণ্ড' অর্পণদ্বারা আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করার পর, সাধক বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে একভাবে চিরদিন প্রমত্ত থাকাকে 'পাশ'রূপে অনুভব করিলেন এবং অক্ষমালা ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে খড়্গদ্বারা জড়প্রতীতি নষ্ট করিয়া, সাধক আবরক ভাবাপন্ন চর্ম্মও জগন্মাতাতে অর্পণ করিলেন—তখন তাঁহার সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বতোভাবে শক্তিময় ও **মাতৃময়ভাব** উপলব্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে সাধনা দ্বারা লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, যোগ-সিদ্ধি, প্রেমভক্তি এবং ভক্তের সাত্ত্বিক লক্ষণাদি ভগবৎ প্রীত্যর্থে সমর্পণ করিয়া সাধক উহাদিগকে ভগবৎ শক্তিরূপে অনুভব করিলেন। এইরূপে নিজধর্ম্ম এবং তৎ-সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যসমূহ, প্রেমানুরাগের সহিত মাতৃ-পদে সমর্পণ করিয়া, পরিশেষে সমস্ত কর্ম্ম-ফলও সমর্পণ করত সাধক নিষ্কাম হইলেন এবং সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন—ইহাই অস্ত্রসমর্পণের গূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য!—চণ্ডীর এই সমর্পণ-রহস্যে সর্ব্বশ্রেণীর সাধকেরই সমর্পণ-কৌশল পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইরূপে নিষ্কাম ও সাক্ষীভাবে অবস্থিত সাধকের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কার্য্যাবলী ও কর্ত্তব্য সমূহেও ভগবৎ নিয়ন্তৃত্ব এবং সর্ব্বত্র শক্তিময় ভাব উপলব্ধি করাই মন্ত্রোক্ত অন্যান্য দেবতাগণের ভূষণ ও বিবিধ অস্ত্র সমর্পণ। ভগবান **শঙ্করাচার্য্যও** এই দৈনন্দিন ভাবকে লক্ষ্য করিয়া

বলিয়াছেন—"হে জগন্মাতঃ প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রভাত কাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা কিছু করিয়া থাকি, তৎ সমস্তই তোমার পূজাস্বরূপ!" আর সাধক গাহিয়াছেন—"উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে উপাসনা করা চাই॥ ভোজন আমার আহুতি প্রদান, শয়ন আমার ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম, ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর, প্রতি কথা মোর মন্ত্র। প্রতি অঙ্গভঙ্গি মুদ্রা বিরচন, যে ভাবেই বসি সেইত আসন, যে চিন্তাই করি তাঁরি ধ্যান ধরি, এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥" এইরূপে জীবন-যাত্রার সর্ব্ববিধ কার্য্যে শরণাগতির সাফল্য আনয়ন করিতে পারিলে, সাধকের সত্যময় জীবন, প্রাণময় ও মধুময় হইয়া পরমানন্দ প্রদান করিবে।

এখানে গীতোক্ত ভগবৎ উপদেশের ব্রহ্মময় ভাবও উল্লেখযোগ্য, যথা—ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্মরূপে, ব্রহ্মরূপ অর্পণ (যজ্ঞপাত্র) হইতে ব্রহ্মরূপ ঘৃত লইয়া (ঐ ঘৃতদ্বারা) ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোম করিতে থাকেন।" অর্থাৎ কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ, এই ষড়বিধ অবস্থাই ব্রহ্মময়। এইরূপ উচ্চভাব ব্যতীত জাগতিক অতি সাধারণ ঘটনাকেও ব্রহ্মময়রূপে দর্শন করিতে অভ্যাস করিতে হইবে, যথা—শক্তিশালী বলিষ্ঠ কুলী, শক্তিরূপিণী বসুন্ধরাতে উপবেশন পূর্ব্বক, শক্তিস্বরূপ কঠিন প্রস্তরকে শক্তিময়ী ভূমি-শয্যা হইতে উঠাইয়া, শক্তিময় লৌহ হাতুরী দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, শক্তি ও প্রভাবশালী মনিবকে বুঝাইয়া দিতেছে (অর্থাৎ প্রদান বা দান করিতেছে)! —ইহাও মহাশক্তিময় একই ভগবানের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র—এইরূপ উপলব্ধিই যথার্থ সমর্পণ এবং ইহার সম্যক্ অনুষ্ঠানে ভক্তের নিকটে জগন্মাতা আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করেন। মহাদেব শিব সংহিতায় বলিয়াছেন—"যখন সকল তত্ত্বের অভাব হয়, তখনই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে!"—ইহাই কবির ভাষাতে

এইরূপে অভিব্যক্ত যথা—"চাওয়া যখন নিরাশ হ'য়ে, সত্যিকরে থাম্‌বে। পাওয়া তখন আসমানী ফুল, স্বর্গ হ'তে নাম্‌বে॥" মন্ত্রোক্ত 'সম্মানিতা' বাক্যটিও রহস্যময়; পূজা স্তব স্তুতি প্রভৃতি দ্বারা মাকে সম্মান করা হয় বটে, কিন্তু ভক্ত-সাধক যখন উপরোক্ত উপায়ে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হন, তখন মা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক 'সম্মানিতা' হন—সেই অবস্থায় মা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্ত হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করত অট্টহাস দ্বারা সাধকের আসুরিকভাব সমূহ গুম্ভিত বা বিলয় করেন, আবার উচ্চ নাদের মধুময় অভিব্যক্তি দ্বারা ভক্তকে আনন্দ ধারায় অভিষিক্ত করিয়া থাকেন। —(৩১)

তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ॥ ৩২
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥ ৩৩

সভ্যবিবরণ। তাঁহার অপরিমেয় এবং অতিমহান্ ঘোর নিনাদে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল এবং মহান্ প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাতে লোকসমূহ বিক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র সকল কম্পিত হইতে লাগিল, পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল এবং পর্ব্বত সমূহ বিচলিত হইল। —(৩২/৩৩)

তত্ত্ব-সুধা। সাধকের অনাহত পদ্মে জগন্মাতা প্রকাশিতা হইয়া জ্যোতির্ম্ময় নাদের মহিমাময় অভিব্যক্তি করিয়াছেন, ঐ জ্যোতিঃ ও নাদ-ধ্বনি দ্বারা সাধকের দেহের প্রতি অণু-পরমাণু আলোকিত স্পন্দিত ও ঝঙ্কৃত হইতেছে! —এই রূপময় নাদের পরিমাণ নাই এবং মহিমাময় ঐশ্বর্য্যেরও সীমা নাই; তাই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"অমায়তা অতিমহতা নাদ। মাতৃরূপ দর্শনে তন্ময়তাপ্রাপ্ত সাধকের দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের স্থুল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয়াবস্থাতে এই নাদের পরিপূর্ণ

অভিব্যক্তি হইয়াছে—তাই পৃথ্বিতত্ত্বময় মূলাধার হইতে দ্বিদলের মহাকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত লোক আলোড়িত, মুখরিত ও স্পন্দিত হইতেছে। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় এই চতুর্ব্বিধ অবস্থাভেদে নাদেরও চারি প্রকার অভিব্যক্তি আছে, যথা—(১) নাদের স্থূল বাহ্যিক বাঙ্‌ময় বা শব্দময় অভিব্যক্তিই—'বৈখরী'; (২) অন্তর্মুখী সূক্ষ্ম ধ্বনিই—'মধ্যমা'; (৩) কারণে অভিব্যক্তিই—'পশ্যন্তী'; নাদের এই তৃতীয় অবস্থা পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে; (৪) চতুর্থ অবস্থা অদ্বিতীয় ভাবাপন্ন এবং অখণ্ড, এজন্য উহা—'পরা' বা তুরীয়াবস্থা। বৈখরী-নাদ দ্বারা অভিব্যক্ত স্থূল শব্দময় মন্ত্রসমূহ উদাত্তাদি উচ্চারণের ত্রিবিধ তারতম্যানুসারে ত্রিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। বৃত্রাসুর বধ উপাখ্যানে দেখা যায়—"হে ইন্দ্রশত্রো"! এই সম্বোধনের পূর্ব্বপদটী উদাত্তস্বরে উচ্চারিত হওয়ায়, অর্থাৎ উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটায় বৃত্র, ইন্দ্রের শত্রু বা হন্তা না হইয়া, ইন্দ্রই বৃত্রের শত্রু বা হন্তারক হইয়াছিল।

জগত বাঙ্‌ময় বা শব্দময়; বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষর বা শব্দ বায়ু-তরঙ্গে আঘাত করত বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি করিয়া থাকে; এবিষয়ে পূর্ব্বেও কতক আলোচনা করা হইয়াছে; এজন্য শব্দ, অক্ষর বা মন্ত্র-সমূহ সমস্তই রূপময়। জগতের প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুরই নাম আছে, আর ঐ নামের সহিত তৎতৎ রূপও অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট—যেমন 'আম গাছ', বলিলে, উহাদ্বারা একটী রূপময় বৃক্ষের কল্পনা আসে, ঐ রূপকে বাদ দিয়া কোন আমগাছেরই চিন্তা করা যায়না; সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুই নামরূপের অচ্ছেদ্য আবরণে জড়িত হইয়াই বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হইয়াছে—এই নামরূপাত্মক বাহ্যিক আবরণটী অপসারিত করিতে পারিলেই একমাত্র অখণ্ড শক্তিময় বা চিদানন্দময় সত্তা অবশিষ্ট থাকে—ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ং"! সুতরাং যাহার নাম আছে, তাহার

রূপও আছে—তাই শব্দ, অক্ষর এবং মানবের চিন্তা-তরঙ্গ সমূহ সমস্তই রূপময় জ্যোতির্ম্ময় ও নাদময়!—সমষ্টিভাবে এই সকল বিশিষ্ট নাম, রূপ, জ্যোতিঃ ও নাদ, একমাত্র ওঁকারে বা প্রণবে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যোগীবর ঘেরণ্ড ঋষি বলিয়াছেন—"অনাহত পদ্মে সতত নাদ-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে সেই ধ্বনির অন্তর্গত জ্যোতিঃরাশি সতত উচ্ছ্বসিত; সেই জ্যোতিঃ-দর্শন করিতে পারিলে, যোগীর চিত্ত শ্রীহরির পাদপদ্মে লয় হইয়া যায়"।

সাধকের শরণাগতির পূর্ণতায় এবং সাফল্যে জগন্মাতা, সাধকের প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্ময়ী অসুরদলনী ও অভয়দায়িনী দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্ববিমোহন ত্রিগুণময় নাদ উত্থিত করিয়াছেন—মায়ের অট্টহাসিতে আসুরিক ভাবসমূহ স্তম্ভিত, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের দিগ্‌-দিগন্ত মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে—এজন্য পৃথ্বিতত্ত্বময় মূলাধাররূপ মর্ত্ত্য বা ভূলোক হইতে আজ্ঞা-চক্রের মহাকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকাশ অবস্থাময় লোকাদি বিক্ষুব্ধ হওয়ায়, দেহস্থ গুণময় বা জ্ঞানময় আনন্দ-সমুদ্র সকল উদ্বেলিত হইতে লাগিল!—এইরূপে ইষ্টমূর্ত্তির বিকাশে সাধকের দেহ মন প্রাণ আনন্দে তরঙ্গায়িত হওয়ায় পুলক ও কম্পাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল; পৃথিবীরূপ দেহটিও সর্ব্ববিধ জড়ত্বভাব পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে ভরপুর হওয়ায়, ভাবে ঢল ঢল এবং প্রেমে টলমল্ করিতে লাগিল। মেরুদণ্ড এবং তৎসংলগ্ন অস্থি সমূহ, পর্ব্বতমালার ন্যায় জীব-দেহটীকে ধারণ করিয়া থাকে—ইহারাই মন্ত্রোক্ত 'মহীধর' এবং জড়ত্বের অববোধক; চৈতন্যময়ী মায়ের প্রকাশে, সাধক-দেহে এই সকল জড়ভাবাপন্ন পর্ব্বতমালাও চৈতন্যময় হইয়া বিচলিত হইতে লাগিল। ব্রজলীলাতে সপ্তস্বরের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ জনিত আনন্দময় নাদ বা বংশীধ্বনি * শ্রবণ করিয়া সচেতন বস্তুসকল

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির ত্রিবিধ ভাব এবং রাসলীলাদি সর্ব্ববিধ লীলার তত্ত্ব ও রহস্য মৎ প্রণীত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত" গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।—লেখক

অচেতন হইত, আবার অচেতন পদার্থ সকল চৈতন্যময় হইয়া পুলক ও কম্প প্রকাশ করিত!

সাধন-কালে সাধকগণের দেহেও বিশেষরূপ কম্প ও 'ঝাকুনি' প্রকাশ পাইয়া থাকে—উহা দ্বারা চিত্ত স্থির হইয়া উপাস্য বা ইষ্টভাবে তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া থাকে। যাহারা সাধনায় কিছুমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের অনেকেই ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যোগ-শাস্ত্রেও এরূপ কম্পনাদির উল্লেখ আছে; যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ভ্রূযুগলের মধ্যদেশে চিত্ত যখন বিলীন হইয়া যায়, তখন জিহ্বা-মূল হইতে সুধা-ধারা বিগলিত হইতে থাকে, ভ্রূমধ্যে আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন হয়; তখন যোগীর মূর্দ্ধস্থান পর্য্যন্ত নিখিল শরীর প্রকম্পিত হইতে থাকে'—ইহাই মন্ত্রোক্ত সসাগরা ও সপর্ব্বতা লোকময় বসুন্ধরার বিচলিত ভাব ও কম্পন! —(৩২।৩৩)

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্।
তুষ্টুবু র্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্ত্তয়ঃ॥ ৩৪

সত্ত্য বিবরণ। দেবগণ আনন্দভরে সেই সিংহ বাহিনীর জয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন (এবং তাঁহাকে 'জয়া' নামও প্রদান করিলেন); মুনিগণ ভক্তিভরে নম্রমূর্ত্তি হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। —(৩৪)

তত্ত্ব-সুধা। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং মহোৎসবাদিতে 'জয়' উচ্চারণ করা হইয়া থাকে; ইহাতে কর্ম্মীগণের উৎসাহ, বল, ঐক্যবদ্ধভাব এবং আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। শাস্ত্রাদি পাঠের প্রারম্ভেও নারায়ণ, সরস্বতী প্রভৃতিকে নমস্কার করত 'জয়' উচ্চারণ করার বিধান আছে; (ততো-জয়মুদীরয়েৎ)। দেবগণ তাঁহাদের অস্ত্ররূপী খণ্ড খণ্ড শক্তিসমূহ মহাশক্তিতে অর্পণ করিয়াছেন—বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডশক্তি সমূহ একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিতে পরিণত, তাই "যুদ্ধ-মহোৎসবের" প্রারম্ভে

দেবদলের উল্লাস এবং জয়ধ্বনি। সাধকেরও আত্মসমর্পণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হওয়ায়, দেহস্থ সত্ত্বগুণময় প্রকাশ ভাবাপন্ন দেবগণ উল্লসিত হইয়া যেন দেবীর জয় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ; আর সাধক আত্মসমর্পণ দ্বারা মুনিগণের ন্যায় প্রশান্ত ভাব লাভ করায়, মায়ের যুদ্ধলীলা সন্দর্শনের জন্য সাক্ষীভাবে অবস্থান করত বিনয় ও ভক্তি সহকারে স্তব করিতে লাগিলেন। "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়:"—যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয় অবশ্যম্ভাবী তাই ধর্ম্ম-ভাবসমষ্টিরূপী সিংহকে মায়ের পদাশ্রিত দর্শনে মায়ের জয় সুনিশ্চয়, এরূপ ভাবিয়া যেন দেবগণ আরও উল্লসিত হইলেন এবং জয়ধ্বনি করিতে করিতে মাকে 'জয়া' নামে অভিহিত করিলেন। ভক্তি, বিশ্বাস ও বিনয় সহকারে স্তবাদি নিয়মিতভাবে পাঠ করিলে, চিত্তশুদ্ধি হইয়া সাধকের বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিসমূহ একাগ্র হয় এবং ক্রমে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সাক্ষীভাবে অবস্থান করত লীলা দর্শনের যোগ্যতাও লাভ হয়—ইহাও মন্ত্রোক্তির অন্যতম তাৎপর্য্য।—(৩৪)

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ।
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ ॥ ৩৫
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈ র্বৃতঃ ॥ ৩৬

সভ্য বিবরণ। (দেবীর উচ্চনাদে) সমগ্র ত্রিলোক সংক্ষুব্ধ দেখিয়া দেব-শত্রু অসুরগণ কবচ পরিধান পূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থে সমুত্থিত হইল। মহিষাসুর "আঃ একি ?„—এই কথা বলিয়া অগণ্য অসুর-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই শব্দাভিমুখে মহাবেগে ধাবিত হইল।—(৩৫।৩৬)

তত্ত্ব-সুধা।—সৌভাগ্যবান সাধকের প্রাণময় হৃদয়-প্রদেশে জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তির বিকাশে এবং নাদময় প্রণবধ্বনির অভিব্যক্তিতে তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ ত্রিলোকময় দেহটী সম্পূর্ণরূপে বিক্ষোভিত

হইল; তখন রজোগুণময় তেজ-তত্ত্বোদ্ভূত অবশিষ্ট আসুরিক ভাব সমূহ পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়া তেজময় ও প্রাণময় দিব্যভাবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, তেজস্বী সাধক তেজতত্ত্বময় মণিপুর চক্রে আরোহণ করিলেন। ক্রমে সেখানে তেজ-তত্ত্বময় দেবভাব এবং অসুরভাব সমূহ পূর্ণরূপে প্রকটিত হওয়ার পর অসুরাধিপতি মহিষাসুর দ্বারা দেবভাব সমূহ পরাজিত হইয়াছিল। তৎপর কুলকুণ্ডলিনীশক্তি নিষ্ক্রিয় দেহভাব সমূহকে লইয়া প্রাণময় অনাহত পদ্মে একটী মুখ উঠাইলেন; তখন সেখানে দেবভাব সমূহ পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া চৈতন্যময় মহাপ্রাণীরূপী হরি হরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর সেখানে দেবগণের প্রত্যেকের শক্তি সমর্পণদ্বারা মহাশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সংসাধিত হইল। মহাশক্তি মা, মহাতেজস্বী মহিষাসুর ও প্রধান অসুরগণকে অনাহত পদ্মে, যুদ্ধ করিয়া লয় হইবার জন্য আহ্বান করিবার অভিপ্রায়ে, আকর্ষণীভাবযুক্ত প্রণবময় মহানাদ উত্থাপিত করিলে, তাহারা সেই নাদ লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে অনাহত পদ্ম অভিমুখে প্রধাবিত হইল; কুণ্ডলিনীশক্তির অপর মুখটী তেজতত্ত্বজাত অবশিষ্ট অসুরগণের লয়ের জন্য সংহারিণী মূর্ত্তিতে মণিপুর চক্রেই অবস্থান করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ মহিষাসুর ও তৎসহকারীগণকে মহাশক্তিরূপিণী মা অনাহত পদ্মে উঠাইয়া আরও শক্তিশালী করিবেন এবং ক্রমে তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ প্রাণময় ও শক্তিময় অনাহত-পদ্মে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে লয় করিবেন; আর তেজ-তত্ত্বে পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত, অবশিষ্ট অসুরগণকে মণিপুর-চক্রেই বিলয় করিবেন—ইহাই ভগবতী কুণ্ডলিনীর অভিপ্রায়। প্রথম চরিত্রেও মা মধু-কৈটভকে মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে উঠাইয়া, (সমুত্থায় যুযুধে) আরও শক্তিশালী করত তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন।

অসুরভাব বিলয়কারী নাদ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত "আঃ একি ?" এই শব্দ উত্থিত করিয়াছিল—ইহা আনন্দ, দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিষাসুর

প্রলয়ঙ্করী আকর্ষণী নাদ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া উহার কারণ নির্ণয়ার্থে তদভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে—মহিষাসুরের এই শব্দ-প্রীতি ও আকর্ষণ, পতঙ্গের বহ্নি প্রীতির ন্যায় প্রলয়-ভাবাপন্ন। যেখানে শরণাগতিদ্বারা প্রশান্ত ভাবাপন্ন সাধক, স্বয়ং বৈখরীনাদে স্থূলভাবে স্তবপরায়ণ, যেখানে সেই সাধকের সূক্ষ্ম প্রকাশ ভাবযুক্ত দেবগণ সূক্ষ্মভাবে মধ্যমা-নাদে জয়-ধ্বনিপরায়ণ, আর যে স্থানে মহাশক্তিময়ী সর্ব্বকারণরূপা মা পশ্যন্তী-নাদ দ্বারা কারণময় প্রণবধ্বনি-পরায়ণ, সেখানে দেহস্থ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিলোক আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইবে ইহা খুব স্বাভাবিক; আর ঐ ত্রিবিধ নাদের সম্মিলন-জনিত মহানাদে অসুরগণ বিচলিত ও মুগ্ধ হইয়া প্রলয়াভিমুখী অভিযান করিবে, ইহাতেও বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই—ইহাই মন্ত্রোক্ত শব্দের দিকে অসুরগণের অভিযানের তাৎপর্য্য।—(৩৫।৩৬)

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যানতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥ ৩৭
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্‌ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥ ৩৮

সত্য বিবরণ।—অনন্তর মহিষাসুর দেখিতে পাইল—দেবীর দেহ-জ্যোতিঃতে ত্রিভুবন আলোকিত, পদভরে ভূমণ্ডল অবনত, কিরীট গগনস্পর্শী, ধনু-জ্যা-ধ্বনিতে সমুদয় রসাতল সংক্ষুব্ধ, এবং ভুজসহস্রে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, হইয়াছে।—(৩৭।৩৮)

তত্ত্ব-সুধা।—অসুরগণের মধ্যে মহিষাসুরই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, এজন্য সেই সর্ব্বপ্রথমে অনাহত-পদ্মস্থিত সর্ব্বশক্তিময়ী দেবীকে দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিল; এজন্য মন্ত্রে আছে—"স দদর্শ"। মহিষাসুর বিমোহিত হইয়া দেখিতে পাইল—(১) দেবীর জ্যোতিঃতে ত্রিভুবন আলোকিত—দেবগণ প্রথমেই মহাশক্তির এই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রূপ

দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ে মন্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে যে—"জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তেজোরাশি, শিখাদ্বারা দশদিক্ পরিব্যাপ্ত, প্রভামণ্ডলে ত্রিভুবন উদ্দীপিত"! —এমনি মায়ের অতুলনীয় অসীম বিশ্ব-বিমোহন অফুরন্ত রূপ! (২) দেবীর পাদ-স্পর্শে-ভুবন অবনত—চৈতন্যময়ী মায়ের চরণ-কমল স্পর্শে জড়ভাবাপন্ন পৃথিবীও চৈতন্যময় হইয়াছেন এবং ভক্তিভরে অবনত হইয়া যেন মাতৃপদ-স্পর্শ-জনিত প্রেমানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। রাসলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে বসুন্ধরা পুলকিত হইয়া ভগবৎ পদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (৩) দেবীর মস্তক-ভূষণ কিরীট্ যেন গগন স্পর্শ করিয়াছে—মায়ের কিরীটই চূড়ামণি বা দিব্যজ্ঞান, ইহা পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দিব্যজ্ঞানে কখনও অনুদার বা সঙ্কোচ-ভাব থাকিতে পারেনা—উহা আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ও অসঙ্গ, সকল পদার্থের সহিত জড়িত থাকিয়াও উহা নির্লিপ্ত এবং অখণ্ড! —এজন্য মন্ত্রে উহাকে সর্ব্বব্যাপী আকাশের সহিত একীভূত করা হইয়াছে। (৪) দেবীর ধনুকের 'জ্যা' শব্দে আকাশ পাতাল বিক্ষোভিত—মায়ের ধনুকের জ্যা-শব্দই বিভিন্ন নাদের সম্মিলিত প্রণবময় অভিব্যক্তি!—নাদ শক্তিময় এবং জ্যোতির্ম্ময়; তাই নাদের বিকাশে জড়ত্বের অববোধক "মহীধর সকল" চৈতন্য ভাবযুক্ত হইয়া আনন্দে কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানেও সেই ভাবটাই আরও গভীরভাবে অভিব্যক্ত, কেননা সপ্ত পাতাল—জড়ত্ব এবং অপ্রকাশের ক্রমিক ঘনিভূত অবস্থা; কিন্তু মহাশক্তি মায়ের জ্যোতির্ম্ময় নাদের অভিব্যক্তিতে উহারাও বিক্ষোভিত হইয়া চৈতন্যের ন্যায় সাড়া দিতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। (৫) দেবীর ভুজসহস্রে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন—দশভুজারূপে মা দশদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন; আর যেখানে সহস্রভুজা, সেখানে মা সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্বরূপিণী। দৃশ্য-

মান জগতের সর্ব্বত্র এবং সকল কার্য্যের অন্তরালে মহামায়া মায়ের মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত—সর্ব্বান্তর্যামী মা তদীয় শ্রীকর-কমল দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম কারণময় ত্রিজগতের সর্ব্ববিধ অবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন—ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না—তিনিই একমাত্র সর্ব্বকারণের কারণ রূপিণী বিশ্বব্যাপিনী! —তাই মন্ত্রে আছে "সমন্তাদ্ ব্যাপ্যসংস্থিতাং"। সিদ্ধ সাধক গোবিন্দ চৌধুরী মায়ের বিচিত্র লীলা উপলব্ধি করিয়া গাহিয়াছেন—"দশভুজা হেরে মায়ের ভাবিছ রূপেরি শেষ, অন্তরে দেখিলে উহার দেখিবে অনন্ত বেশ। * * ধরেরে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ, সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ, সহস্র বদনে খায়, সহস্র লোচনে চায়, (আবার) সহস্র শ্রবণে শোনে কথারে। সহস্র শির না হ'লে বল কেরে অবোধ প্রাণ, এতই গরবে করে সহস্রধারাতে স্নান; সহস্র ভাবে বিভোরা, সহজ ধ্যানের অগোচরা, ওই ত তোমার সহস্রারে অহরহ বাস করে॥ * * ধরলে পরে জ্ঞানের আলো, লুকায় সে যে ওঁকারে॥"

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সাধকের অন্তরেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ, প্রদীপ সমষ্টি দ্বারা আরতির ন্যায় যখন একীভূত জ্ঞানালোক বা জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতে থাকে, তখনই সাধকের প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে ইষ্টদেব মূর্ত্তি বা দশভূজা মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের দশদিক আলোকিত করত ভক্ত-সাধককে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা করেন। এই অবস্থায় ইষ্টদেব-দেবীর জ্যোতিঃদ্বারা সাধকের স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ ত্রিলোক উদ্ভাসিত হয়, স্থূল-দেহটীও প্রেমভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে, নির্ম্মল জ্ঞানের বিকাশে সর্ব্ববিধ ভেদ বা অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়া আকাশের ন্যায় মহান্ ব্যাপক এবং উদার ভাব প্রকাশ পায়; তখন সাধক প্রণবরূপ ধনুতে জীবাত্মারূপ শরদ্বারা ব্রহ্মরূপ পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া †

† প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥—মুণ্ডকোপনিষৎ

শর নিক্ষেপ করেন! এইরূপে প্রমাদশূন্য বা বিশুদ্ধ হইয়া সাধক লক্ষ্য বস্তুতে 'শর'বৎ তন্ময়তা লাভ করেন! সাধকের এই প্রকার প্রণবরূপ নাদ-ধ্বনিতে তাহার দেহস্থ জড়ভাবাপন্ন পাতালসমূহও চৈতন্যময় হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে, আর সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করত সাধক সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদন করিয়া ধন্য হন—ইহাই মন্ত্রোক্ত মায়ের সর্ব্বব্যাপিরূপে অবস্থান এবং ভুজসহস্র দ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করার তাৎপর্য্য ও রহস্য!

দশবিধ রসের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি—শ্রীদুর্গা !!

বঙ্গদেশে এবং ভারতের নানা স্থানে পৌরাণিক মতে দশভুজা দুর্গামাতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। দশদিকে বা সর্ব্বব্যাপী-রূপে অবস্থিত মায়ের দশটি করে, বিবিধ পৌরাণিক ধ্যান মতে * ত্রিশূল খড়্গ চক্র তীক্ষ্ণবাণ শক্তি, খেটক পূর্ণচাপ পাশ অঙ্কুশ ঘণ্টা অথবা পরশু (কুঠার) এই দশবিধ প্রহরণ সুশোভিত। এই দশটি প্রধান অস্ত্র, দশজন প্রধান দেবতা মায়ের শ্রীকরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া মথুরা নগরীতে হস্তীরূপী দানব কুবলয়াপীড়কে বধ করত উহার সুদীর্ঘ রক্তাক্ত দন্ত, গদার ন্যায় স্কন্ধে ধারণ করত কংস রাজার মল্ল-সভায় প্রবেশ করিলে, তাঁহাতে দশবিধ রসের বিকাশ হইয়াছিল; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ রসরাজ মূর্ত্তিরূপে উপস্থিত দর্শকগণের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিলেন! † সেইরূপ, পূর্ণ রসময়ী মা এখানে [চণ্ডীতে] আনন্দ ঘন রসমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের অস্ত্ররূপ শক্তি বা বল স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক সকল দেবতাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করত

---

* ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ। তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ॥ খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ। ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ" ॥

† এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

উচ্চনাদ উত্থিত করিলেন—এই দুর্গা মূর্ত্তিই দশভূজা রূপে আবির্ভূতা হইয়া দশ করে ধৃত দশবিধ প্রহরণ দ্বারা দশবিধ রসের বিকাশ করত পূর্ণ রসেশ্বরীরূপে আনন্দময়ী মা, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিতা হন এবং সকল শ্রেণীর ভক্তগণকেই আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

এক্ষণে দশভূজা মায়ের কোন প্রহরণে কোন রসের বিকাশ, তাহা ক্রমে প্রদর্শন করা হইতেছে; যথা—(১) ত্রিশূল—মহেশ্বরের ত্রিশূল, কালাগ্নি বর্ষণকারী সাক্ষাৎ প্রলয়স্বরূপ। তাই দুর্গা মা ত্রিশূল ধারণ করায়, রৌদ্রামূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইলেন।—এজন্য মায়েতে "রৌদ্ররস" অর্থাৎ ক্রোধ বা কোপের ভাব অভিব্যক্ত হইল। (২) কাল বা যম, মায়ের করে খড়্গ প্রদান করিলেন—কালের বা যমের ভয়ে সকলেই ভীত, সুতরাং মায়ের শ্রীকরে খড়্গ পরিধৃত হওয়ায়, "ভয়" ভাব বা "ভয়ানক" রসের বিকাশ হইল। -অর্থাৎ মায়ের হস্তে খড়্গ দর্শনে অসুরগণ ভীতি-বিহ্বল হইবে, ইহা উপলব্ধি করিয়া দেবগণ উল্লসিত হইলেন। তাই মায়ের ভয়ানক রস-মূর্ত্তিও দেবগণের আনন্দেরই কারণ হইল। (৩) বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ, মায়ের কর-কমলে চক্র প্রদান করিলেন—প্রেমভক্তির প্রতীক বৈষ্ণবাস্ত্র চক্র দ্বারাই মহামায়া মা জীব-জগতকে ধারণ ও প্রতিপালন করেন।—প্রেমেতেই জীব-জগত পরিধৃত পরিচালিত ও পরিপালিত হয়। মা এক দিকে যেমন ভীষণাদপি ভীষণা, আবার অন্যদিকে প্রেম করুণাতে পরিপূর্ণা।—কেননা তিনি যে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী মা; বিশেষতঃ মায়ের শাসন বা দুঃখদায়ক কার্য্যাদিও জীব-জগতের ভাবী মঙ্গলের জন্যই ব্যবস্থিত। [মায়ের কালী-মূর্ত্তিতেও বামদিকে রক্তাক্ত খড়্গ এবং দানব মুণ্ড এবং দক্ষিণ দিকে মা, বরাভয়-করা ভক্ত-মনোহরা। এইরূপে করাল বদনী কালিকা মাতাও প্রেমোৎফুল্লাননা, প্রেম-করুণাতে পরিপূর্ণা।] এই সব কারণে, মহামায়া মায়ের বৈষ্ণবাস্ত্র চক্রে প্রেম-ভক্তি-ভাবও অভিব্যক্ত। (৪) মায়ের শ্রীহস্তে বায়ুদেব, চাপ এবং বাণপূর্ণ তূণীর

দিয়াছিলেন ; কিন্তু ধ্যানে বর্ণিত "তীক্ষ্ণবাণ" কে দিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীতে উল্লেখ নাই ; কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, "আদি বা শৃঙ্গার রস" উপস্থ ইন্দ্রিয়েতেই বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে : সুতরাং উপস্থ ইন্দ্রিয়াধিপতি সৃষ্টির ভাব ধারণকারী প্রজাপতি ব্রহ্মাই তীক্ষ্ণবাণ মাতৃকরে অর্পণ করিয়াছিলেন—এই "তীক্ষ্ণবাণই" সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "মদনের শর" এজন্য শর বা বাণ তীক্ষ্ণরূপে বিশেষিত ও বর্ণিত ; এই তীক্ষ্ণবাণ ধারণ করিয়া দুর্গা মা, শৃঙ্গার-রসময়ী মদন-মোহিনী মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া সকলকেই আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন !!

(৫) অগ্নিদেব মায়ের শ্রীকরে শক্তি অস্ত্র প্রদান করিলেন—অগ্নি-দেবতা মুখ মণ্ডলস্থ বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি ; অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়াই দেবগণ বিশিষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকেন। অগ্নি প্রদত্ত শক্তি, মায়েতে হাস্য রসরূপে অভিব্যক্ত—জগতে হাস্য-ভাবের শক্তি অতুলনীয় —মুখ মণ্ডলের শোভা হাসি, হাসিমুখ ও মিষ্টি বাক্য দ্বারা সকলেই বিমুগ্ধ হয়, এমন কি শত্রুকেও বশীভূত করা যায়। যেমন অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া দেবতারা কথা বলেন, সেইরূপ আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তিগণকে হাস্য মুখেই অভ্যর্থনাদি করিতে হয়—ইহা চির আচরিত প্রথা। জনৈক দার্শনিক মহাত্মা বলিয়াছিলেন—[প্রশ্ন] জগতে সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তু কি ?—[উত্তর] হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল। [প্রশ্ন] সবচেয়ে দুঃখদায়ক বস্তু কি ?—[উত্তর] মলিন ভাবাপন্ন কালিমাযুক্ত মুখমণ্ডল। এজন্য হাসির শক্তি অপরিসীম ! তাই এখানে [চণ্ডীতে] সর্ব্বাগ্রে মুহুর্মুহু উচ্চহাস্য রব দ্বারা মহাপ্রাণময়ী মা, দেবতাগণের প্রাণে আনন্দ প্রদান করিলেন। এইরূপে শক্তি অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্গা মা হাস্যোৎফুল্লবদনা পরমানন্দময়ী-রূপে প্রতিভাত হইলেন। (৬) দেবরাজ ইন্দ্র মাতৃ-করে "বজ্র" প্রদান করিলেন—বজ্র আকাশ হইতেই বিশেষরূপে ক্রিয়াশীল হয় ; তাই বজ্রের অপর নাম "খেটক"—ইহাতে বীভৎস রস বা জুগুপ্সা ভাব বিদ্যমান ;

কেননা বজ্রাঘাতের কার্য্যকারিতা বা বজ্রাহত অবস্থা, বীভৎস্য রসেরই উদ্রেক্ করিয়া থাকে—বজ্রাহত প্রাণী বা বস্তু সম্যক্‌রূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই বীভৎস্য দৃশ্য দর্শনে সকলেই অভিভূত হয়। বর্ত্তমান যুগেও "এটম্" বা পরমাণু-বোমা দ্বারা নগর ধ্বংস করাও বীভৎস ভাবাপন্ন বজ্রাঘাত তুল্য! তাই ঐ সকল কার্য্য প্রাণবন্তের হৃদয়ে বীভৎস রস বা ঘৃণার ভাব প্রকট্ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক বিবরণাদিতে দৃষ্ট হয় যে, কেহ উৎকট সাধনা বা তপস্য আরম্ভ করিলে, বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্রও জুগুপ্স পরায়ণ হইয়া হিংসাত্মক্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং সাধকের সাধনা পণ্ড করিবার চেষ্টা করেন। তাই বজ্রে জুগুপ্সা-রস বা হিংসা ভাব বিদ্যমান; এজন্য মা বজ্র ধারণ করায়, মায়েতেও জুগুপ্সা রস বা হিংসা ভাবের অভিব্যক্তি হইল!—অর্থাৎ অসুরগণ তাহাদের স্বাভাবিক নিয়মে অতঃপর দুর্গামাতার প্রতি জুগুপ্সা ও ঘৃণা পরায়ণ হইবে; সেজন্য 'প্রতিক্রিয়ারূপ মায়েরও জুগুপ্সা রস ও হিংসা ভাবাদি, অসুরগণের বিনাশেরই কারণ হইবে', ইহা ভাবিয়া মায়েতে বিরুদ্ধ রস ও ভাব দর্শনেও দেবতাগণ পরম আনন্দিত হইলেন। (৭) বায়ুদেব মায়ের হস্তে পূর্ণচাপ অস্ত্র প্রদান করিলেন—ইহাতে অদ্ভুত রস বা বিস্ময় ভাবের অভিব্যক্তি; কেননা ধনু বা চাপের 'জ্যা' নিসৃত শব্দ বায়ুস্তরে অপূর্ব্ব কম্পন সৃষ্টি করে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে গমন পূর্ব্বক ধনুর্যজ্ঞের জন্য সুরক্ষিত ধনুকের 'জ্যাতে' অদ্ভুতরূপে টান দিয়া ধনুটি ভঙ্গ করিলে, সেই 'জ্যা' নিসৃত টঙ্কার এবং ধনুভঙ্গের অদ্ভুত শব্দে মথুরামণ্ডল প্রকম্পিত হওয়ায়, কংসাদি সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; সুতরাং মায়ের করে, পূর্ণচাপ ধৃত হওয়ায়, তাঁহাতে অদ্ভুত রস বা বিস্ময় ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে; এরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ উল্লসিত হইলেন।

(৮) জল-দেবতা বরুণদেব মায়ের হস্তে পাশ অর্পণ করিয়াছেন—পাশে করুণ রস বা শোকভাব বিদ্যমান। মায়া-পাশে আবদ্ধ হইয়াই

জীব জগতের প্রাণী মাত্রই শোকাভিভূত হয় এবং ক্রন্দনাদি করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে। আর মহামায়া মা, করুণায় অভিষিক্ত হইয়াই জীবের ভাবী মঙ্গলের জন্য যথাযোগ্য প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; সুতরাং মায়ের কর-কমলে বরুণের পাশ, করুণ-রসরূপে অভিব্যক্ত। (৯) মায়ের শ্রীকরে অঙ্কুশ অস্ত্র কে প্রদান করেন, তাহা চণ্ডীতে উল্লেখ না থাকিলেও, বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, প্রধান ইন্দ্রিয়াধিপতিগণের মধ্যে প্রশান্ত ভাবাপন্ন জীব জগতের সদা হিতকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় মায়ের করে অঙ্কুশ অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন; উন্মত্ত হস্তীগণকে অঙ্কুশাঘাতেই স্থির রাখা হয়; সেইরূপ উন্মত্ত মদস্রাবী মাতঙ্গ তুল্য মনকেও বিবেকরূপী অঙ্কুশাঘাতেই স্থির করার ব্যবস্থা আছে, এই সব কারণে অঙ্কুশ অস্ত্রে শান্তি বা শান্তরস এবং সমতা ভাব বিদ্যমান। আর মাতৃকরে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঘণ্টাতেও চিত্ত স্থির বা সমতাকারী শান্তিরস বিদ্যমান। এজন্য জগন্মাতা অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা শ্রীকরে ধারণ করায়, তাঁহাতে প্রশান্তি রস ও সমভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। (১০) বিশ্বকর্ম্মা মায়ের হস্তে পরশু বা কুঠার অর্পণ করিয়াছেন—ইহাতে বীর রস এবং উৎসাহ ভাব বিদ্যমান। দুর্গা মা শ্রীকরে পরশু ধারণ করায়, দেবগণের প্রাণে উৎসাহ প্রদানকারী বীর্য্যময়ী বীর মূর্ত্তিরূপে তিনি প্রতিভাত হইলেন!—মায়ের এই তেজস্বী বীরমূর্ত্তি দর্শনে দেবতাগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়াছিলেন।

এইরূপে সর্ব্ববিধ রসের আধাররূপিণী সর্ব্বদিক্ রক্ষাকারিণী দশ প্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গামাতা, শরৎকালে এবং বসন্তকালে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে রস বা আনন্দের পরিপূর্ণ আনন্দময়ীমূর্ত্তি রূপে মহাপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন!—বাঙ্গালী ভক্তগণ তথা ভারতবাসী মাতৃভক্তগণ এই দশবিধ রসের ঘনীভূত আনন্দময়ী দুর্গামাতাকে দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন!!—ইহাই মন্ত্রোক্ত আকাশ [স্বর্গ],

ভূমণ্ডল এবং পাতাল এই ত্রিভুবন বিক্ষোভিত বা পরমানন্দে উদ্বেলিত করিয়া মহালক্ষ্মী দুর্গামাতার প্রেম-গর্ব্বে বিরাট মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান হওয়ার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—৩৭ ৩৮

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধামুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্॥ ৩৯

সভ্য বিবরণ। অনন্তর সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, নানাভাবে নিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্রে দিক্‌দিগন্তর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল—(৩৯)

তত্ত্ব-সুধা। এক্ষণে তেজময় মণিপুর-চক্রে ভগবতী কুণ্ডলিনীশক্তি অসুর বিলয়রূপ যুদ্ধ বা মহাপ্রলয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কুণ্ডলিনীশক্তি একটী মুখদ্বারা মণিপুরস্থ তেজস্তত্ত্বময় অসুরদিগকে বিলয় করিবার জন্য মণিপুরে অপেক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে সেখানে তিনি সংহারিণী মূর্ত্তিতে অসুরগণের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিলেন, তখন অসুরগণও সেই প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে বিলয় হইবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। [সুরদ্বিষাং—সুরভাব বা দেবভাব সমূহকে যাহারা দ্বেষ বা হিংসা করে, তাহারাই সুরদ্বেষকারী অসুরঃ]।

তেজস্বী সাধক মাতৃ চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া যখন নিষ্কামভাবে এবং সাক্ষীরূপে অবস্থান করেন, তখন তিনি অসুরদলনরূপ মায়ের যুদ্ধলীলা দর্শন ও অনুভব করিতে থাকেন, এবং প্রশান্ত ভাবাপন্ন হইয়া প্রেমানুরাগে দীপ্ত হন; এই অবস্থায় মহাশক্তির সহিত আসুরিক বৃত্তি সমূহের অস্ত্ররূপ শক্তি বিনিময় দ্বারা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের দিক-দিগন্ত আলোকিত দর্শন করিয়া সাধক উল্লসিত হন। এতকাল সাধক স্বীয় খণ্ড বিখণ্ড শক্তি দ্বারা আসুরিক ভাব সমূহ দলন করিতে যাইয়া মহিষাসুরের নিকট পরাজিত হইয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে নিজ কর্তৃত্বাভিমান এবং শক্তিসমূহ মহাশক্তি মায়ের চরণে উৎসর্গ করায়, অসুর দলনে আর নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই; তাই এক্ষণে সাক্ষীভাবে মায়ের "যুদ্ধ-মহোৎসব" লীলা

সন্দর্শনে সাধক প্রেমানন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।—(৩৯)

মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ।
যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥ ৪০
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ।
অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ ॥ ৪১

সত্য বিবরণ। মহিষাসুরের প্রধান সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর এবং চামর নামক সেনাপতি চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে অন্যান্য প্রধান অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উদগ্র নামক মহাসুর ষষ্টিসহস্র রথ এবং মহাহনু কোটি রথ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।—(৪০।৪১)

তত্ত্ব-সুধা। প্রথম চরিত্রে অহমিকার বাহ্যিক স্থূল মালিন্য এবং মমতার স্থূল চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু বহির্ম্মুখী বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেও, যতদিন অন্তরেন্দ্রিয় সমূহকে সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন করা না হইবে, ততদিন মানব-জীবনের পূর্ণ সফলতা বা সার্থকতা আসিবেনা! এজন্য অর্দ্ধ প্রকাশিত অবস্থায় সূক্ষ্ম অহংকার এবং তাহার সহিত একাত্মভাবাপন্ন সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য মালিন্য প্রভৃতি সহকারীগণের নিগ্রহের ব্যবস্থা দ্বারা জীবভাব বিশুদ্ধ করিবার জন্য মধ্যম চরিত্রে অপূর্ব্ব সাধন-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। গীতাতে ভগবান দৈবী ও আসুরী-সম্পদ্-বিভাগযোগ অধ্যায়ে অসুররূপী আসুরিক্ ভাবসমূহের স্বরূপ নানা প্রকারে বর্ণনা পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"অসুরগণ দুষ্পূরণীয় কামনা অবলম্বন করত দম্ভ, গর্ব্ব ও অভিমানযুক্ত হইয়া অবিবেক বা মোহবশে অসৎ আগ্রহ পূরণের জন্য অশুচি ব্রতপরায়ণ হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; ইহারা মরণকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তাপরায়ণ হইয়া কাম-কামনা পূরণকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে। এইরূপে শত শত কামনা-পাশে

বদ্ধ হইয়া ইহারা কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হয়। আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা, আমি পূর্ণমনোরথ, আমি বলবান, আমি সুখী, ধনী, সদা হর্ষ প্রাপ্ত—এইরূপ সতত চিন্তা করিয়া অজ্ঞান-বিমোহিত ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। ইহারা অহংকার ও মোহ-জালে সমাবৃত হইয়া আমাকেও দ্বেষ করে (অর্থাৎ নাস্তিক হয়) এবং সাধুদিগের পুণ্যময় কার্য্যে দোষ দর্শন করিয়া থাকে।" ভগবৎ কথিত এই আসুরিক ভাব সাধারণ মানব-চরিত্রেও পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং মানব-জীবনের সার্থকতা লাভেচ্ছু সাধকগণকে যথাসাধ্য আপন আপন আসুরিক ভাবাপন্ন স্বভাব বা প্রকৃতি, বৃত্তি ও সংস্কারগুলি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে ক্রমশঃ অভ্যাস-যোগে পরিবর্ত্তিত করত, ভগবৎমুখী বা ভগবৎ প্রীত্যর্থে উহাদিগকে পরিচালিত করিয়া, গীতার নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের সাধনায় অভ্যস্ত হইতে হইবে; এইরূপে ক্রমে চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে দেবী-যুদ্ধের সাফল্য আনয়ন করিতে হইবে। যখন শরণাগতির সাফল্য আসে, তখন চণ্ডী-সাধক নিজ ব্যক্তিগত স্বভাবকে বা প্রকৃতিকে, মাতৃময় বা মাতৃশক্তিরূপে উপলব্ধি করিতে থাকেন —এই অবস্থায় দেহস্থ দেব-প্রকৃতিসকল সংঘবদ্ধ হইয়া আসুরিক প্রকৃতি সমূহকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হয়, ক্রমে বিচ্ছিন্ন আসুরিক ভাব বা শক্তিসমূহের সহিত ঐক্যবদ্ধ দেবভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; তদ্দারা আসুরিক ভাবসমূহ কতক বিলয় প্রাপ্ত, কতক নিগৃহীত, আর অবশিষ্ট, দেবভাবরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন শরণাগত সাধকের বিশুদ্ধ 'আমি', নিজ দেহে প্রকৃতিরূপিণী মায়ের সমর-লীলা সাক্ষী ও নিষ্কাম ভাবে দর্শন ও অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ হন, পরিশেষে মাতৃকৃপায় অভীষ্ট বা সংসিদ্ধি লাভে ধন্য হন।—ইহাই মানব-দেহে চণ্ডী মায়ের অপূর্ব্ব যুদ্ধ-লীলা এবং আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য। মহিষাসুরের সহায়তাকারী আটটী প্রধান সেনাপতির

নাম এই অধ্যায়ে উল্লেখ আছে ; ইহাদের যুদ্ধ-বিবরণ এবং আরও আটটী সহকারী সেনাপতির নাম পরবর্ত্তি অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। দেহস্থ অহংকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্বরূপভাব লাভের বিরোধী আসুরিক বৃত্তি ও ভাব সমূহ কিরূপে ক্রিয়াশীল হয়, তাহাই এখানে সেনাপতি ও সহকারী সেনাপতিরূপে বর্ণিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে—ইহাদের তাৎপর্য্য ক্রমে যথাস্থানে ব্যাখ্যাতে হইবে। মহিষাসুরের প্রধান সেনাপতি—(১) চিক্ষুর—চিত্ত-চাঞ্চল্য সমষ্টি ; চাঞ্চল্যই অহংকাররূপী মহিষাসুরের প্রধান অস্ত্র—ইহাদ্বারা সে মানবকে স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্যুত ও বিমুখ করিয়া বহুত্বের সেবায় নিয়োজিত এবং বহুমুখী বিচরণশীল করিয়া রাখিয়াছে ; তাই অতি তেজস্বী মানব, দীন হীন দুর্ব্বল বা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যোগশাস্ত্র চিত্তের এই চাঞ্চল্য বিদূরিত করিয়া স্বরূপভাব লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন—মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করাকেই "যোগ" আখ্যা দিয়াছেন, যথা—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"। জীব-ভাবীয় এই চাঞ্চল্য, দেহের চারিটি বিশেষ কেন্দ্রে অভিব্যক্ত হয়, যথা—বীর্য্য, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি, এই চতুর্বিধ চাঞ্চল্য দ্বারা অভিভূত বা প্রভাবিত হইয়াই মানব দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বীর্য্যের চাঞ্চল্যদ্বারা—মানবের মোহময় অবস্থার আবেশ হয় ; প্রাণের চাঞ্চল্য—'আমার-আমার' ভাব বা 'মম'ত্ব বোধক স্বার্থ বা মমতাতে অভিব্যক্ত হয় ; মনের চাঞ্চল্য—সংকল্প এবং সুখ দুঃখময় বিকার আনয়ন করে, বুদ্ধির চাঞ্চল্যে অহংকার বলপ্রাপ্ত হইয়া আরও গর্ব্ব প্রকাশ করে এবং রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখিত হয়—চাঞ্চল্যের এই চারিটি কেন্দ্রই চিক্ষুরের চতুরঙ্গ বল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আসুরিক নামগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিয়া উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বোধে কেহ উপহাস করেন, কিম্বা বিরক্তি প্রকাশও করিয়া থাকেন। যে সকল বিরুদ্ধ বা বিঘ্নকর ভাব, সাধকগণকে আধ্যাত্মিক জগতে সন্তাপিত বা দুঃখিত করে, উহারা অসুর তুল্য সন্দেহ

নাই। সুতরাং মন্ত্রোক্ত যুদ্ধ-বিবরণের আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ কালে আসুরিক নামের সহিত বিঘ্নকারক প্রধান প্রধান ভাবসমূহের সুবিন্যস্ত ঐক্যভাব দেখাইয়া নাম-করণ কার্য্যকে অলীক বা অস্বাভাবিক মনে করা সমীচীন নহে; বরং উহা যথাযথ আস্বাদন করিতে পারিলে, মন্ত্রোক্তির ভাব ও রহস্যসমূহ সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(২) **চামর**—চিত্তের অশুদ্ধতা বা সূক্ষ্ম-মালিন্যসমষ্টি; চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপদেষ্টাগণ সকলেই উপদেশ দিয়া থাকেন; —এবিষয়ে সকলেই একমত। জীবভাবীয় অশুদ্ধতা বা মলিনত্তা বিদূরিত না হইলে, চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হইয়া বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ না হইলে তাহাতে আত্মরাম ভগবান বা ভগবতীর জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে পারেনা—পরিচ্ছিন্ন বিষয়ভোগ ও বহুত্বের মোহরূপ মলিনত্ব অপসারিত না হইলে আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ বা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ পরমানন্দ লাভের সৌভাগ্য হয়না। এইরূপে স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরূপ জীবত্বের মালিন্য দূর করিয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্ব লাভ করিতে না পারিলে, ভগবৎ সেবারও অধিকার হয়না; কেননা প্রকৃত সেবকের পক্ষে সমধর্ম্মী ও সমভাবাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন; এই অভিপ্রায়ে সামীপ্য, সারূপ্য সাযুজ্য প্রভৃতি চির-বাঞ্ছিত ভক্ত জনোচিত মুক্তি লাভের ব্যবস্থাও ভক্তি-শাস্ত্র সম্মত। একটি কীটানুকীট দ্বারা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের নিত্য লোকে যথাযথ নিত্যসেবা হইতে পারেনা; এজন্য ভক্তগণকেও জীবভাবীয় অবিশুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা অপসারিত করিয়া সচ্চিদানন্দময় নিত্য-দেহ লাভ করিতে হইবে; তাহাহইলে প্রকৃত ভগবৎ সেবা সম্ভবপর হইবে *! —নিত্য লোকের পশু-পক্ষী বৃক্ষ-লতাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দময়। চিত্তের অশুদ্ধতা মন বুদ্ধি অহং এবং চিত্ত, এই চারিটী প্রধান কেন্দ্রেই বিশেষরূপে অভিব্যক্ত

* এবিষয়ে মৎ প্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থে বিস্তৃত সাধনা বিবৃত হইয়াছে।

হয়; এজন্য চামরকেও চতুরঙ্গ বল সমন্বিত বলিয়া মন্ত্রে বিবৃত করা হইয়াছে। ভগবান চৈতন্য দেব প্রচারিত ভক্তিমূলক নাম-রূপের সাধনাদ্বারা যুগপৎ চিত্তশুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা সাধন হইতে পারে, এজন্য তিনি কলির জীবকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক ত্রিসত্য করিয়া বলিয়াছেন—"হরের্নামৈব কেবলম্"।

(৩) উদগ্র—আত্মম্ভরিতা বা আত্মশ্লাঘা; ইহা দৈত্যগণের কিম্বা দৈত্যভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক বৃত্তি। উদ=ঔদ্ধত্য; অগ্র=শির; যাহাদের শির কোন অবস্থাতেই অবনত হইতে চায় না এবং যাহারা নিজেদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই প্রসংশনীয় ও অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে—তাহারাও উদগ্র অসুর দ্বারা প্রভাবিত। উদগ্রের সৈন্য সংখ্যা ষড় অযুত—দৈবী ভাবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা শ্রদ্ধা এবং সমাধান—ইহাই "ষট্‌ক সম্পত্তি" বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত; এই ছয়টি দৈবী ভাবের বিপরীত আসুরিক ভাব সমূহই উদগ্র অসুরের প্রধান ছয়টী বল বা শক্তি; আর যাহা কোন অবস্থাতেই পরমাত্মভাব বা ভগবৎভাবের সহিত যুক্ত বা মিলিত হইতে চায়না, তাই 'অযুত'; অর্থাৎ জীবভাবীয় অসত্য ভেদ ও মালিন্য প্রভৃতিই 'অযুত' বা 'নিযুত।

(৪) মহাহনু—মানসিক বিকার; এই মানসিক বিকার কোন না কোন আকারে জীবমাত্রকেই অভিভূত করিতেছে—এজন্য এই ব্যাপক ও মহাবলশালী বৃত্তিটীকে 'মহাহনু' বলা হইয়াছে। সুখ-দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাব এবং আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ ত্রিতাপজ্বালা দ্বারা, জীবমাত্রই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়—ইহাই মহাহনুর বহুরূপে অত্যাচার, এজন্য ইহার বল কোটী বা শতলক্ষ—অর্থাৎ ইহা জীবকে বহু লক্ষ্যে বিকারগ্রস্ত করিয়া দুঃখ প্রদান করে। এই মহাহনুর অত্যাচার হইতে সাধককে রক্ষা করার জন্য গীতাতে ভগবান বহুরূপে এবং বহুস্থানে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং সকল

অবস্থায় সমত্ব বা নির্ব্বিকার ভাব অবলম্বন করিয়া অমৃতত্ব লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।—(৪০ । ৪১)

পঞ্চাশদভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ ।
অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভি র্বাস্কলো যুযুধে রণে ॥ ৪২
গজ বাজি সহস্রৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ ।
বৃতো রথানাং কোট্যাচ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত ॥ ৪৩

সভ্যবিবরণ ।—অসিলোমা পঞ্চাশ নিযুত রথ এবং বাস্কল ছয়শত অযুত রথ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরিবারিত নামক অসুর অনেক সহস্র হস্তী অশ্ব এবং কোটি রথে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। —(৪২ । ৪৩)

তত্ত্বসুধা। সেনাপতি সংখ্যা—(৫) অসিলোমা—বিষয়-ভোগাসক্তি! ইহা প্রতি পদে পদে দুঃখদায়ী এজন্য নাম 'অসিলোমা'। যে কোন আকারে বা অবস্থায় হউক না কেন, পরিচ্ছিন্ন বিষয় ভোগদ্বারা স্থায়ী সুখ বা শান্তি হয় না, বরং সুখের আশাতে প্রধাবিত হইয়া পরিশেষে দুঃখ লইয়াই ফিরিতে হয়! তাই বৈষয়িক সুখকে গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"পরিণামে বিষমিব" অর্থাৎ উহা পরিণামে বিষবৎ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি"—পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। পরমাত্মার সহিত মিলনজনিত ভুমানন্দ জীব একদিন ভোগ করিয়াছে, সেই আনন্দের সংস্কার জীবেতে বর্ত্তমান, তাই সেই স্বরূপানন্দ পাইবার জন্যই জীব সদা লালায়িত এবং চির-অভাবগ্রস্ত; পরিচ্ছিন্ন অনিত্য বিষয়ে কখনও নিত্যানন্দ ভোগ হইতে পারেনা; এজন্য সুখের আশায় পরিচ্ছিন্ন বিষয়

* এ সম্বন্ধে গীতার বিভিন্ন ভগবৎ উক্তি—"সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে;" "সুখেদুঃখসমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" "যোগস্থ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে"। "নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো", "বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।" ইত্যাদি

ভোগ করিতে যাইয়া অতৃপ্তি এবং দুঃখেই উহার পরিসমাপ্তি হয়। সৌভাগ্যবশে যখন মানবের চণ্ডী-সাধনা আরম্ভ হয়, তখন শরণাগতির সাফল্যে রূপ-রসাদি বিষয় পঞ্চক মাতৃময় ও শক্তিময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। তখন সাধক অনুভব করেন—"বিশ্বজননী যেন পঞ্চ-প্রদীপের পঞ্চ আধারে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধময় পঞ্চ সলিতা, প্রেমানন্দরূপ ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া, অখণ্ড জ্ঞানময় অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা রচনা পূর্ব্বক, বিশ্বপিতা জ্ঞানময় পঞ্চাননের * আরতি করিতেছেন! —তখন সাধক জ্ঞানালোকে অনুভব করেন—বিষয়ানন্দও ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে!—সমস্তই প্রেমময় ও সচ্চিদানন্দময়!! অসি-লোমার বল, পঞ্চাশ নিযুত বা পাঁচশত লক্ষ; সেনাপতিগণের মধ্যে ইহার বলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কেননা ভোগাসক্তির এবং তাহার বিষয়ের শেষ নাই—উহা অনন্ত লক্ষ্যে বা আধারে অনন্ত ভাবে ক্রিয়াশীল।

বাস্কল—ঐকান্তিক 'মম'ত্ব বোধ বা 'আমার—আমার' ভাব; গৃহ, বিত্ত, সম্পত্তি কিংবা আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি ঐকান্তিক মমতাই বাস্কল অসুররূপে প্রকটিত! 'আমার আমার' শব্দ ভোগাসক্ত ব্যক্তির কর্ণে সুমধুর গুঞ্জন ধ্বনি বা কল-নাদরূপে প্রতিভাত হয়!—তাই উহা বাঃ কল বা বাস্কলরূপে ক্রিয়াশীল। বহির্ম্মুখী মমতার বন্ধন কোনরূপে ছিন্ন করিলেও, অন্তর হইতে উহাকে বিদূরিত করা বড়ই কঠিন। প্রথম চরিত্রে, রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য, বাহ্য জগতের আসক্তির বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বাহ্যিক মমতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঋষির প্রশান্তিময় আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেখানে

---

* ভূতভাবন ভবানীপতি ভগবান পঞ্চাননের বিরাট কল্পনা দ্বারা প্রপঞ্চময় বা পঞ্চভূতাত্মক্ জগতের বিকাশ। শিবের পঞ্চ আননের নাম ও ভাব—(১) সদ্যোজাত—আকাশ বদন; (২) বামদেব—বায়ু বদন; (৩) অঘোর—তেজ বদন; (৪) তৎপুরুষ—(তৎ=ব্যাপক্)—জীবন বা জলময় বদন; (৫) ঈশান—ঐশ্বর্য্যময় ভৌম বদন।

থাকিয়াও মমত্বার মানসিক বা সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য হইতে বিমুক্ত হইতে না পারিয়া তাঁহারা অতি দুঃখিত হইয়াছিলেন—ইহাই 'বাস্কল' অসুরের কার্য্য এবং প্রভাব। অন্নময় প্রাণময় মনোময় জ্ঞানময় (বুদ্ধিময়) বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই ছয় কোষেই জীবের মমত্ব-বোধ বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল হয়—ইহারাই বাস্কলের ছয় নিযুত বল। [ছয়শত অযুত = ছয় নিযুত ; যাহা পরমাত্মভাবের বিরোধী বা বিমুখ তাহাই 'নিযুত'—এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।]—(৪২)

(৭) পরিবারিত—অসন্তোষ বা অশান্তি ; জগতের জীবমাত্রই অসন্তোষ দ্বারা পরিবারিত বা অসন্তুষ্ট, কেহই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে চায়না—সাম্রাজ্য লাভ করিয়াও, সম্রাটের রাজ্য বৃদ্ধির লিপ্সা দূর হয় না। মানবের প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে ইহজন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে ; ইহা না বুঝিয়া সর্ব্বদা অসন্তোষ দ্বারা পরিবারিত (বেষ্টিত) হইলে অশান্তি এবং দুঃখই লাভ হইবে ; সুতরাং আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া, হা হুতাশ করিলেও কোন ফলে দয় হইবে না—বিশেষতঃ বাহিরের কশাঘাত অন্তরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে! সন্তোষের সহিত শান্তি একীভূত বা একাত্মভাবে জড়িত, সুতরাং শান্তি লাভ করিতে হইলে, বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও সন্তোষকে অবশ্যই বরণ করিয়া লইতে হইবে—চণ্ডী-সাধকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

এক্ষণে অসুরগণের চতুরঙ্গ'বল' সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন ; রথ, গজ, বাজি এবং পদাতিক সৈন্য, এই চারি শ্রেণীর সমর-সজ্জাকেই সাধারণতঃ 'বল' বলা হইয়া থাকে ; অসুরগণের চতুরঙ্গ বলও সর্ব্বতোভাবে আসুরিক ভাবাপন্ন, এরূপ গণ্য করিতে হইবে। জীব-দেহে আসুরিক চতুরঙ্গ বল, যথা—(১). রথ—মায়ামোহময় আসুরিক ভাব-সমষ্টিই রথ স্বরূপ ; অর্থাৎ দেহ-রথ যখন আসুরিক বুদ্ধিরূপ সারথীদ্বারা

পরিচালিত হয়, যখন মনরূপ সংযমের রশ্মি, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং অসংযত ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত্বাধীনে রাখিতে সমর্থ হয় না, তখন ঐ রথ অসুরের রথরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। (২) গজ—অজ্ঞান-তমসার ঘনীভূত অবস্থাই দেহস্থ আসুরিক গজ বা হস্তী ; এজন্য 'নিরেট্' বোকাকে 'হস্তীমুর্খ' বলা হইয়া থাকে। হস্তীর সুবিশাল দেহের তুলনায় তাহার চক্ষু দুইটি অতি ক্ষুদ্র ; এজন্য গজাসুর প্রভাবিত ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ণমনা হয় এবং তাহাদের দৃষ্টিও ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত ভাবাপন্ন হয়। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিই অনন্ত ভোগ-বিলাসের জন্য প্রমত্ত বা লালায়িত হয়—ইহাই গজের 'মদস্রাব'। (৩) বাজি—ইন্দ্রিয়গণের ভোগাসক্তিময় অনন্ত চাঞ্চল্যই, 'বাজি' বা অশ্বগণের উদ্দাম ও বেগময় গতিস্বরূপ—এই ভোগাসক্তিময় ইন্দ্রিয়রূপী বাজি সমূহ দেহে তড়িৎ সহযোগে তড়িৎ বেগে সদা বিচরণশীল। (৪) পদাতিক—(যাহারা পদব্রজে গমনাগমন করিয়া যুদ্ধ করে)—বিভিন্ন আসুরিক ভাবের শক্তিময় গতি এবং প্রগতিই বলস্বরূপ। এই আসুরিক বলরূপ বিভিন্ন সৈন্যদ্বারা কলির জীবমাত্রই কিছু না কিছু প্রভাবিত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। যে শিক্ষাদ্বারা আসুরিক গতি ও প্রগতি, দেবভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সেরূপ কোন শিক্ষার সুব্যবস্থা বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয় না—ঋষিগণের তপঃপ্রভাব, যোগিগণের যোগৈশ্বর্য্য, সনাতন ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বর্ত্তমান শিক্ষার্থীগণের নিকট কবির কল্পনা বা স্বপ্নতুল্য বলিলে বোধ হয় বিশেষ অত্যুক্তি করা হইবে না! পদাতিক সৈন্যগণের মন্থরগতিতে অগ্রগমন পূর্ব্বক রাজ্য দখলের ন্যায়, পাশ্চাত্য বিলাস-স্রোত ভেক-গতিতে ধীরে ধীরে ভারতের বা ভারতবাসীগণের মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিতেছে! ভারতের চিরন্তন ও সনাতন চির-স্নিগ্ধ ভাব-ধারা, বিলাসের লালসাময় ফেনিল তরঙ্গাঘাতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে! জড়-সভ্যতা স্ফীতবক্ষে দানবী

দীপ্তিতে লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করত লুপ্তপ্রায় আর্য্য-সভ্যতাকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত। কিন্তু মাভৈঃ—ভয় নাই! ভগবানের লীলা-নিকেতন ভারতে সনাতন-ধর্ম্মের কখনই বিলোপ হইবেনা!—একদিন উহা আপন গৌরবে ও মহিমায় বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করিবেই করিবে!—এইরূপ প্রগতির বিচিত্র ও বিভিন্ন সংস্কারই মানব-দেহে আসুরিক বলস্বরূপ 'পদাতিক'! ইহাদের সংখ্যা বহুসহস্র এবং শত শত লক্ষ্যে ইহারা সতত চঞ্চল।

> বিড়ালাক্ষোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ।
> যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ॥ ৪৪
> অন্যেচ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্ব্বৃতাঃ।
> যুযুধু সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ॥ ৪৫

সত্য বিবরণ।—বিডালাক্ষ পঞ্চাশ অযুত বা পঞ্চলক্ষ রথে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য অসুরগণও অযুত অযুত হস্তী অশ্ব ও রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণ-ক্ষেত্রে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।—(৪৪।৪৫)

তত্ত্ব-সুধা। সেনাপতি সংখ্যা— (৮) বিড়ালাক্ষ—কুটিলতা; আর্জ্জব বা সরলতা না থাকিলে সাধন-পথে উন্নত হওয়া যায়না। বৈষয়িক কূট-নীতিতে যাহারা অভ্যস্ত এবং সতত বিষয়ে আসক্ত, তাহাদের পক্ষে স্বরূপত্ব লাভ বা ভগবৎ প্রাপ্তি সুদূরপরাহত—অন্তর বাহির একভাবাপন্ন ও সরল করা চাই। বিড়ালের চক্ষু বা দৃষ্টি লোভনীয় বস্তুতে নিবদ্ধ থাকে, অথচ বাহিরে বেশ শান্ত-শিষ্টভাব অবলম্বন করে—এরূপ দ্বিভাবাপন্ন 'বিড়াল-তপস্বী' হইলে, আধ্যাত্মিক সাধনার উন্নতি হইবেনা। মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহং, চিত্ত এই পাঁচটী প্রধান কেন্দ্রই, কুটিলতার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়-ক্ষেত্র, আর ইহা বহু লক্ষ্যে বা বিষয়ে ক্রিয়াশীল, এজন্য ইহার বল পাঁচলক্ষ রথ। এই আটজন প্রধান সেনাপতি ব্যতীত আরও

অসংখ্য আসুরিক ভাবাপন্ন যোদ্ধা স্ব স্ব বল বা শক্তিসহ তেজময়-ক্ষেত্রে প্রকটিত হইয়া দেবভাব সমূহকে বিধ্বস্ত ও পরাভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল—ইহারাই মন্ত্রোক্ত মহাসুরগণের রথ, নাগ, (গজ) হয় প্রভৃতি চতুরঙ্গ অন্যান্য আসুরিক বল—ইহারা মণিপুর চক্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়া প্রলয়ঙ্করী ভগবতী কুণ্ডলিনীর দেহে বিলয় হইবার জন্য আকর্ষিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আসুরিক ভাবের প্রভাব, কোন না কোন আকারে প্রত্যেক মানব-দেহে ক্রিয়াশীল হইয়া কিছু না কিছু দুঃখ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকে। পাপ কার্য্য বা ভোগাসক্তিতে নিজের ঐকান্তিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা না থাকিলেও, অলক্ষিতে মানবের কর্ম্মানুযায়ী সংস্কাররাশি বৃত্তিরূপে মূর্ত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক যেন তাহাকে রজঃ ও তমোগুণময় দুঃখদায়ী কার্য্যে প্ররোচিত বা প্রবৃত্ত করে। ভাগ্যাকাশে অলক্ষিতে থাকিয়া সংস্কার-রূপিণী দুর্জ্ঞেয়া অদৃষ্ট-শক্তি মানবের সর্ব্বপ্রকার গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করিতেছেন—এই অপ্রতিহত শক্তির উপর কাহারও হাত বা স্বাধীনতা নাই। চণ্ডী-সাধক, এই পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল, মহাশক্তিতে বা ভগবানে সমর্পণ করত প্রশান্ত ও নিষ্কাম হন; এ বিষয়ে গীতাতেও ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—"প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, কিন্তু অহংকার-বিমূঢ়-চিত্ত ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' এরূপ মনে করে"—"তুমি সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া 'মদনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই ভগবানের কার্য্য, আর এই কার্য্যের ফলাফলও তাঁহারই, আমি তাঁহারই অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি মাত্র—এইরূপ বিশ্বাসে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক তাপ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ কর (জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হও)।" ভব-নাট্যমঞ্চে মহাশক্তিময় ভগবানের ইচ্ছাতেই অনন্ত নাট্যাভিনয় হইতেছে, তিনি যাহাকে যে বেশে সাজাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাকে সেই বেশেই সজ্জিত করিয়া নাট্য-

লীলা সম্পাদন করাইতেছেন!—সুতরাং অভিনয়ের ভাল মন্দ ফলাফল সমস্তই তাঁহাতে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই হাতে যন্ত্রবৎ ক্রীড়ণকরূপে সানন্দে কর্ম্ম-স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই গীতা ও চণ্ডী-সাধকের কর্ত্তব্য। তাই সিদ্ধ মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"ভবে সব মায়ের খেলা। মায়ের আপ্তভাবে গুপ্তলীলা॥ স্বগুণে নির্গুণ বাঁধিয়ে, ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গ্ছে ঢেলা। * * প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ব'সে থাক ভাসিয়ে ভেলা। যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।" ॥—কি সুন্দর সত্যময় উক্তি!—আত্ম-সমর্পণের অপূর্ব্ব কৌশল এই সাধকোক্তিতেও অভিব্যক্ত।—(৪৪।৪৫)

কোটি কোটি সহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা।
হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৪৬

সত্ত্য বিবরণ। সেই যুদ্ধে মহিষাসুর কোটি কোটি সহস্র রথ, গজ এবং ঘোটকাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।—(৪৬)

তত্ত্ব-সুধা। মহিষাসুর সর্ব্বাগ্রে অনাহত পদ্মে উঠিতে সমর্থ হইয়াছে; ক্রমে তাহার সহকারী প্রধান অসুরগণও চতুরঙ্গ বলান্বিত হইয়া তাহাকে পরিবেষ্টন করত, তথায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান বা অপেক্ষা করিতে লাগিল, আর অবশিষ্ট তেজস্তত্ত্বজাত অসুরগণ মণিপুরে যুদ্ধ করিয়া লয় হইতে লাগিল। মন্ত্রে—"তত্র যুদ্ধে" উক্তি গৌণ লক্ষণাত্মক, কেননা, উহা ভাবী অনাহত-চক্রের যুদ্ধকে উপলক্ষিত করা হইয়াছে, এজন্য "অত্র যুদ্ধে" অর্থাৎ মণিপুরে প্রবর্ত্তিত 'এই যুদ্ধে' না বলিয়া, 'সেই যুদ্ধে' বলা হইয়াছে। মহিষাসুরের চতুরঙ্গ বল সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সৎকার্য্য মাত্রই বিঘ্ন সঙ্কুল, এজন্য সাধক যখন কোন প্রকার ভাল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা সাধন-ভজনে আত্ম-নিয়োগ করেন, তখন অলক্ষিতে ঐ সকল কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত মহিষাসুরের দলবল প্রস্তুত হইয়া ক্রিয়া-পরায়ণ হয়—এইরূপে নানা

প্রকার বিঘ্ন বা বিপদদ্বারা সৎকার্য্য পণ্ড হইবার উপক্রম হয়।—মহিষাসুরের এই অত্যাচার ব্যবহারিক জগতে সতত দৃষ্ট বা অনুভূত হইয়া থাকে।—(৪৬)

তোমরৈ র্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা।
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ॥ ৪৭
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে।
দেবীং খড়্গ প্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ॥ ৪৮

সভ্য বিবরণ।—কোন কোন অসুর, তোমর (শাবল) দ্বারা, কেহবা ভিন্দিপাল (হস্ত-ক্ষেপ্য শরবিশেষ) দ্বারা, কেহ শক্তি (শল্য) দ্বারা কেহ মুসল (জয়-দণ্ড) দ্বারা, কেহ খড়্গদ্বারা, আর কেহবা পরশু (কুঠার) ও পট্টিশ (অস্ত্রবিশেষ) দ্বারা দেবীর সহিত সংগ্রাম স্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোন কোন অসুর-শক্তি, আবার কেহবা পাশ (বন্ধন-রজ্জু) দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, কেহ কেহ খড়্গ দ্বারা সেই দেবীকে নিহত করিবার উপক্রম করিল।—(৪৭।৪৮)

তত্ত্ব-সুধা।—এইবার দেবীর সহিত অস্ত্র বা শক্তি বিনিময়রূপ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এখানে দেবাসুর-যুদ্ধের একটী **বিশেষ রহস্য** পাঠকগণের স্মরণ রাখিতে হইবে; কেননা যুদ্ধ-মহোৎসবে বা সাধন-সংগ্রামে উহা সর্ব্বত্রই অবলম্বন করা হইবে। সার্ব্বভৌমিক বা সমষ্টিভাবে মহাশক্তিরূপিণী মা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণা এবং অদ্বিতীয়া; ব্যষ্টিভাবে বা জীব-জগদাকারে তিনিই নিজকে পরিচ্ছিন্ন অনন্ত ভাবে বিভাবিত করিয়া সংসার-চক্রে খণ্ড খণ্ড আনন্দ-মধু পান-লীলায় নিমগ্না!—তিনিই একাধারে সৎ এবং অসৎভাবরূপিণী, আবার তিনিই সৎ ভাবের পোষিণী এবং অসৎ ভাব বিনাশিনী। দেবীসূক্তে এবং দেবী-মাহাত্ম্যের সর্ব্বত্রই মায়ের এই প্রকার পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহের একধারে যুগপৎ সমাবেশের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি হইয়াছে। দেবীসূক্তের প্রথম পাঁচটী মন্ত্রে,

মায়ের ব্রহ্মময় আত্ম-বিকাশ বর্ণিত ; আর পরবর্ত্তী তিনটী মন্ত্রে ব্রহ্ম-বিদ্বেষী ভাব সমূহের হননাদি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট লীলার অভিব্যক্তি। দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে স্তব-মন্ত্রে, বিদ্যা—অবিদ্যা, মুক্তি হেতু—বন্ধনের হেতু, পরমা, আবার অপরমা ইত্যাদি উক্তিদ্বারা, ঋষি একাধারে মাতৃ-দেহে সৎ- এবং অসৎ প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাব সমূহের একত্রে সমাবেশ দেখাইয়াছেন। চতুর্ভুজা কালিকা দেবীর মূর্ত্তিটীতেও একদিকে ভক্ত-মনোহর বরাভয়যুক্ত করদ্বয়, আবার অন্য দিকের দুইটী করে, রক্তাক্ত খড়্গ এবং সদ্যচ্ছিন্ন রক্তপ্রবাহযুক্ত দানব-মুণ্ড!—নাস্তিক বা দৈত্যের নিকটে মা, ভীষণাদপিভীষণা বিকটদশনা করালবদনা ; আবার ভক্তের নিকটে মা—সুমধুর হাস্যময়ী করুণা-পরিপূর্ণা প্রেমফুল্লাননা—ইহাই মায়ের স্বরূপ বা প্রকৃতি ; এজন্য সৎ অসৎ উভয়বিধ ভাবই মায়েতে চিরাশ্রিত এবং লীলায়িত—এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। মায়ের সমষ্টি প্রকৃতিতে যেমন এই বিরুদ্ধ ভাবসমূহ বিদ্যমান, সেইরূপ জীবের ব্যষ্টি প্রকৃতি বা বৃত্তি সমূহেও পরস্পর বিরোধী ভাবদ্বয় নিহিত ; অর্থাৎ জীব-জগতে যত প্রকার বৃত্তি বা ভাব আছে, উহারা সমস্তই প্রকৃতিগত বা মাতৃঅংশ সম্ভূত, এজন্য উহারাও দ্বিভাবাপন্ন। এই সার্ব্বভৌমিক নিয়মে, কাম—ভগবৎমুখী হইলে প্রেমে পরিণত হয়, ক্রোধ—ক্ষমাতে এবং অনুরাগে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ; হিংসা-অহিংসাতে, অসত্য—সত্যে পর্য্যবসিত হইতে পারে ; এবিষয়ে প্রথম চরিত্রেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে জীব-দেহের ইন্দ্রিয় সমূহও, যন্ত্র স্বরূপ—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি, যে পথে পরিচালিত হইবে, সেই দিকেই উহাদের গতি হইবে ; দৈবীভাব বা আসুরীভাব ইন্দ্রিয়েতে নাই—উহারা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ; সুতরাং যেরূপ প্রতিবিম্ব উহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে, সেই রূপটিই ফুটিয়া উঠিবে—জীব-শক্তি যেরূপভাবে উহাদিগকে পরিচালনা করিবেন, উহারা সেই সেই ভাবেই বিক্ষোভিত

বা ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিবে! এইরূপ স্বাভাবিক নিয়মে, শক্তিময় অস্ত্রগুলিও দেবতার হাতে পড়িলে—জগতের মঙ্গল সাধন করিবে, আবার অসুরের হাতে পড়িলে, অমঙ্গল বা ধ্বংসলীলার অভিনয় করিবে। জাগতিক নিয়মেও দেখা যায়—ধনৈশ্বর্য্য, সংযমী বা ধার্ম্মিকের হস্তে পতিত হইলে, উহা পরোপকারার্থে বা ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে ব্যয়িত হয়; আবার ধন-সম্পত্তি, পাপী বা অধার্ম্মিকের হস্তে পরিচালিত হইলে, উহা পর-পীড়ন, অত্যাচার এবং ভোগ-বিলাসাদিতেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী জীব, সৎ বা অসৎ যেরূপ ভাব গ্রহণে অভ্যস্ত, ইন্দ্রিয়গুলিও ঠিক সেই সেই ভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং দৈবী ও আসুরী ভাব, বিষয় বা ইন্দ্রিয়গত নহে—উহা আত্মগত বা নিজ নিজ প্রকৃতিগত।

মহাশক্তির সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; মায়ের দেহ চিন্ময় ও জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং উহা অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত বা বিদ্ধ হইতে পারেনা, মাতৃ-দেহে আঘাত জনিত বেদনা বা দুঃখানুভূতিও অসম্ভব; এজন্য অসুরগণ যে সকল অস্ত্র মায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছে বা করিবে, তাহা মায়ের সর্ব্বগ্রাসী কারণ ভাবাপন্ন চিন্ময় দেহেই লয় পাইতেছে বা পাইবে। দেবতা এবং অসুরগণের হস্তে ধৃত অস্ত্রসমূহ তাহাদের স্ব স্ব শক্তি বিশেষ, সুতরাং অসুরের অস্ত্র-ত্যাগ অর্থ—তাহাদের নিজ নিজ শক্তির ক্ষয় বা হীনতা প্রাপ্তি; পক্ষান্তরে দেবী যে এক একটী চিন্ময় অস্ত্র অসুরের প্রতি নিক্ষেপ করিবেন, উহা দ্বারা ক্রমে অসুরের আসুরিক বৃত্তি সমূহ, দেবভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িবে!—এইরূপে প্রত্যেক অসুরের বৃত্তি সমূহ চিন্ময়ী মায়ের চিন্ময় অস্ত্রাঘাতে দেবভাবাপন্ন হইয়া, তাহারা ক্রমে দেবসৈন্যরূপে পরিণত হইবে। আবার কোন কোন অসুর, মাতৃঅঙ্গে বিলীনরূপ পরম-ধাম প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। এই সব কারণে দেবী-মাহাত্ম্যের যুদ্ধ-লীলা অতি বিস্ময়জনক এবং রহস্যময় গুহ্য ভাবে পরিপূর্ণ।

যে সকল প্রধান অস্ত্র মহাশক্তি দুর্গামায়ের শ্রীকর-পল্লব দ্বারা ধৃত, তাহাদের ব্যাখ্যা ইতি পূর্ব্বে যথাস্থানে করা হইয়াছে ; এক্ষণে পূর্ব্ববর্ণিত মায়ের কতকগুলি অস্ত্র, অসুর হস্তেও ধৃত, এরূপ দৃষ্ট হয় ; এই অস্ত্রগুলি বাহ্য দৃষ্টিতে দেবভাব বা দেবশক্তির পরিচায়ক হইলেও, উহারা অসুর হস্তে ধৃত হওয়ায় তৎতৎ দেবভাবের বিপরীত আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া ক্রিয়াশীল হইবে। এবিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাউক—দেবীর হস্তে ধৃত খড়্গ—অজ্ঞানতা নাশক বা ছেদক জ্ঞান ; আবার অসুর হস্তে ধৃত খড়্গ—জ্ঞান ছেদক অজ্ঞান। অসুর যখন জ্ঞান নাশক অজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা দেবীকে আঘাত করিবে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবেনা, পক্ষান্তরে ঐ জড়ভাবব্যঞ্জক অস্ত্র, কারণরূপিণী মায়ের চিন্ময় শরীরে লয় হইয়া অসুরকেই শক্তিহীন করিয়া দিবে। এই প্রকারে দেবীর অষ্টাদশ প্রধান অস্ত্রসমূহের অধিকাংশ অস্ত্র, অসুর হস্তে ধৃত হইয়া, দেব-ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে ক্রিয়াশীল হইবে। এতৎ ব্যতীত অসুরগণের হস্তে কতকগুলি বিশেষ অস্ত্রও ছিল, তাহার তাৎপর্য্য ক্রমে বিবৃত করা হইতেছে।

আসুরিক অস্ত্র—(১) তোমর—(শাবল) অখণ্ড বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করাই তোমর অস্ত্রের কার্য্য। চিত্তের চাঞ্চল্যই মানবকে অখণ্ড পরমাত্মার দিক হইতে ফিরাইয়া খণ্ড খণ্ড পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়া বহুমুখী চঞ্চল করিয়া তুলে। এজন্য চিক্ষুর এবং তৎপরিচালিত অসুর-গণের অস্ত্র—'তোমর'। (২) ভিন্দিপাল—ভেদভাব সমূহ যাহাদ্বারা দীপালির ন্যায় উজ্জ্বল ও সুখপ্রদ বলিয়া প্রতিভাত হয়। চিত্তের অশুদ্ধতাই স্বরূপ জ্ঞান বা স্বরূপ ভাব লাভের অন্তরায় ; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মময় বা শক্তিময় এই সত্য, মলিন চিত্তে প্রতিফলিত হইতে পারে না এবং চিত্তের মালিন্য দ্বারাই অনন্ত ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে—এই অজ্ঞানতার জন্যই জগতে বিষয়-গোচর-জ্ঞানের অনন্ত ছড়াছড়ি পরিদৃষ্ট

হয়, এজন্য ভিন্দিপাল অবিশুদ্ধ চামর ও তৎসৈন্যগণের অস্ত্র। (৩) শক্তি—পূর্ণ আসুরিক সামর্থ্য বা বল। উদগ্র অসুর কর্ত্তৃক অভিভূত ব্যক্তিগণ আত্মশ্লাঘা বা আত্ম-প্রশংসা করিতে যাইয়া, নিজ নিজ শক্তির অতিরঞ্জিত ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে এবং তদ্দ্বারা সমাজে 'বাহবা' পাইবার অভিলাষ করে; কিম্বা ঔদ্ধত্য প্রকাশেও অতিরিক্ত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া থাকে; এজন্য উদগ্র ও তৎ সৈন্যগণের অস্ত্র—শক্তি। (৪) মুষল—ঐক্যবদ্ধ অজ্ঞান সমষ্টি; ইহা অসুরের হস্তে 'জয়-দণ্ড' স্বরূপে ধৃত হইয়া দম্ভ, দর্প ও অভিমান প্রকাশ করে। অবিদ্যাজনিত অজ্ঞানতার ফলেই মানসিক বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা প্রকৃতি বা তাঁহার নিজস্ব গুণদ্বারা পরিচালিত কার্য্য সমূহেও আত্ম-কর্ত্তৃত্ব অনুভব করাইয়া মানবকে গর্ব্বিত করে; তজন্য মহাহনু এবং তৎ পরিচালিত অসুরগণের অস্ত্র—মুষল।

(৫) খড়্গ—জ্ঞান-নাশক আসুরিক প্রভাবময় অজ্ঞান। ভোগাসক্তিতে আসুরিক অজ্ঞানতাময় প্রভাব পূর্ণরূপেই প্রকট হয়—ইহাতে জ্ঞানের নির্ম্মলভাব লুপ্ত বা সুপ্ত থাকে; এজন্য ভোগাসক্তিময় অসিলোমা এবং তাহার সহকারীগণের অস্ত্র—খড়্গ। (৬) পরশু—বিজ্ঞান নাশক অজ্ঞান। 'আমার আমার'রূপ স্বার্থময় মমত্ব বোধই অখণ্ড পরমাত্ম-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া মানবকে চঞ্চল ও মলিন করিয়া রাখে; এজন্য বিজ্ঞানময় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না; এইসব কারণে স্নেহান্ধ বাস্কল এবং তদনুচরগণের অস্ত্র —পরশু। (৭) পট্টিশ—আসুরিক মায়াময় বা ঐন্দ্রজালিক অস্ত্র। জীব-মায়া অবিদ্যাই নানা প্রকার মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক মানবকে ভ্রান্ত, অশান্ত এবং অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে এবং সতত দুঃখ প্রদান করিতেছে; এজন্য অসন্তুষ্ট অশান্ত পরিবারিত এবং তাহার সহকারীগণের অস্ত্র—'পট্টিশ'। (৮) পাশ—আসুরিক ভাবীয় বন্ধন-রজ্জু। কুটিলভাব দূর করিয়া সরলতা

লাভ না করিতে পারিলে, অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় প্রকাশ অবস্থা লাভ না হইলে, সেখানে আত্মময় ভগবৎ ভাবের বিকাশ হইতে পারে না ; এজন্য মানব, ভব-পাশে আবদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যুর কবলে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে কুটিল বিড়ালাক্ষ এবং তৎ সহকারীগণের অস্ত্র—'পাশ'।

এইরূপে দেহস্থ অসুরগণ এই সকল আসুরিক বল দ্বারা সাধকের ঐক্যবদ্ধ মহাশক্তিময় দেব-ভাবকে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।—(৪৭।৪৮)

সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা।
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥ ৪৯
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ।
মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥ ৫০

সভ্য বিবরণ। অনন্তর স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণকারিণী সেই চণ্ডিকা দেবীও অনায়াসেই [অসুরনিক্ষিপ্ত] সেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মানা অম্লানবদনা সর্ব্বশক্তি-ময়ী দেবী, অসুরগণের দেহে খড়্গ বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন— (৪৯।৫০)

তত্ত্ব-সুধা। মণিপুরস্থ তেজতত্ত্বময় অসুরগণ সর্ব্বাগ্রে দেবীর প্রতি অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল—ইহাই আসুরিক আক্রমণের চিরন্তন নিয়ম ; তৎপর দেবীও নিজ দিব্যাস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাদের আসুরিক ভাবপূর্ণ শক্তিময় অস্ত্রসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিলেন। শরণাগত ভক্তের দেবভাবসমূহ একত্রিত হইয়া মহাশক্তিরূপে পরিণত এবং মা স্বয়ং সাধন-সংগ্রামে অবতীর্ণা হইয়াছেন ! সুতরাং আসুরিক উদ্বেলনে বা আক্রমণে আর ভয় কি ?—অসুর নিধন যে অবশ্যম্ভাবী। সৌভাগ্যবান সাধক, আজ সাক্ষীরূপে মায়ের এই অসুর-দলনরূপ অপূর্ব্ব

লীলা সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও পুলকিত! সাধকের খণ্ড খণ্ড শক্তি দ্বারা পূর্ব্বে যে অসুর-দলন কার্য্য অতীব কষ্টকর বোধ হইয়াছিল, সেই গুরুতর কার্য্যের ভার মাতৃকরে ন্যস্ত বা সমর্পিত হওয়ায়, মা অবলীলাক্রমে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

মহাশক্তিময়ী মা সাধকের দেব-প্রকৃতি সমূহের সমষ্টিরূপে আজ আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অবতীর্ণা হইয়া সংগ্রাম-লীলায় নিমগ্না; এই অপূর্ব্ব কার্য্যে, মায়ের কিছুমাত্রও ক্লান্তি বা পরিশ্রম বোধ হইতেছে না; বরং মায়ের মুখে মৃদুমন্দ হাসি বিকসিত হইয়া ভক্তকে অভয় প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ মহাশক্তির কোন কালেই হ্রাস বৃদ্ধি নাই বা হইতে পারেনা—অনন্ত কাল যাবৎ শক্তি-লীলার অনন্ত বিলাসে বা বিকাশেও তাঁহার শক্তির কিছুমাত্রও হীনতা, লাঘবতা বা ব্যতিক্রম হয় না! —তাই মা আমার চির-যৌবনা চির-আনন্দময়ী ত্রিপুর-সুন্দরী ষোড়শী বা রাজ-রাজেশ্বরী! —তাই যুদ্ধ করিয়াও মা হাস্যময়ী অম্লান-বদনা বা "অনায়স্তাননা"! যুদ্ধ-লীলা সন্দর্শনে অনাহত পদ্মস্থিত সংঘবদ্ধ দেবগণ মায়ের স্তব করিতে লাগিলেন; আর ঋষি-ভাবাপন্ন প্রশান্ত সাধকগণও ঐ স্তবে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ এবং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন। অসুরদলনী মা আজ ঐশ্বর্য্যময়ী ঈশ্বরীরূপে দিব্য-ভাব বিকাশ করিয়া অসুরগণকে কৃপা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রোক্ত "মুমোচ" বাক্যটীতেও সুন্দরভাব নিহিত আছে—মা যেন অসুরগণকে তাহাদের মোহ ও অজ্ঞানতার বন্ধন হইতে চির-মুক্ত করিয়া দিলেন! কিম্বা অসুরগণের দেহে মুক্তিরূপ দিব্যাস্ত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিলেন—ইহাই "মুমোচ"বাক্যের তাৎপর্য্য। —(৪৯। ৫০)

সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী।
চচারাসুর-সৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ॥ ৫১

সত্য বিবরণ। সেই দেবী-বাহন সিংহও ক্রোধে কেশর কম্পিত

করিয়া বনমধ্যস্থ দাবানলের ন্যায় অসুর-সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। —(৫১)

তত্ত্ব-সুধা। দেবী-বাহন সিংহ (কেশরী)—ইনিই সাধকের ধর্ম্ম-ভাব সমষ্টি; সমস্ত পশুভাবের উপর যিনি আধিপত্য করিতে পারেন, তিনিই মহাতেজস্বী পশুরাজ সিংহ বা ধর্ম্ম—ধর্ম্মই আসুরিক ও পাশবিক ভাবসমূহকে সিংহ-বিক্রমে দলন করিতে সক্ষম, এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতৎব্যতীত মায়ের বাহন সম্বন্ধে অন্যপ্রকার তাৎপর্য্যও আছে, যথা—সাধক যেন তাহার পাশবিক বৃত্তি ও ভাবসমূহ একত্রিত করিয়া 'পশুরাজ' সিংহরূপে মাতৃ-চরণে বলি বা সমর্পণ করিয়াছেন—মাতৃপদ-স্পর্শে সেই পশুরাজও তাহার পাশবিক ও আসুরিক 'ধর্ম্ম' পরিত্যাগ করত দেবভাবে পূর্ণ হইয়া সমষ্টি ধর্ম্মরূপে মায়ের সেবা করিবার জন্য মাতৃচরণে যেন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন! মায়ের শ্রীঅঙ্গে অসুরগণ অস্ত্রাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে; তাই ধার্ম্মিক সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া কেশর কম্পিত করিয়াছেন; ধর্ম্ম যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন অধর্ম্ম-দলন সহজসাধ্য হয়। মস্তকই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় সমূহের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় বা কেন্দ্র. সুতরাং ধর্ম্মরূপী সিংহের 'ধুত সট' অর্থাৎ নির্ম্মল কেশর বা জটাসমূহ জ্ঞানময় শিখাদ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তিনি অরণ্যতুল্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অসুর সৈন্যগণ মধ্যে সিংহ-বিক্রমে দাবানলের ন্যায় বিচরণ করিয়া আসুরিক ভাব সমূহ বিলয় করিতে লাগিলেন। [যিনি অহংকার এবং সর্ব্ববিধ তামসভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছেন, তাঁহাকেই শাস্ত্রকার 'ধুত' বলিয়া থাকেন; যথা—'অবধুত'; আর ধুত শব্দের অন্য প্রকার অর্থ—কম্পন, ইহাতেও চৈতন্যময় ভাব অভিব্যক্ত, কেননা জড় পদার্থের নিজস্ব বাহ্যিক কম্পন দৃষ্ট হয় না।]

নিঃশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।
ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ॥ ৫২

সভ্য বিবরণ। রণস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে অম্বিকা যে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, সেই প্রত্যেক নিঃশ্বাসই শত-সহস্র গণ বা প্রমথ সৈন্যরূপে পরিণত হইল।

তত্ত্ব-সুধা। চিন্ময়ী মায়ের জ্যোতির্ম্ময় ও চিদানন্দময় দেহ, স্বগত স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদশূন্য, সুতরাং তাহাতে জীবভাবীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের তেমন প্রয়োজন হয় না; তবে এখানে নিঃশ্বাস সমূহ উক্তিদ্বারা মহাপ্রাণময়ী মায়ের প্রাণময় ও গণময় অনন্ত দেবভাবের অভিব্যক্তি সূচনা করে। প্রাণই সংযমী মানবকে কোমলতা, সজীবতা এবং চিদানন্দময় ভাব প্রদান করিয়া থাকে; যাহারা নির্দ্দয় ও নির্ম্মম-ভাবাপন্ন তাহাদিগকে প্রচলিত কথায় 'প্রাণহীন' বলা হয়; পক্ষান্তরে যাঁহারা মহানুভব এবং উদার, তাঁহাদিগকে 'হৃদয়বান' (প্রাণময়) বলিয়া গণ্য করা হয়। সাধক যখন বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সংসারকে বিষময় এবং সাধন-পথের সাক্ষাৎ বিঘ্ন বা অন্তরায়রূপে গণ্য করে, তখন তাহার হৃদয়, নির্ম্মম নির্দ্দয় এবং কঠোরভাবাপন্ন হয়; আবার সংযমের আত্যন্তিক কঠোরতা দ্বারাও সাধকের হৃদয় কঠিন ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে! সুতরাং সংযমীকে কোমল, প্রাণময় এবং উদারভাবাপন্ন হইতে হইবে—ক্রমে বিশ্বময় আত্ম-দৃষ্টি বা প্রেম-দৃষ্টি প্রসারিত করত মহাশক্তিময়ী মাকে বিশ্বরূপে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে অবনমিত হইতে হইবে! তাই মহাপ্রাণময়ী মা নিঃশ্বাস দ্বারা প্রাণময় এবং জ্ঞানময় অনন্ত দেবভাবসমূহ সৃষ্টি করিয়া সাধককে প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

প্রাণবায়ুর হ্রস্বতা, লঘুতা এবং স্থিরতা প্রভৃতি সাধনা এবং রেচক পূরক ও কুম্ভক সম্বলিত প্রাণায়াম প্রভৃতির সাধনা দ্বারা সাধকের দেহ শুদ্ধ হইয়া ক্রমে উহা লঘুতা প্রাপ্ত হয় এবং তৎসহ বায়ু ও মন যুগপৎ স্থির হইয়া সাধকের সত্ত্বগুণময় অবস্থা আনয়ন করে; পরিশেষে

সাধকের চিদ্ব্যোম্-ক্ষেত্র প্রকাশিত হয়—এই সকল প্রাণের বিভিন্ন অবস্থাকেও মায়ের নিঃশ্বাসরূপে বিশ্বাস করিতে হইবে। যোগশাস্ত্রমতে জীবাত্মা "সোঽহং" বা "হংস" এই মহামন্ত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করিতেছেন—অর্থাৎ জীবমাত্রেরই নিঃশ্বাস গ্রহণকালে 'সো' শব্দ অলক্ষিতে ধ্বনিত হয়—ইহা শক্তিময় ভাব; আর প্রশ্বাস ত্যাগ কালে 'হং' শব্দ ধ্বনিত হয়—ইহা শিবময়ভাব। এইরূপে শ্বাস ত্যাগ দ্বারা শিব. মৃত্যু আনয়ন করেন; আর প্রাণময়ী মা নিশ্বাস গ্রহণ দ্বারা জীবকে সঞ্জীবিত করেন! —ইহাও সোঽহং বা হংসরূপে মায়ের নিঃশ্বাস। আর কেহবা নিশ্বাস গ্রহণের সহিত মূলমন্ত্র যোগ করিয়া 'অজপা' জপ করত ইষ্ট-ধ্যানে তন্ময় হইয়া আত্ম-নিবেদন করেন—ইহাতেও মায়ের নিঃশ্বাস! —এই সকল ভাব, মন্ত্রে "নিঃশ্বাসাঃ" উক্তির তাৎপর্য্য ও রহস্য। মন্ত্রোক্ত 'গণ' শব্দটীও ভাবব্যঞ্জক—বর্ত্তমান কালে গণশক্তি এবং গণ-প্রভাব, জগতের সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল এবং বিজয়ী; সংবদ্ধ গণশক্তির নিকটে রাজশক্তিও অবনমিত বা পরাজিত!—গণশক্তি যদি ধর্ম্ম ভাবে বা দেবভাবে পরিচালিত না হয়, তবে উহা প্রলয় বা ধ্বংস এবং সার্ব্বভৌমিক অশান্তিই আনয়ন করিবে; কিন্তু চিন্ময়ী মায়ের গণ-সৃষ্টি. দেবভাবাপন্ন এবং জগন্মঙ্গল স্বরূপ। আর গণকে প্রমথ সৈন্যও বলা হয়—সমুদ্র মন্থনে যেরূপ দেব-ভোগ্য ঐশ্বর্য্য এবং অমৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ সাধন-সমুদ্র মন্থনের চরম পরিণতি—শরণাগতি এবং তৎফলে মহাশক্তি লাভ; এইরূপে তৎকৃপায় সঙ্ঘবদ্ধ প্রমথগণরূপ দেবভাব সমূহের অভ্যুদয় এবং আসুরিক ভাবের চির-বিলয় দ্বারা প্রশান্তি বা মুক্তি।

যৌগিক ব্যাখ্যায়—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধার পদ্ম হইতে ক্রমে দেবভাব এবং অসুরভাব সমূহ লয় করিয়া আসিতেছিলেন—এক্ষণে যুদ্ধরূপ মহোৎসবটী সুসম্পন্ন করিবার জন্য যুগপৎ মণিপুরে তেজস্তত্ত্বময়

এবং অনাহত পদ্মে প্রাণময় দেবভাব সমূহ গণরূপে সৃষ্টি করিলেন—মণিপুরস্থিত প্রমথগণ আসুরিক ভাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তৎকালে অনাহত পদ্মস্থিত প্রমথগণ নাদরূপ বাদ্যধ্বনি করিবেন; পরিশেষে অনাহত পদ্মে মহিষাসুর, গণসৈন্যকে ত্রাসিত করার পর, স্বয়ং বিলয় হইয়া দেবীর কৃপা প্রাপ্ত হইবেন। —(৫২)

যুযুধুস্তে পরশুভি ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ।
নাশয়ন্তোঽসুর গণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥ ৫৩
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে।
মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥ ৫৪

সত্যবিবরণ। তাঁহারা [প্রমথ সৈন্যগণ] দেবীর শক্তিতে বর্দ্ধিত-সামর্থ্য হইয়া পরশু ভিন্দিপাল, খড়্গ এবং পট্টিশ দ্বারা অসুরগণকে নাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধ-মহোৎসবে প্রমথ সৈন্যগণের মধ্যে কেহ কেহ পটহ, কেহবা শঙ্খ, আবার কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন। —(৫৩।৫৪)

তত্ত্ব-সুধা। দেবভাব-সমূহ আসুরিকভাবের সহিত চারিপ্রকার অস্ত্ররূপ শক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; তন্মধ্যে দুইটী অস্ত্র অসুর হস্তে ধৃত ছিল, এজন্য পূর্ব্বে তাহাদিগকে আসুরিকভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; এক্ষণে ঐ দুইটী অস্ত্র দেব হস্তে ধৃত হওয়ায়, উহারা অসুরভাবের বিপরীত ভাবে ক্রিয়াশীল হইল—অর্থাৎ অসুরহস্তে ভিন্দিপাল দ্বারা ভেদভাব সমূহ দীপালীর ন্যায় পৃথক্‌রূপে প্রকট হইয়াছিল; এক্ষণে দেব-হস্তে ঐ অস্ত্র ধৃত হওয়ায়, ঐ ভেদভাব সমূহ যেন, আরাত্রিকের দীপাধারে সুসজ্জিত হইয়া ভগবৎ পূজারূপে একই মহান্ উদ্দেশ্যে অর্পিত হইল এবং অখণ্ড জ্ঞানালোক বিতরণ করিতে লাগিল। আর পট্টিশ অস্ত্রদ্বারা যেমন, অসুরগণ মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল, এক্ষণে দেব-হস্তে ধৃত হওয়ায়, উহা অসুরের মায়া

বা ইন্দ্রজাল সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্যভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এতৎব্যতীত প্রমথ সৈন্যগণ মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হইয়া অজ্ঞান নাশক বিজ্ঞানরূপ পরশু-অস্ত্রদ্বারা আসুরিক অজ্ঞান তমসা বিদূরিত করত তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন; আর জ্ঞান খড়্গ দ্বারা অজ্ঞানতাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেখানে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ করিতে লাগিলেন।

অনাহত পদ্মস্থিত অন্যান্য প্রমথগণ সেই যুদ্ধ-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য পটহ, শঙ্খ এবং মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য করিতে লাগিলেন— সর্ব্বশ্রেণীর সাধক আধ্যাত্মিক জগতে কিছুমাত্র উন্নত হইলেই নাদময় বিভিন্ন শব্দ বা অনাহত ধ্বনি, নিজ দেহে শ্রবণ করিয়া থাকেন। যোগ-শাস্ত্রমতে সাধকগণ সিদ্ধাসনে বসিয়া গুরু প্রদর্শিত উপায়ে নব দ্বার রুদ্ধ করত গভীর রাত্রে "ভ্রামরী" কুম্ভক বা অন্যপ্রকার নাদ-সাধনা দ্বারা প্রণবময় অনাহত ধ্বনি, এবং বিভিন্ন নাদ শ্রবণ করিতে সক্ষম হন। এসম্বন্ধে যোগিবর ঘেরণ্ড বলিয়াছেন—"প্রথমে ঝিল্লীরব শুনিবে, পরে বংশীনাদ, তৎপর মেঘের রব, পরে ঝর্ঝরি সংজ্ঞক বাদ্যধ্বনি, ক্রমে ভ্রমর গুঞ্জন, পরিশেষে ঘণ্টা কাংস্য তুরী-ভেরী মৃদঙ্গ আনক দুন্দভি ইত্যাদি নানাপ্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে।" যোগিবর যাজ্ঞবল্ক্যও এইসকল শব্দময়ী নাদকে মন্ত্রোক্তির ন্যায় তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—"ঐ নাদ বীণাদণ্ডের ন্যায় উত্থিত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; উহার প্রথম অবস্থা—শঙ্খ-শব্দের ন্যায়, মধ্যম অবস্থা—মেঘ ধ্বনিবৎ [—ইহাই মন্ত্রোক্ত পটহের শব্দ] এবং শেষ অবস্থা—গিরি নির্ঝরবৎ [—ইহা কতকটা মৃদঙ্গ-শব্দের মত] শ্রুত হইয়া থাকে।" মোট কথা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মস্তরে সেই যুদ্ধ মহোৎসবে, প্রণবময় পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী নাদের ঐক্যতান উত্থিত হইয়া সাধকের হৃদয়-ক্ষেত্রে তাল-মান-লয়ের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি হইল।

যুদ্ধ-মহোৎসব—যেখানে মহাশক্তিরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী মা স্বয়ং অসুর-দলনরূপ কৃপা প্রকাশ দ্বারা অসুরগণকে দেবভাবে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, কিম্বা মুক্তি প্রদান করিতেছেন—যে সংগ্রাম-লীলা শরণাগত সাধক সাক্ষীরূপে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ ও পুলকিত!—দেবগণ এবং মহর্ষিগণ যে লীলা সন্দর্শন করিয়া পুষ্পবৃষ্টি করত মায়ের স্তবপরায়ণ, সেই মহামুক্তির মহাযজ্ঞকে মন্ত্রে, "যুদ্ধ-মহোৎসব" বলা যুক্তিসঙ্গত সুরুচিসম্মত এবং অতি সুশোভন হইয়াছে।—(৫৩।৫৪)

ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ।
খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥ ৫৫
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্ ।
অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্যানকর্ষয়ৎ ॥ ৫৬

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা ও শক্তি বৃষ্টিদ্বারা এবং খড়্গাদি দ্বারা শত শত মহাসুরকে বধ করিলেন॥ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা বিমোহিত করিয়া অন্যান্য অসুরগণকে ভূপাতিত করিলেন; কাহাকেও বা পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া, ভূতলে আকর্ষণ করিলেন॥ (৫৫।৫৬)

তত্ত্ব-সুধা। এক্ষণে মহাশক্তি মা বিশেষরূপে যুদ্ধলীলা আরম্ভ করিলেন। মায়া-মোহ এবং আসুরিক প্রভাবে প্রভাবিত ও বিমুগ্ধ হইয়াই মানব, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি জ্ঞাতা, ইত্যাদি প্রকারে অহং ভাবাপন্ন হয়; এইরূপে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা চতুর্দ্দশ প্রকার বিষয়াদিতে বিমুগ্ধ হইয়া সে অখণ্ড জ্ঞানময় সত্তাতেও সর্ব্বত্র ভেদভাব বা জ্ঞানের 'ত্রিপুটী' * বিভাগ দর্শন করে। সাধকগণের পক্ষে

* আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত বা ক্রিয়াশীল চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়—অধ্যাত্ম, এই ইন্দ্রিয় বা করণের চতুর্দ্দশ দেবতা—অধিদৈব এবং ইহাদের চতুর্দ্দশ বিষয়—অধিভূত, এই বিয়াল্লিশ তত্ত্ব যখন ব্যবহার হয়, তখনই জীবের জাগ্রত অবস্থা; আর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ ভেদই তিনটি পুট বা আকার, ইহাকেই 'ত্রিপুটী' বলা হয়; এইরূপে জ্ঞাতা জ্ঞেয়

অনন্ত ভেদ প্রতীতি সমূহও অসুরতুল্য; এজন্য শরণাগত সাধকের পক্ষে মা জ্ঞানময় ত্রিশূলাঘাতে আসুরিক ভেদভাবরূপ অজ্ঞানতা ও মায়া-মোহ বিদূরিত করত দিব্যজ্ঞানের প্রকাশ করিলেন, তখন সাধক অনুভব করিতে লাগিলেন—যে জীব-জগত অনন্ত ত্রিপুটি বিভাগে বিভক্ত বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিভাত হইতেছিল, তাহার মূলে এক অখণ্ড চৈতন্যময় জ্ঞান-সত্তা বিরাজিত—"একোঽহং বহুস্যাম্" —"আমি এক আছি—বহু হব"—মহাশক্তিময় পরমাত্মার এই সঙ্কল্পই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত জীব জগতরূপে অভিব্যক্ত! —সকলই শক্তিময় পরমাত্মময় এবং সচ্চিদানন্দময়।

গদা—অশুদ্ধভাব লয়কারী আত্মজ্ঞান। মা গদাঘাত দ্বারা জীব-ভাবীয় সঙ্কীর্ণতা বা স্বার্থময় সঙ্কোচভাব এবং অশুদ্ধতা বিদূরিত করিয়া সাধককে আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—তখন সাধক অনুভব করিতে লাগিলেন—"মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা"—অর্থাৎ আমার আত্মা শুধু আমার দেহে আবদ্ধ নয়—উহা সর্ব্বভূতে এবং জীব-জগতে পরিব্যাপ্ত! শক্তি—মায়ের সামর্থের প্রতীক; শক্তি-বৃষ্টি দ্বারা মা পূর্ণবলে আসুরিক ভাব সমূহকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ও দেবভাবাপন্ন করিতে লাগিলেন। তেজতত্ত্বময় চৈতন্যরূপী খড়্গ দ্বারা মা আসুরিক ভাব সমূহ খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ জ্ঞানে বা চৈতন্যে উদ্বোধিত করিলেন। [অন্তরেন্দ্রিয় সমূহের কেন্দ্র জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তককে, কর্ম্মাঙ্গ ও জড়াঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া জ্ঞান প্রদান করিলেন]।

জ্ঞান, দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন, কর্ত্তা কর্ম্ম করণ, ইত্যাদি সমস্তই অখণ্ড জ্ঞানের ত্রিপুটী বিভাগ। ত্রিপুটীর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের মধ্যে যে, কোন একটীর অভাব হইলে অপর দুইটী নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে; অর্থাৎ তিনের একত্র যোগেই কার্য্য সম্ভবপর হইয়া থাকে। [জ্ঞানেন্দ্রিয়েব বিষয়—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ; কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়—বচন আদান-প্রদান, গমন মলমূত্রাদি নিঃসরণ; চারি অন্তকরণের বিষয়—সঙ্কল্প-বিকল্প, নিশ্চয় অহং পনা এবং সংস্কার গ্রহণ বা পরিচিন্তন]

ঘণ্টা—সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী ত্রিগুণময় শব্দ। ঘণ্টা শব্দ দ্বারা মা দেবভাব সমূহ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে পুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং এতৎ সঙ্গে যুগপৎ আসুরিক ভাব স্তম্ভিত বা বিলয় করিতে লাগিলেন। পূজার আদিতে বা প্রারম্ভে ঘণ্টা ধ্বনি—দেবভাব সৃষ্টিজ্ঞাপক, পূজার মধ্যাবস্থায়—উহা স্থিতি অর্থাৎ পুষ্টি ও তুষ্টি জ্ঞাপক এবং পূজান্তে ঘণ্টাধ্বনি—পরিপূর্ণত্ব বা বিলয়জ্ঞাপক। পূজা আরতি প্রভৃতিতে, শঙ্খ, 'কাসর' (কাংস) প্রভৃতির সমবেত বাদ্য ধ্বনি একীভূত হইয়া প্রণব-ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে—অর্থাৎ ওম্ ওম্ বা ব্যোম্ ব্যোম্ ধ্বনি উত্থিত হয়। এই ধ্বনি আধারভেদে বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে—ধার্ম্মিকের হৃদয়ে উহা মনঃস্থির করিয়া আনন্দপ্রদান করে; আবার অধার্ম্মিক বা নাস্তিকের হৃদয়, যেন ঐ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া তাহার ভীতি বা বিরক্তি উৎপাদন করে। কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেও সমবেত শঙ্খধ্বনি পাণ্ডবপক্ষের হর্ষ উৎপাদন করিয়া, কৌরবপক্ষের হৃদয় 'বিদীর্ণ' করিয়াছিল। এখানেও মায়ের ঘণ্টা-ধ্বনি দ্বারা অসুরগণ বিমোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিল—অর্থাৎ তাহাদের আসুরিক বল-বীর্য্য জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল! ইহারা সময়ান্তরে পুনরায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিবে! পাশ—বন্ধন-রজ্জু; অতি দুষ্ট এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাব সমূহকে মা দেবভাবাপন্ন করুণার পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া এবং আকর্ষণ করিয়া তাহাদের আসুরিক শক্তি জড়ত্বে পরিণত করিলেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত 'ভূতলে আকর্ষণ'।—(৫৫।৫৬)

কেচিদ্দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গপাতৈ স্তথাপরে।
বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভূবি শেরতে ॥৫৭
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুসলেন ভৃশং হতাঃ।
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥ ৫৮

সভ্য বিবরণ। কেহবা তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডীকৃত হইল;

কাহাকে বা গদাঘাতে নিহত করিয়া ভূমি-শয্যায় পাতিত করিলেন, কিম্বা মাটীতে পুতিয়া ফেলিলেন ; কোন কোন অসুর মুসল দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া রক্ত বহন করিল, কেহবা শূলাঘাতে বিদীর্ণ-হৃদয় হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল।—(৫৭।৫৮)

তত্ত্ব-সুধা। মায়ের তেজতত্ত্বময় চৈতন্যরূপ অতি সূক্ষ্ম খড়্গাঘাতে আসুরিক ভাব সমূহ খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন হইল। সূক্ষ্ম তত্ত্ব-জ্ঞান বা বিচার দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে আসুরিক ভাব বা অজ্ঞানতা আপনা হইতে বিদূরিত হয়—ইহাও মাতৃহস্তে ধৃত খড়্গের মহিমাস্বরূপ। যাহাদিগকে মা গদাঘাত দ্বারা আত্ম-জ্ঞানে উদ্বোধিত করিলেন, তাহাদের অজ্ঞানতামূলক জড়ভাব যেন মাটীতে প্রোথিত বা কবরিত হইল, অর্থাৎ তাহারা অব্যক্তে মিশিয়া গেল। কেহ রক্ত বমন করিতে লাগিল—তাহাদের রক্তরূপ জীবনী-শক্তি ক্রমে ক্ষয় হইয়া তাহারা দুর্ব্বল হইতে লাগিল, অর্থাৎ তাহাদের রক্তরূপ রজোগুণ যাহা আসক্তিময় অনন্ত ভোগ-বিলাসের অবতারণা করিতেছিল, কিম্বা আসুরিকভাবে বিভাবিত হইয়া নানা প্রকার সূক্ষ্ম-চাঞ্চল্যে উদ্বেলিত হইতেছিল, তাহা এক্ষণে মুসলরূপ দেব-দণ্ডদ্বারা বিমর্দ্দিত হইয়া দেবভাবে পরিণত হইল—অর্থাৎ ভোগাসক্তিময় রজোগুণ প্রেমানুরাগরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া, সাধককে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। মানব-দেহে **রক্তই রজোগুণ**—জীবনী-শক্তির বাহ্যিক স্থূল বিকাশ রক্তদ্বারাই সংসাধিত হয়—রক্তহীন হইলে, মানুষের শরীর সকল বিষয়েই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে ; আবার রক্তের চাপ বা রক্তাধিক্যেও শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হয় ; সুতরাং রক্তরূপ রজোগুণের সংযত ও সাম্যাবস্থাই শরীরের পক্ষেও স্বাস্থ্যপ্রদ ও মঙ্গলজনক ; আবার ঐ রক্ত যখন অন্তর্ম্মুখী হইয়া ভগবৎ প্রেমানুরাগরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন উহা ভাবোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে ; কিন্তু ভাবহীনতা বা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস উভয় অবস্থাই

আধ্যাত্মিক চিন্ময়-দেহ সংগঠনের পক্ষেও অন্তরায়স্বরূপ! এবিষয়ে তৃতীয় খণ্ডে রক্ত-বীজ-যুদ্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। কোন কোন আসুরিক ভাবের বক্ষে শূলাঘাত করিয়া মা তাহাদিগকে ভূমিতে পাতিত করিলেন—বক্ষই প্রাণ-চৈতন্যের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র; সুতরাং বক্ষে জ্ঞানময় শূলাঘাত দ্বারা মা তাহাদের আসুরিক ভাবকে সম্পূর্ণ বিলয় বা প্রাণহীন করিলেন অর্থাৎ তাহাদের আসুরিকভাব জড়ত্বে পাতিত করিয়া, তাহাদিগকে দেবভাবে পরিবর্ত্তিত এবং চৈতন্যময় করিলেন, —এইরূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহারা দেব সৈন্যরূপে পরিণত হইল। —ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য। —(৫৭-৫৮)

> নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে।
> সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দ্দনাঃ ॥৫৯
> কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবা স্তথাপরে।
> শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥৬০
> বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্ব্যাং মহাসুরাঃ।
> একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ॥৬১

সত্য বিবরণ। সেনাগ্রগামী কতকগুলি অসুর, সমরাঙ্গনে অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল॥ কোন কোন অসুরের বাহু ছিন্ন হইল, অপর কতকগুলি অসুরের গ্রীবা বিচ্ছিন্ন হইল; কাহারও মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল এবং কতকগুলি অসুরের দেহ-মধ্যভাগ বিদারিত হইল॥ কতকগুলি মহাসুরের জঙ্ঘাদ্বয় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পৃথিবীতে পতিত হইল; কেহবা দেবীকর্ত্তৃক দ্বিখণ্ডিত হওয়ায়, প্রত্যেকভাগে এক বাহু এক চক্ষু এবং এক চরণবিশিষ্ট হইল।—(৫৯-৬১)

তত্ত্ব-সুধা। নিরন্তরা—যেখানে কোনপ্রকার অন্তর বা 'ফাক্' নাই মন্ত্রে 'নিরন্তরা' উক্তিতে দুইপ্রকার ভাব নিহিত আছে, যথা—(১) দেশ ভাবে অন্তরের অভাব; মা অসুরের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এবং

প্রতিলোমকূপে দেবভাবাপন্ন শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আসুরিকভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিলেন—তাহাদের দেহে এমন একটু স্থান বা দেশ ছিলনা যাহা মায়ের চিদানন্দময় শরদ্বারা বিদ্ধ না হইয়াছিল। (২) কাল ভাবে অন্তরের অভাব, মাতৃপক্ষে—তিনি অনবরত অর্থাৎ বিনা অবকাশে শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সাধক পক্ষে—যাহারা নিরবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় নাম-জপে রূপ ধ্যানে একতানতা এবং লক্ষ্য বস্তুতে শরের ন্যায় একাগ্রতা লাভ করেন; কিম্বা ইষ্টদেবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন, তাহাদের আসুরিকভাব আপনিই বিলয় হইয়া দিব্যভাব প্রকাশ পায়—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য। এতৎ ব্যতীত ইহাতে আরও রহস্য আছে—প্রত্যেক বস্তু বা পদার্থই সীমাবদ্ধ, কেননা প্রত্যেক নাম-রূপাত্মক্ বস্তুর চারিদিকে বেষ্টিত একটা সীমা-রেখা আছে, ঐ সীমা-রেখাই প্রত্যেক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; এইরূপে অখণ্ড দেশ-প্রকৃতি অনন্ত দেশে ও অণুদেশে বিভক্ত হইয়াছেন—এইভাবে প্রত্যেক বস্তু এবং পদার্থই সসীম বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে—এইপ্রকার নিয়মে অখণ্ড কালও মন্বন্তর, যুগ বৎসর অয়ন, মাস, পক্ষ, বার, দিন দণ্ড পল মুহূর্ত্ত প্রভৃতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম বিভাগে বিভক্ত হইয়া, পরিচ্ছিন্ন কাল-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন—সাধকগণের উন্নত অবস্থায় এই দেশ-কালের অনন্ত অসীম পরিচ্ছিন্ন ভাব সমূহ বিলুপ্ত হয়, কেননা তাহারা তখন অনুভব করেন—সেই অব্যক্ত ও অসীম প্রকৃতি বা মহাশক্তিই অনন্ত সসীমরূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। আর কালের পরিচ্ছিন্ন ভাব সমূহও তাহাদের নিকটে অকাল-মূর্ত্তি মহাকালে বা মহাকালীতে লয় হইয়া যায়! —এইরূপে সাধক দেশাতীত ভাবে বিদেহ মুক্তি এবং কালাতীতরূপে সর্ব্বকারণের কারণরূপিণী মহাকালীর ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত হইয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সেনানুকারিগণ—[সেনাকে অনু বা পশ্চাতে রাখিয়া যাহারা গমন করেন অর্থাৎ অগ্রগামী]—যাঁহারা দ্রুত গতিতে মায়ের দিকে অগ্রসর হন, মা তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আসুরিক ভাব বিলয় করিয়া, তাঁহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিদানন্দে পূর্ণ করত মুক্তি প্রদান করেন—ইহাই তাৎপর্য্য। অগ্রগামীগণ শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, ইঁহাতে আরও রহস্য আছে—সংঘবদ্ধ শক্তি বা ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রগামী হইলে অর্থাৎ খণ্ডিত ভাব বা শক্তি গ্রহণ করিলে, পরাজয় বা বিনাশ নিশ্চিত ; এজন্য নীতিশাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন—"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ"। কোন কোন চণ্ডীতে "শ্যেনাণুকারিণঃ" এরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, উহার ভাবটীও উপরোক্ত ব্যাখ্যার সহিত সমন্বয় পূর্ণ যথা—'শ্যেন' অর্থ—(১) পক্ষী (২) সেধা বা সজারু ; শ্যেন পক্ষী অতি দ্রুতগামী, তাহাদিগকে যাহারা অনুকরণ করে তাহারই 'শ্যেনানুকারী' অর্থাৎ মাতৃমুখী দ্রুতগামী সাধকগণ। আর সজারুর শরীরের প্রতি লোমকূপ স্বভাবতঃই যেন শরদ্বারা বিদ্ধ থাকে ; এই প্রকার অনুকরণ করিয়া, যাহারা শর-যুদ্ধ করেন, তাঁহারাও 'শ্যেনানুকারী' সাধক।

কাহারও বাহু ছিন্ন হইল—বিষয়ের আদান-প্রদান-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া সাধক স্থিরতা লাভ করিলেন ; কিম্বা প্রত্যাহার সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। কাহারও গ্রীবা ছিন্ন হইল—জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিলেন। কাহারও শির ভূমিতে লুণ্ঠিত হইল—শরণাগত সাধক ক্রমেই মাতৃলীলা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইতেছেন ; এইরূপে বসুন্ধরারূপিণী প্রকৃতিকেও বিশ্বজননী বলিয়া উপলব্ধি করায় প্রেমানন্দে তাঁহার মস্তক ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইল, ইহাই তাৎপর্য্য। দেহ-মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইল—দেহ-মধ্যই শরীরকে বিশেষরূপে ধারণ করে ; এজন্য বজ্রধারী ইন্দ্রের তেজে মায়ের দেহ-মধ্য গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং দেহ-মধ্য বিদীর্ণ হওয়ায়, সর্ব্ববিধ আসুরিক ভাবের ধারণ-শক্তি

ও জীবনী-শক্তি বিনষ্ট হইল। কাহারও জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হইল—বিভিন্নমুখী গতি-শক্তি সমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইল, কিম্বা সাধকের 'আসন' সিদ্ধি হইল, তখন তিনি স্থূলদেহটীকে অসার করিয়া, ক্রমে মনোলয় পূর্ব্বক প্রজ্ঞা-ক্ষেত্রে অবস্থান করত এক রস আনন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাহার চঞ্চল গতি সমূহ নিষ্ক্রিয় হইল—ইহাই মন্ত্রোক্ত ভূতলে পতন। এক বাহু নষ্ট হইল—বাহুতে কর্ম্ম-শক্তি বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, কেননা বাহুই কর্ম্ম সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্র বা সহায়ক, আর কর্ম্মও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই প্রকার। একবাহু নষ্ট হইল—ইহা দ্বারা সাধকের সকাম কর্ম্ম চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া, তিনি নিষ্কাম ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এক চক্ষু নষ্ট হইল—সাধকের একদেশ-দর্শিতা নষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র উদার দৃষ্টি প্রসারিত হইল। এক চরণ বিনষ্ট হইল—সাধকের ভোগাসক্তিময় প্রগতি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া আত্মাভিমুখী বা ভগবৎ অভিমুখী গতি নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইল—ইহাই মন্ত্রোক্তিসমূহের তাৎপর্য্য।—(৫৯-৬১)

> ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ ॥৬২
> কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
> ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্য্যলয়াশ্রিতাঃ ॥৬৩
> কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
> তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥৬৪

সভ্য বিবরণ।—কেহ কেহ মস্তক ছিন্ন হওয়ায় ভূপাতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইল॥ সেই যুদ্ধে কবন্ধগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; কোন কোন কবন্ধ রণবাদ্যের তাল-লয়াদি আশ্রয় পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিল॥ ছিন্ন মস্তক কবন্ধগণ হস্তে খড়্গ, শক্তি এবং ঋষ্টি নামক অস্ত্র গ্রহণ করিয়া এবং অন্যান্য মহাসুরগণ দেবীকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিতে বলিতে যুদ্ধ করিয়াছিল।—(৬২-৬৪)

তত্ত্ব-সুধা।— ঋষ্টি—উভয় পার্শ্বে ধারযুক্ত খড়্গ—দেবী হস্তে উহা—পূর্ণজ্ঞান এবং অসুর হস্তে উহা—পূর্ণ অজ্ঞানের প্রতীক।

[কবন্ধ—মহাভারতের মতে, সংগ্রামে সহস্র মনুষ্যের মস্তক ছিন্ন হইলে একটী 'কবন্ধ' উৎপন্ন হয়। মতান্তরে—অযুত হস্তী, নিযুত অশ্ব, একশত পঞ্চাশ রথ এবং দশ কোটি পদাতিক নিহত হইলে, একটী কবন্ধ উৎপন্ন হয়।] প্রত্যেক কার্য্যেরই সমভাবাপন্ন এবং সমবল 'প্রতিক্রিয়া' আছে, আকাশের দিকে ঢিল ছুড়িলে, উহা পুনরায় নিজের দিকেই ফিরিয়া আসে; জলে সবেগে ঢিল মারিলে, জল ছিটিয়া গায়ে লাগে—এই প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞান সম্মত সত্য। সুতরাং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাপকভাবে হত্যা ব্যাপার সংসাধিত হয়, সেখানে উহার প্রতিক্রিয়াময় 'কবন্ধের' উৎপত্তি এবং তালমানলয়ে নৃত্য-ভঙ্গিমা স্বাভাবিক। বিগত জার্ম্মান-যুদ্ধেও রণ-ক্ষেত্রে রণরঙ্গিণী কালিকা-শক্তির আবির্ভাব কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। যেখানে সংযমের বিশেষ ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান, সেখানে প্রতিক্রিয়ারূপ কবন্ধের অত্যাচারও স্বাভাবিক; সাধক মাত্রই এই কবন্ধের উৎপাত কিছু না কিছু অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকেন। আর যেখানে সংযমের অতিরিক্ত বা অত্যধিক ব্যবস্থা এবং ঐকান্তিক কঠোরতা, সেখানে সংঘবদ্ধ প্রতিক্রিয়া সমূহ শক্তিশালী কবন্ধরূপে পরিণত হইয়া সাধকের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকে এবং উপযুক্ত দেশ কাল পাত্রের যোগাযোগ হইলেই সেখানে সাধকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া তাহাকে পাতিত করে—এই কবন্ধের অত্যাচারের হাত হইতে মুনি-ঋষিগণও অব্যাহতি পান নাই! আর দুর্ব্বল কলির জীবেরতো কথাই নাই। কঠোর তপস্যা বা সংযমের অতিরিক্ত ব্যবহারকে ভগবান গীতায় অসুর তুল্য বলিয়াছেন, যথা—"যাহারা শরীরস্থ ভূত সমূহকে কৃশ করিয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর মধ্যস্থ আমাকেও কৃশ করে; বিবেকবর্জ্জিত ঐ সকল তপস্যাকারীকে অসুর বলিয়া জানিবে।" সুতরাং শুধু সংযমনের অস্ত্রাঘাতে অসুর দলন করিলে চলিবেনা; সংযমকেও প্রাণময়

ও জ্ঞানময় করিয়া তুলিতে হইবে এবং তৎসম্পর্কিত বিষয় সমূহকে শক্তিময় ও মাতৃময় বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহকেও নাম জপ, রূপ-ধ্যান, স্তব-স্তুতি এবং ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতিদ্বারা সাত্ত্বিক আনন্দে মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলেই কবন্ধের অত্যাচার হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া যাইবে—তখন মা স্বয়ং আসুরিক প্রতিক্রিয়া-ভাব-সমষ্টিরূপ কবন্ধকে চিরতরে উপশমিত করিয়া সাধকের প্রাণে নন্দনের চিরশান্তিময় প্রেম-ধারা বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্য করিবেন।

সংযমীর চিত্ত-ক্ষেত্রেও কোন সময়ে অসংযমের ভাব প্রকট্ হইয়া তাণ্ডব নৃত্যে তাহার মনপ্রাণ উদ্বেলিত করিতে থাকে!—ইহাই মন্ত্রোক্ত ছিন্ন-শির অসুরের কবন্ধরূপে পুনরুত্থান, তাণ্ডব নৃত্য এবং অস্ত্রাদিসহ যুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আসুরিক ভাবসমূহ বাহ্য-কঠোরতায় নির্জীব বা সুপ্ত থাকিলেও, উহারা বীজাংশে জীবিত থাকে এবং মানবের প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী যথা সময়ে প্রকট্ হইয়া ক্রিয়াশীল হয়—ইহাও কবন্ধের অত্যাচার; রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যও এই কবন্ধের উৎপাতে অতিদুঃখিত হইয়াছিলেন। সাধকগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিতে সক্ষম হইলেও, প্রাক্তন-কর্ম্মবশে কাহারও কাহারও কবন্ধের অত্যাচার ভোগ করিতে হয়—এজন্য ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—যাহারা "নিরাহার দেহী" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত আত্ম-নিরোধ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাহাদের ভোগাসক্তি একেবারে দূর হয় না, উহা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে মাত্র; কিন্তু "পরংদৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ মহাশক্তিময়ী মা বা পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করিতে পারিলে, উহারা চিরকালের জন্য নিবৃত্ত ও শান্ত হয়। অসুরগণের মধ্যে কেহ দেবীকে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ'—থাক্ থাক্ উক্তি করিয়াছিল—ইহা পরাজিতের অন্তঃসারশূন্য আস্ফালন বা গর্ব্বোক্তি! জাগতিক নিয়মে কার্য্যতঃ কেহ

পরাজিত হইলেও, মুখে পরাজয় স্বীকার করেনা বরং সে ভবিষ্যতে 'প্রতিশোধ ভালরূপেই লইবে,' এবম্বিধ প্রলাপোক্তিই করিয়া থাকে— (৬২—৬৪)

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈ রসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাঽভবৎ তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ ৬৫
শোনিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্॥৬৬

সত্য বিবরণ।—যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তথায় [দেবী কর্ত্তৃক] নিপাতিত রথ গজ ও অশ্বগণে এবং অসুর-দেহে পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, বসুন্ধরা অগম্যা হইয়াছিল॥ সেই রণ-ক্ষেত্রে অসুরসৈন্যমধ্যে অসুর, হস্তী এবং অশ্ব সমূহের রক্ত-প্রবাহ, মহানদীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ প্রবাহিত হইল।—(৬৫।৬৬)

তত্ত্ব-সুধা।—মানব-দেহরূপ বসুন্ধরাতেইসপ্ত-পদ্ম বা চক্র, জ্ঞানের সপ্তভূমিকা, যোগৈশ্বর্য্য সমূহ এবং ভক্তের সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান সাধকের দেহরূপ কুরু-ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ মহোৎসব সম্পন্ন হইতে লাগিল ; সেখানে আসুরিক বৃত্তি সমূহ কতক বিলয় বা বিনষ্ট হইল, কতক অর্দ্ধনষ্ট হইয়া সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইল, আর কতকগুলি বীজাংশে অবস্থিত হইল ; সুতরাং সাধকের দেহ-পুর শ্মশান-ক্ষেত্রের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল—ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ নিরোধ হওয়ায় এবং আসুরিক ভাব সমূহ জড়ত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, সাধকের দেহটী বাহ্য দৃষ্টিতে অচঞ্চল ও স্থির হইয়া রহিল ; অর্থাৎ সাধকের দেহ-রথ, ভোগাসক্তিময় মদরূপী গজ এবং ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বসমূহ এবং অন্যান্য আসুরিক বল সমস্তই পতিত বা জড়বৎ নিষ্ক্রিয় হইল—ইহাই মন্ত্রোক্ত বসুন্ধরার অগম্য ভাব।

সাধকের তেজতত্ত্বময় মণিপুর-ক্ষেত্রে আসুরিক রজোগুণময় বৃত্তি বা শক্তিসমূহ এবং তদ্দ্বারা উদ্বেলিত ভোগাসক্তির ঘনীভূত অবস্থারূপ

গজাসুর সমূহ মাতৃ কৃপাদ্বারা দেবভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, সাধকের দেহস্থ স্থূল রজোগুণময় শোনিত এবং সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ রজোগুণ তেজতত্ত্বে উদ্দীপিত হইয়া রক্তবর্ণে রঞ্জিত প্রেমানুরাগরূপে অভিব্যক্ত হইল—সাধকের দেহে পুলকাদি আনন্দের উদ্বেলন প্রকাশ পাইতে লাগিল। অশ্বরূপী ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ ও সংযমিত হওয়ায়, প্রশান্তির সুস্নিগ্ধ হিল্লোল যেন প্রবাহিত হইতে লাগিল! এইরূপে সাধকের বিশুদ্ধ চিত্ত-ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ রজোগুণময় দিব্যভাব সমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস মহানদীরূপে কিম্বা মন্দাকিনীর পুত ধারার মত প্রবাহিত হইয়া সাধককে যেন অকুলে ভাসাইয়া লইয়া চলিল! —সেই প্রেমানন্দ ধারা পান করিয়া এবং অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া, সাধক পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন এবং অমায়াদি পুষ্পদ্বারা মাতৃ-চরণে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত, রক্ত-প্রবাহের মহানদী। ভগবতীর চণ্ডী-লীলাতে—বিশুদ্ধ রজোগুণের চৈতন্যময় এবং আনন্দময় উদ্বেলনযুক্ত শোণিত-প্রবাহের মহানদীর সহিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দময় দোল-লীলার অতি সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে! দোললীলাতে—প্রেমানুরাগরূপ ফাগ্ (আবির) কুম্‌কুম প্রভৃতির অপূর্ব্ব প্রেম-বিলাস এবং বিচিত্র রঙ্-এর খেলাই, দেবী-মাহাত্ম্যে ভগবতীর যুদ্ধ-মহোৎসব লীলাতে বিশুদ্ধ রজোগুণময় বিচিত্র প্রেমতরঙ্গ সমন্বিত মহানদীরূপে অভিব্যক্ত !!—(৬৫।৬৬)

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরানাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্॥ ৬।

সত্য বিবরণ—অগ্নি যেমন সুবৃহৎ তৃণ-কাষ্ঠের সুবৃহৎ স্তূপ ক্ষণমাত্রেই ক্ষয় করে, সেইরূপ অম্বিকা ক্ষণকাল মধ্যেই অসুরগণের মহাসৈন্য ক্ষয় করিলেন।—(৬৭)

তত্ত্ব-সুধা।—সূর্য্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিদুরিত হয়,

দাবানলের প্রকাশে যেমন গভীর অন্ধকারময় অরণ্যও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ, যে হৃদয়ে জ্ঞানময়ী মহাশক্তি জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে আবির্ভূ তা,সেখানে আসুরী ভাবসমূহের বিলোপ সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। অগ্নিরূপ তেজস্বিতাই সাধকের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং মাতৃকৃপায় জ্ঞানলাভ হইলে, অসৎভাবরূপ অসুর সমূহের উদ্বেলন চিরতরে উপশমিত হয়; তাই গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি, সমুদয় কর্ম্মরাশি ভস্মীভূত করে। ঋক্‌বেদীয়. অগ্নির উপাসকগণ প্রার্থনা করিতেন··"হে অগ্নি! আমাদিগকে স্বর্গধামে বহন কর" অর্থাৎ আমাদের মধ্যে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে দেবরূপে পরিণত কর। অগ্নি-নিজে যেমন স্থূল জলকে বাষ্প করিয়া আকাশে উঠায়, সেইরূপ তেজস্বিতাই মানুষের মনকে ক্রমে উর্দ্ধগামী করে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমূহেও অগ্নি-যজ্ঞাদি দ্বারা তেজময় দেবগণের আশীর্ব্বাদ আনয়ন করা হয়। রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী পূর্ণত্বই মানুষকে মহাতেজস্বীরূপে পরিণত ও প্রতিভাত করে!—সেই প্রদীপ্ত অবস্থায় অজ্ঞান-তমসার ক্রিয়াশীলতা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হয়—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

এই মন্ত্রে সাধকগণের প্রতি আশ্বাস-বাণীও নিহিত আছে। যাঁহারা ভগবৎ চরণে শরণাগত কিম্বা সদ্‌গুরুর আশ্রিত, তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ পাপ-পুণ্যময় কর্ম্মরাশি কাষ্ঠ-স্তূপের ন্যায়, বিষয়-রসে ক্রমাগত অভিষিক্ত থাকায়, ঐ কাষ্ঠ সমূহের কতক ভিজা বা আর্দ্র থাকে; এজন্য ভগবান বা সদ্‌গুরু ঐ পুঞ্জীকৃত কর্ম্মময় কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্বলিয়া উঠে না, বরং ধূম্ররাশি উদ্গিরণ করিয়া প্রথম অবস্থায় জ্বালা বা দুঃখ প্রদান করে, কিন্তু ক্রমাগত ইন্ধনযুক্ত থাকায় ক্রমে বিষয়-রস ভগবৎতেজে শুকাইয়া থাকে; অতঃপর যে মুহূর্ত্তে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত স্তূপ ভস্মীভূত করিয়া ফেলে।

সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মী, বা ভক্ত সদ্‌গুরুর আশ্রিত সাধকগণের প্রাথমিক অবস্থায় তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দৃষ্ট না হইলেও, নিরাশ হইলে চলিবে না, ধুম্রজালের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াই অগ্নিময়ী তেজস্বিতাকে দীপ্ত রাখিতে হইবে—কালপূর্ণ হওয়া মাত্রই সাধকের কর্ম্মরাশি ক্ষয় হইয়া পরমানন্দ লাভ সুনিশ্চিত —(৬৭)

স চ সিংহো মহানাদমুৎস্থজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৮

সভ্য-বিবরণ।—সেই সিংহও কেশর কম্পিত করিয়া মহাশব্দ করিতে করিতে অসুরগণের শরীর হইতে প্রাণসমূহ যেন, চয়ন করিলেন, এইরূপে ক্ষণকালমধ্যে অসুর-সৈন্য নাশ করিলেন।—(৬৮)

তত্ত্ব-সুধা। মাতৃ-পদ-মকরন্দ পানে বিভোর সাধকের ধর্ম্মভাবরূপী সিংহ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, 'মহানাদ' উত্থাপন করিলেন—ইহাই বিভিন্ন নাদের সমন্বয়যুক্ত প্রণবধ্বনি—আবার ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর-কমলধৃত বংশী-ধ্বনি! সপ্তসুর সমন্বিত ভগবানের বংশী, সম্মোহিনী, আনন্দিনী (আহ্লাদিনী) এবং আকর্ষিণী এই ত্রিবিধরূপে ধ্বনিত হইয়া ভক্ত গোপিগণের হৃদয়ে ত্রিবিধ প্রাণময় ভাবের অভিব্যক্তি করিত। ধুতকেশর—সিংহ জ্ঞানময় জটাসমূহ উদ্দীপ্ত করিলেন, এবিষয়ে পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে।

সাধকের ধর্ম্মভাব সমষ্টিরূপী সিংহ মাতৃ-চরণ সংস্পর্শে সর্ব্বপ্রকারে প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন; তাই তিনি আজ অসুরগণের মধ্যেও প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন! অর্থাৎ আসুরিক শক্তি সমূহও যে মাতৃময়, তাহা প্রাণে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন—তাই তিনি আসুরিক শক্তিনয় প্রাণ-পুষ্পগুলি একটী একটী করিয়া চয়ন পূর্ব্বক মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যেন ধন্য হইলেন! এইরূপে সাধকের ধর্ম্মভাব প্রাণময় ও জ্ঞানময় হওয়ায়, তিনি সাক্ষীভাবে অবস্থিত হইলেন—

তাঁহার আত্মময় জ্ঞান-দৃষ্টি বিশ্বময় প্রসারিত হইল! তখন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন—সৎ অসৎ জ্ঞান-অজ্ঞান ভাল-মন্দ সমস্তই ব্রহ্মময় ও মাতৃময়! বৈরাগ্যের শাসনে যাহা পূর্ব্বে বন্ধনের কারণবোধে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও আজ তাঁহার নিকটে শক্তিময়, আত্মময় এবং জগন্ময় বলিয়া প্রতিভাত হইল! সাধকের এইপ্রকার উন্নত অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করেন—জগত ও ভগবান দুইই এক এবং অভেদ; আর বাহ্যজগতের কোন বস্তুর সহিতই ভগবৎ সাধনার বা ভগবৎ ভাবের কোন বিরোধ নাই।

এইরূপে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধক, একদিকে অভেদভাবে দেখেন, বিশ্বরূপী ভগবানকে জগন্ময়রূপে—মহাশক্তিরূপিণী ভগবতীকে জগন্ময়ী নিত্যা জগন্মূর্ত্তিরূপে! ক্রমে অনুভব করেন—জীব-জগত চর-অচর সমস্তই সেই অভেদের ভেদ-মূর্ত্তি, অসীমের সসীমরূপে অভিব্যক্তি! সাধক-ভক্ত আস্বাদন করেন যে, ভগবান যেমন একদিকে বিরাটরূপে অভেদভাবে অবস্থিত, তিনিই আবার নিত্যলোকে, গোলকে, ব্রহ্মলোকে এবং শিবলোকাদিতেও ভেদভাবে নিত্য লীলাপরায়ণ!!—এইরূপে জীব-জগত লীলাদিতে এবং অণু-পরমাণুতেও ভেদভাবে তাঁরারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি!!

সৌভাগ্যবশে এইপ্রকার জ্ঞানময় সাম্য অবস্থা যখন লাভ হয়, তখন জ্ঞানীর ইহা নয়—ইহা নয় এরূপ 'নেতি-নেতি' বিচার দ্বারা ত্যাগের বিষয় সকলও আত্মময় ব্রহ্মতত্ত্বে বা ভগবানে পর্য্যবসিত হয়; তাই পরমহংসদেব বলিতেন—"প্রথমে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া করিয়া ছাদে উঠিতে হয়, কিন্তু ছাদে উঠিলে দেখা যায়—সব একাকার. কেবল ইট্ চূণ আর সুরকি!" অর্থাৎ মোহান্ধ নয়নে সমস্ত বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও জ্ঞান-দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্মময় শক্তিময় ও সচ্চিদানন্দময়। —ইহাই প্রকৃত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। অভিজ্ঞ পুরোহিত প্রাণময় ভাব বা

মন্ত্রদ্বারা মৃন্ময়ী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, মা চিন্ময়ী হইয়া ভক্তের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন! ইহা আধুনিক সভ্যতার যুগে বিশ্বাসযোগ্য বা বোধগম্য না হইলেও প্রাচীন কালে, ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক সত্যময় ঘটনারূপে পরিগণিত হইত।

এখানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক তুইটি **সত্য কাহিনী** উল্লেখ করিব। (১) প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার একটি জমিদার বাটিতে শারদীয়া তুর্গা মাতার পূজা হইতেছিল। জনৈক বিশিষ্ট তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ যথাযোগ্য ভাবে মায়ের পূজা করিতেছিলেন; পূজার দিবসত্রয় মধ্যে একদিন বাড়ীর কর্ত্তা [জমিদার] স্বয়ং আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তুমি যে পূজা করিতেছ তাহা মা গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিরূপে বুঝিব? —আর মায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সত্যসত্যই হইয়াছে কিনা আমি দেখিতে চাই।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মায়ের প্রকৃতই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং মা সত্যসত্যই পূজাতে প্রীত হইয়াছেন। কিরূপে আমি আপনাকে তাহা দেখাইব? তবে দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আপনার এবং এই বাটির সমূহ অমঙ্গল হইবে।" জমিদার-বাবু কিছুতেই শুনিলেন না, তিনি জেদ করিলেন যে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরিচয় অবশ্যই দিতে হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া একটি ধারাল ছুরি আনিবার আদেশ দিলেন—ছুরি আনা হইল, তথনও জমিদার পূজারীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ শুনিলেন না। অতঃপর ব্রাহ্মণ ছুরিদ্বারা মায়ের দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ চিড়িয়া দিলেন!—তৎক্ষণাৎ মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল। —রক্তস্রোত বন্ধ করার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাই বিফল হইল। তৎপর পূজা-মণ্ডপ মাতৃ-রক্তে প্লাবিত হইয়া রক্তস্রোত অঙ্গনে প্রবাহিত হইল!! এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া উপস্থিত সকলেই ভীতিবিহ্বল ও স্তম্ভিত হইয়া

৮

গেল। বলা বাহুল্য সেই বৎসরেই জমিদার বাটীতে এমন সব ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সেই জমিদার বাটীতে মায়ের পূজা চিরতরে বিলুপ্ত হইল।

(২) প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে আমি ৺বাসন্তী দুর্গা-পূজা উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া মেদিনীপুর জেলাস্থ মুগবেড়িয়ার স্বনামধন্য ব্রাহ্মণ-জমিদার স্বর্গীয় গঙ্গাধর নন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে যাই এবং মদীয় শিষ্য শ্রীশৈলজাচরণ নন্দের ওখানে অবস্থান করি। ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্নে পূজা-মণ্ডপে যাইয়া দেখিলাম—মায়ের মূর্ত্তি এবং সাজ-সজ্জা সবই সুন্দর, কিন্তু মা 'অবনত মুখী' অর্থাৎ মাটীর দিকে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। দেব-দেবীর সোজাসুজি 'চাওয়া মূর্ত্তি' দেখিতে আমার খুব ভাল লাগে—বাল্যকালাবধি ইহা আমার স্বভাব, তাই বাড়ী ফিরিয়া শৈলজা বাবুর মেয়ে শান্তিমাকে বলিলাম—"মায়ের প্রতিমা ভালই হয়েছে, তবে মাটীর পানে যেন মা চে'য়ে রয়েছেন, তাই আমার ভাল লাগিল না।" তখন শান্তি মা রহস্য করিয়া বলিলেন—"বাবা, কেন দুর্গা মা মাটীর দিকে চে'য়ে রয়েছেন জানেন কি?" আমি বলিলাম—"না" তিনি বলিলেন,—"আমার বাবা এবং কাকাবাবুর সহিত যেরূপ ঘোরতর মোকদ্দমা চল্ছে, তাতে মা মাটীর দিকে চে'য়ে বসুন্ধরাকে বলছেন— "বসুন্ধরে! তুমি দ্বিখণ্ডিতা হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করব—এ বাটিতে আর আসব না।" আমি শুনে হেসে উঠ্‌লেম। সন্ধ্যায় নাট-মন্দিরে নানাপ্রকার বাজনা বেজে উঠিল এবং মন্দিরে যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি চলিতে লাগিল। এদিকে তেতালার বারান্দায় বসিয়া আমি দুর্গামায়ের আগমনী ও উদ্বোধনী সঙ্গীতাদি ভাবাবেশে গান করিয়া খুব আনন্দ পাইলাম। পরদিন নিষ্ঠার সহিত সপ্তমী বিহিত পূজা প্রভৃতি শেষ হইল; আমি আহারাদির পূর্ব্বে দুর্গা মাতাকে একবার দর্শন করিবার জন্য নাট-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি দেখিলাম—মা যেন আমার দিকে সোজাসুজি চে'য়ে রয়েছেন!

আরও এগিয়ে গেলেম, তথাপি সেই সোজা চাহনী দেখে মন-প্রাণ পুলকিত হইল। তখন আমার মনে এই সন্দেহ আসিল যে,—'গতকল্য যে মূর্ত্তি দেখেছি তাহা কি তবে ভুল?' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রতিমার দিকে চে'য়ে দেখি—পূর্ব্বদিনের মত মা মাটির দিকেই চে'য়ে রয়েছেন। আমার সন্দেহ উদয়ের জন্যই এইরূপ হইল, ইহা ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলাম এবং অত্যন্ত দুঃখানুভব করিতে লাগিলাম; কিছুক্ষণ মায়ের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। তৎপর আবার মায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—মা আমার দিকেই পূর্ব্ববৎ চে'য়ে রয়েছেন! এইরূপে অষ্টমী পুজার দিনও মাতৃ-সন্দর্শনে যাইয়া মায়ের 'চাওয়া মূর্ত্তি' দেখিয়া একেবারে মন্ত্র-মুগ্ধের মত কি যেন হইয়া গেলাম। অষ্টমীর দিন বৈকালে পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত পাল্কী সহযোগে ইক্ষুপত্রিকা নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত দীননাথ নন্দ মহাশয়ের বাটীতে যাওয়ার কথা ছিল। যাত্রাকালে মায়ের নিকট বিদায় লইবার জন্য নাট্‌-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম—মায়ের দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টির অপুর্ব্ব মিলন হইল। —আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। ইক্ষুপত্রিকা গ্রামে পৌছিয়াও মায়ের সেই চাহনি ভুলিতে পারিলাম না। সঙ্গীতাদির পর অশ্রু পুলক ও জ্যোতিঃ দর্শনাদি দ্বারা পরমানন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইল!!—ইহাও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ধর্ম্মরূপী সিংহের উচ্চনাদ উত্থাপন এবং প্রাণ-চয়ন বা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপার সম্পর্কে আমার একটি তত্ত্বমূলক অনুভূতি এখানে সর্ব্বশ্রেণীর সাধক-ভক্তগণের কল্যাণার্থে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। প্রাচীন ঋষিগণ কথিত শাস্ত্র বেদ-বেদান্ত সম্মত সনাতন-ধর্ম্মের বীজ মন্ত্রগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক বীজের সহিত ং [অনুস্বার] বা ঁ [চন্দ্রবিন্দু] যুক্ত রহিয়াছে; এইপ্রকার অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু বাদ রাখিয়া, প্রত্যেক মূল বীজের পূর্ব্বাংশ বিচার

করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক্ মিলনের ভাব বিদ্যমান; আবার মূলবীজের পরবর্ত্তী অংশ—অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুতেও 'অনু' বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক্ ভাবই বিদ্যমান—কেননা অনুস্বারে •=বিন্দুরূপী চৈতন্যময় পুরুষ বা পরমেশ্বর; আর অনুস্বারের হসন্তের ন্যায় অবশিষ্টাংশ ◌্=নাদময়ী বা নাদরূপা প্রকৃতি বা মহাশক্তিরূপিণী পার্ব্বতী। এইরূপ একই ভাবাপন্ন ঁ [চন্দ্রবিন্দুর] •=বিন্দুরূপী চৈতন্যময় পুরুষ এবং চন্দ্রবিন্দুর অবশিষ্টাংশ ◡ =নাদরূপা অর্দ্ধমাত্রা অনুচ্চার্য্যা প্রকৃতি! সুতরাং একই মহাবীজে একাধারে এই প্রকার 'দ্বিত্ব' ভাবের অভিব্যক্তি হওয়ার প্রকৃত রহস্য বা কারণ কি? এানে একটী মহাবীজ মন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট ও সরল হইবে। মহাশক্তির বীজমন্ত্র—হ্রীং বা হ্রীঁ; এই মহাবীজটী বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব যথা—হ্রীং=হ+ী [দীর্ঘ ঈকার] + [রফলা]+ং বা ঁ অর্থাৎ হ=আদি পুরুষ পরমেশ্বর; ী=মহাশক্তিরূপা পার্ব্বতী; ্র [রফলা]=পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মিলন বা রমণ [মিলন জনিত আনন্দ]; সুতরাং মহাবীজের এই পর্য্যন্ত বিচার বা বিশ্লেষণ করিলেও যুগলাত্মক্ ভাবই নিষ্পন্ন হয়; অতএব উহাতে পুনরায় যুগলাত্মক্ মিলন ভাবাপন্ন ং[অনুস্বার] বা ঁ[চন্দ্রবিন্দু] যোগ করার রহস্য বা সার্থকতা কি?—এ বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্বময় রহস্য বা সত্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য প্রাণে ঐকান্তিক ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা উদিত হইলেও, প্রথমে কোন সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। তৎপর মেদিনীপুর জেলাস্থ কাঁথি-শান্তি-আশ্রমে মৎ প্রতিষ্ঠিত ৺সোমনাথ মহাদেব এবং সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শিবরাত্রির পূণ্যময়ী রজনীতে আত্মারূপী সোমনাথ এবং ভাবিনী-সর্ব্বমঙ্গলা মায়ের অভাবনীয় কৃপাতে এই মহাবীজ-রহস্য আমার হৃদয়-কন্দরে উদ্ভাসিত হইয়া আমাকে আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া দেয়। তখন মহাবীজের সহিত অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হওয়ার কারণ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া পুলকিত হই!

এক্ষণে সেই অনুভূত তত্ত্ব ও রহস্যটী মোটামুটী ভাষায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

পরমাত্মা বা ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"সর্ব্বত্র সমদর্শন সমাহিত চিত্ত [ব্রহ্মদর্শী] ব্যক্তি, আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূত মধ্যে আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন"। ভগবান পুনরায় বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আমার মধ্যে সর্ব্ব [সর্ব্বভূত] এবং সর্ব্বত্র [সর্ব্বভূতের মধ্যে] আমাকে দর্শন করেন, আমি তাহার নিকট অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না"।* ভগবৎ কথিত এই অপূর্ব্ব বাণীর মধ্যে দুইটী তত্ত্বময় বিশিষ্ট সভ্যভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা—(১) অভেদাত্মক ভাব এবং (২) ভেদভাব। উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের আলোকে পরমাত্মময় ভগবানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে, আমরা প্রথমতঃ দেখিতে পাইব "সর্ব্বং চ ময়ি"—আমাতে সর্ব্বভূত, ইহা একটি বিরাট অভেদ ভাব, যথা—ভগবান মহতো-মহীয়ান্—গুরু-গরীয়ান্‌রূপে বিরাট্‌ভাবে অবস্থিত।—অর্থাৎ তিনি অতি বড়—তাঁর চেয়ে গুরু, শ্রেষ্ঠ বা বড় আর কেহই বা কিছুই নাই! একটি পুকুরের জলে যেমন নানা প্রকার জীবজন্তু ও মৎসাদি অবস্থান করে বা অবগাহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মারূপী ভগবানের সত্যময় বিরাট্ সত্তাতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডসহ সমস্ত জীব-জগত এবং সর্ব্বভূতাদি অবগাহিত বা ডুবিয়া রহিয়াছে! —ইহাই শ্রীভগবানের "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপ অভেদাত্মক মহতোমহীয়ান্ বা গুরুগরীয়ান্ মহাভাব। পক্ষান্তরে ভগবানের অনন্ত ভেদভাব যুক্ত দ্বিতীয় ভাবটি বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব—[যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র] উহা অণোরণীয়ান্‌রূপী অনন্ত ভেদভাব! অর্থাৎ ভগবান অণু এবং অণীয়ান্‌রূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অণু-পরমাণুতেও সতত বিদ্যমান! অংশ বা কলা-বিকলা

* গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়, ২৯।৩০ শ্লোক।

রূপে নয়, সেখানেও পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসহ সতত বিরাজ করিতেছেন! তাই গর্ব্বিত হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে কোন ক্রমেই হত্যা করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোর হরি কোথায় থাকে"? প্রকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—"তোমার হরি, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে বিরাজ করিয়া থাকেন"। তখন দৈত্যরাজ বলিলেন—"এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যেও কি তোর হরি আছে"? ভক্ত প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন "হাঁ"।—তবে দেখ তোর হরিকে আমি কিরূপে বিনাশ করি"! এই বলিয়া হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে সেই স্ফটিক স্তম্ভ চূর্ণ করা মাত্রই বিষ্ণুরূপী সর্ব্বব্যাপী নরসিংহদেব, সেই ভগ্ন স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করত পুনরায় ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন !! এই সত্য পৌরাণিক ঘটনাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান "অণোরণীয়ান্" রূপেও সর্ব্ব ভূতে সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন।

পরমাত্মময় ভগবান একদিকে যেমন অভেদ ভাবে মহতোমহীয়ান্ বা গুরুগদীয়ান্‌রূপে বিরাট মূর্ত্তিতে বিদ্যমান, অপরদিকে তিনি অণোরণীয়ান্‌রূপেও অনন্ত ভেদভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন!—একাধারে একই সময়ে ভগবানের এইরূপে ভেদ এবং অভেদ ভাবে অবস্থিতি, কোন প্রকার মানবীর চিন্তাধারা দ্বারা ধারণা করা যায় না—উহা মনবুদ্ধির অগোচর, তাই শাস্ত্রকার ভগবানের এই ভেদাভেদ ভাব বা তত্ত্বকে ""অচিন্ত্য"বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও এই "অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব"কে জ্ঞানী বা ভক্তগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, তথাপি মৎকথিত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাও কল্পিত নহে—উহা সাধু-মহাত্মাগণ কথিত এবং শাস্ত্র সম্মতও বটে।

এক্ষণে গীতাতে ভগবৎ কথিত উপরোক্ত ভেদভাব এবং অভেদ

ভাবের সহিত মহাবীজ মন্ত্রাদির সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে হ্রীং বা হ্রীঁ মহাবীজ মন্ত্রটী বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইয়াছে; ঐ বিশ্লেষণের ং [অনুস্বার] এবং ঁ [চন্দ্রবিন্দু] ছাড়া মহাবীজের প্রথমাংশে—অর্থাৎ "হ্রী" অংশে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক্ ব্রহ্মের মিলন জনিত অভেদ ভাব বিদ্যমান—অর্থাৎ উহা মহতোমহীয়ান্ বা গুরুগরীয়ান্‌রূপী বিরাট ভাবের প্রতীক্। আর মহাবীজের পরবর্ত্তী ং বা ঁ অংশ* প্রকৃতি-পুরুষাত্মক ব্রহ্মের "অণোরণীয়ান্"রূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরমাণুময় ভেদভাবের প্রতীক্—এইরূপে প্রত্যেক মহাবীজ মন্ত্রে একাধারে প্রকৃতি-পুরুষের যুগলাত্মক্ অভেদ বিরাট ভাব এবং তৎসহ তাহাদের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুময় ভেদ ভাব যুক্ত হইয়া প্রত্যেকটি বীজ মন্ত্রকে স্বয়ং সিদ্ধ বা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে!! ডাক্তার 'রাদার ফোর্ড' পরমাণু বিশ্লেষণ সম্পর্কে দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক পরমাণুতে একটি জ্যোতির্ম্ময় স্থির বিন্দু [০] আছে—উহার নাম "প্রোটন্"; আর একটি চঞ্চল জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু উক্ত প্রোটন্ বা স্থির বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া, একটি বৃত্ত-পথে নানা প্রকার বেগে ঘুরিতেছে!—উহাই জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুর নাদময় বিভিন্ন অভিব্যক্তি! এই চঞ্চল বিন্দুটির নাম "ইলেক্‌ট্রন্" †। এই প্রোটন্ এবং ইলেকট্রন্‌রূপী পরমাণুতেও শিব-শক্তি বা প্রকৃতি-

---

* অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দু পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শব্দের পশ্চাতে যুক্ত হইয়া নানা প্রকারে স্বরিত বা ধ্বনিত হয় এবং পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বা বৈখরী প্রভৃতি নাদের অভিব্যক্তি করে—এজন্য নাম অনুস্বার [অনু = পশ্চাৎ]। এতদ্ব্যতীত 'অনু' অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব সমূহ বর্ণদ্বারা স্বরিত বা ক্ষরিত অথবা শব্দায়িত [ধ্বনিত বা উচ্চারিত] হয় বলিয়া নাম —অনুস্বার। [স্বরন্তি ক্ষরন্তি শব্দারন্তে ইত্যর্থে স্বৃ ধাতোঃ অচ্ প্রত্যয়েন স্বরঃ। স্বর শব্দে স্বার্থে অ প্রত্যয়েন স্বারঃ জাতঃ]

† এ বিষয়ে মৎপ্রণীত 'সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন'' গ্রন্থের পরিশিষ্টে "প্রকৃতি পুরুষ ও শিবশক্তি তত্ত্বে" এবং "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য" গ্রন্থের উত্তর খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।—লেখক।

পুরুষাত্মক 'অণু'-ভাবের অতিসুন্দর অভিব্যক্তি!—স্যাদার ফোর্ড কথিত প্রোটন্ বিন্দুই অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দুর 'বিন্দু' অংশ, আর ং [অনুস্বার] এবং ँ [চন্দ্রবিন্দুর] বিন্দু ব্যতিত অপরাংশে বা নিম্নাংশেই অর্দ্ধমাত্রারূপা নাদের অভিব্যক্তি—উহাই ইলেকট্রন্। যে ভাবেই বিচার করা যাউক না কেন, সনাতন-ধর্ম্মের মহাবীজ মন্ত্রগুলি ভেদাভেদ তত্ত্বের মূর্ত্ত্য প্রতীক্!!—এই সকল পরম ভাবই মন্ত্রোক্ত 'মহানাদ' এবং প্রাণ-চয়নাদির অপূর্ব্ব রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৬৮)

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাসুরৈঃ।
যথৈষাং তুতুষুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি॥ ৬৯

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষাসুর-সৈন্য-বধো নাম দ্বিতীয় মাহাত্ম্যম্।

সত্য বিবরণ। দেবীর নিশ্বাস-জাত সেই প্রমথগণের সহিত অসুর-গণের এবম্বিধ যুদ্ধ হইয়াছিল যে, স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। —(৬৯)

তত্ত্ব-সুধা। দেবীর নিশ্বাস হইতে প্রমথসৈন্যগণ সঞ্জাত, সুতরাং তেজতত্ত্বে উপনীত তেজস্বী সাধক যখন রূপময় প্রাণ-সাধনাকে ইষ্টময় ভাবে ভাবিত করিয়া ইষ্টরূপে তন্ময়তালাভ করেন এবং ক্রমে ইষ্ট-কৃপালাভে বিশ্বময় জ্ঞান-দৃষ্টি প্রসারিত করিতে সক্ষম হন, তখন তাঁহার আসুরিক ভাব সমূহ নিষ্ক্রিয় হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহাই প্রমথগণের যুদ্ধের ফল। সাধকের এবম্বিধ অবস্থায় অনাহত পদ্মস্থিত দেবগণ এবং প্রমথগণ বিভিন্ন নাদের অভিব্যক্তি দ্বারা যেন প্রশংসাবাদ করিতে থাকেন; ঐ নাদময় শব্দ সমূহ বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হইয়া সাধকের প্রাণে বিচিত্র ভাবের অভ্যুদয় করত প্রেমানন্দ প্রদান করে—ইহাই দেবগণের পুষ্প বৃষ্টি। চণ্ডী-সাধকের কর্ত্তব্য—তাঁহার প্রত্যেকটী অসৎ ভাব বা ভগবৎ ভাবের বিরোধী বৃত্তি, ইষ্টনাম জপ এবং ইষ্টদেব-

দেবীর চিন্তারূপ প্রাণময় ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে চিন্ময় ও প্রাণময় করিয়া, চিন্ময়ী মায়ের শ্রীপাদপদ্মে উপহার প্রদান করা; ক্রমাগত এইরূপ অভ্যাস দ্বারা সাধক আসুরিক প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইবেন এবং মাতৃকৃপায় অচিরে ব্রহ্মময়ীর চিন্ময় শাশ্বত-কোলে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবেন। এখানে কুলকুণ্ডলিনী মায়ের মণিপুর পদ্মস্থ অসুর-বিলয়াদি কার্য্য শেষ হইল। মহিষাসুরের সেনাপতিগণ সমস্ত অসুর সৈন্যের বিনাশে ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকার প্রতি ধাবিত হইল [ইহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে] মা তাহাদিগকে এবং প্রমথগণকে লইয়া অনাহত-পদ্মে সম্পূর্ণ আরোহণ করিলেন, তখন মণিপুর-পদ্মটী ম্লান ও অবনত হইয়া পড়িল। এইখানে দেবী-মাহাত্ম্যের মহিষাসুর-সৈন্য-বধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হইল। —(৬৯)

[মন্ত্র সংখ্যা—৬৯; শ্লোক সংখ্যা—৬৮]

মধ্যম চরিত্র

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর বধ।

ঋষিরুবাচ ॥ ১

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্‌যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্ ॥ ২

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর মহিষাসুরের সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর, সেই মহতী সেনা নিহত হইল দেখিয়া, ক্রোধভরে যেখানে অম্বিকা রহিয়াছেন, সেইখানে যুদ্ধার্থে ধাবিত হইল। —(১। ২)

তত্ত্ব-সুধা। অহংকাররূপী মহিষাসুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুভাব সমূহ মাতৃকৃপায় বিনষ্ট হইয়াছে; অতঃপর অহংকারের প্রধান সেনাপতি বা

সহায়ক চিত্ত-চাঞ্চল্যরূপ চিক্ষুর তেজময় মণিপুর চক্র হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রাণময় অনাহত-পদ্মে আরোহণ করিল; এজন্য মন্ত্রে আছে—"যযৌ অম্বিকাম্"। মহিষাসুর পূর্ব্বেই অনাহত-চক্রে আগমন পূর্ব্বক দেবী-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল; এক্ষণে চিক্ষুরাদি বিশিষ্ট অসুরগণ প্রাণময় অনাহতে উত্থিত হইয়া দেবী-দর্শনে আরও প্রাণময় বা শক্তিশালী হইয়া উঠিল; অর্থাৎ তাহাদের শক্তিময় আসুরিক ভাব সমূহ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া যুদ্ধার্থে বা লয়ার্থে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি **মণিপুর চক্রের** সর্ব্ববিধ লয়াদি কার্য্য শেষ করিয়া, তেজময় ক্ষেত্রে যে সকল আসুরী ভাব পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে নাই, উহাদিগকে লইয়া প্রাণময় অনাহত-ক্ষেত্রে সমুত্থিত হইলেন; সেখানে ক্রমে বিশিষ্ট আসুরিকভাব সমূহ শক্তিশালী হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং মাতৃদর্শনে সম্মোহিত হইয়া মাতৃ-অঙ্গে বিলয়ের জন্য প্রধাবিত হইল।—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, অনাহত-পদ্মরূপ সূক্ষ্ম-কেন্দ্র সম্বলিত হৃদয়-প্রদেশই প্রাণময় হরি-হরের স্থান, প্রাণের সর্ব্ববিধ স্পন্দন বা সাড়া এখানেই অভিব্যক্ত হয় এবং দেহ-যন্ত্রের পরিচালন এবং রক্ষাকারী যন্ত্রসমূহও এইস্থানে সতত ক্রিয়াশীল। যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শক্তিময় অস্ত্র সমর্পণ দ্বারা ইতপূর্ব্বে তেজময়-ক্ষেত্রে আত্ম-সমর্পণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করা হইয়াছে, সেই প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ "যুদ্ধ-মহোৎসবের" পরিপূর্ণত্ব এক্ষণে আসন্ন হইল। এখানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বকর্ম্মের মূলে বা অন্তরালে সাক্ষাৎরূপে ভগবৎ শক্তির কর্তৃত্ব বা সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব অনুভব করাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ। এই পরম তত্ত্ব যাহারা অনুভব করেন, সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণই নিজ ব্যক্তিগত জীবনে বা জাগতিক ভাবে ভূত-শুদ্ধি পূর্ব্বক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম! —এইরূপে

সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব উপলব্ধিই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব ও রহস্য। শাস্ত্রেও আছে—"ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে" অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে চৈতন্যময় প্রাণকে আহুতি দেওয়া বা আত্ম-সমর্পণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করাই প্রকৃতপক্ষে হোম-কর্ম্ম বা জ্ঞান-যজ্ঞানুষ্ঠান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেই এইপ্রকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কৌশল, ভক্ত অর্জ্জুনকে বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রথমে অর্জ্জুন যুদ্ধরূপ বিপুল হিংসাকে আশ্রয় করিয়া রাজ্যলাভ বা যশ অর্জ্জন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন—"পৃথিবীর নিষ্কণ্টক্ রাজ্য-লাভ দূরের কথা, স্বর্গ-রাজ্যের একাধিপত্য লাভেও আমি এমন গর্হিত কর্ম্ম করিতে পারিবনা; গুরুজনদিগকে বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন গ্রহণ করাও শ্রেয়ঃ মনে করি।" ভগবান, ভক্ত অর্জ্জুনকে জ্ঞান-কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতির গুণদ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়"; অর্থাৎ ভগবৎশক্তি বা মহাশক্তিরূপিণী প্রকৃতিই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা। এইরূপে নানাবিধ শিক্ষাদানের পর, বিশ্বরূপ দর্শনচ্ছলে অর্জ্জুনকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে, তিনি ভীষ্ম দ্রোণাদিকে পূর্ব্বেই নিহত করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন—"নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্" —হে শরনিক্ষেপ-কারী অর্জ্জুন, তুমি 'নিমিত্ত' মাত্র হও! —ইহাই গীতোক্ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; কিন্তু নিমিত্তরূপে কার্য্য করাতেও আত্মকর্ত্তৃত্ব বা কর্ত্তৃত্বাভিমান একেবারে বিলুপ্ত হয় না; পক্ষান্তরে চণ্ডীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা আরও একস্তর উচ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত। —এখানে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় ভগবৎ কর্ত্তৃত্বে কিম্বা মহাশক্তির প্রেম-যজ্ঞে জীব ভাবীয় অহংকারকেও বলিদান করা হইয়াছে!—এই অবস্থায় নিজস্ব কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোক্তৃত্বাভিমান থাকে না; এখানে সাধক আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষীভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে মহাশক্তিময় ভগবানের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করেন। এইরূপে

ব্যক্তিগত জীবনেও প্রকৃতিরূপিণী মাতৃশক্তিগণের নিয়ন্ত্রণ ও ক্রিয়াশীলতা অনুভব করিয়া সাধক পুলকিত হন—এইখানেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ এবং দেবী-যুদ্ধের পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য—প্রথমটিতে (গীতা-সাধনায়) কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক ভগবৎ প্রীত্যর্থে নিমিত্তরূপে কর্ম্ম করা; আর দ্বিতীয়টীতে (চণ্ডী-সাধনায়) আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাক্ষীভাবে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ কর্ত্তৃত্ব বা শক্তিলীলা দর্শন ও অনুভব করিয়া ধন্য হওয়া!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে এই প্রকার প্রাণ-প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—'হে অর্জ্জুন! যেমন সূত্রধার, যন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম পুত্তলীকে নিজের ইচ্ছামত নাচাইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বর ভূত সকলের হৃদয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিঘূর্ণিত করাইতেছেন!”—ইহাও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অন্যতম তত্ত্ব। প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কালেও, পূজক নিজ হৃদয়ে মহাপ্রাণকে উদ্বোধিত করিয়া, পরে উহা প্রতিমার হৃদয়ে সমর্পণ করত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্রে, শরণাগত ভক্তগণের পক্ষে মহাশক্তি-রূপিণী মা প্রাণময় যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অসুরদলনী দুর্গা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এজন্য এখানে চিক্ষুর, ভক্ত দেবগণের প্রতি আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া অম্বিকা মায়ের সহিত যুদ্ধার্থে প্রধাবিত হইল। ব্যষ্টি পক্ষে—শরণাগত সাধকের দৈবী শক্তিসমূহ একত্রিত হইয়া মহাশক্তিরূপে পরিণত হইলে, মা স্বয়ং অসুর ভাব সমূহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে দলন করেন, আর ভক্ত-সাধক সাক্ষীরূপে ঐ লীলা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।—(১।২)

স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥ ৩

সত্য বিবরণ।—মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণে সুমেরু-শৃঙ্গ প্লাবিত করে,

সেইরূপ সেই অসুর যুদ্ধে শর-বৃষ্টিদ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিল।—(৩)

তত্ত্ব-সুধা।—চাঞ্চল্যের বহুমুখী অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এজন্য চিক্ষুর সর্ব্বতোমুখী বিবিধ চাঞ্চল্যদ্বারা অম্বিকা দেবীকে কিম্বা সাধকের সংঘবদ্ধ দেবভাবকে আচ্ছাদিত করিল। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অস্ত্রসমূহ সুর-হস্তে ধৃত হইয়া দেবভাব বিকাশ করে; তাহাই আবার অসুর-হস্তে ধৃত হইলে, দেবভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আসুরিক-ভাবে ক্রিয়াশীল হয়; সুতরাং চিক্ষুর হস্তে ধৃত শর বা বাণ অস্ত্রসমূহ সংঘবদ্ধ দেবভাবকে বহুমুখে চঞ্চল করিবার জন্য বর্ষিত হইতে লাগিল। এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য মন্ত্রে মেরু-শৃঙ্গের সহিত বৃষ্টি-ধারার তুলনা করিয়া অতি সুন্দর উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; অর্থাৎ মেরু-শৃঙ্গের সহিত দেবীর এবং বৃষ্টিধারার সহিত চিক্ষুর নিক্ষিপ্ত শরজালের তুলনা করা হইয়াছে। একদিকে দেবীর সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সুউচ্চ এবং সুদৃঢ় ভাব, অপর দিকে চিক্ষুরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৃষ্টি-ধারার ন্যায় নগণ্য শররাজির লঘু প্রহার বা ক্ষীণ আচ্ছাদন!—বৃষ্টি ধারা যেমন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে কোন প্রকারে আহত বা বিচলিত করিতে পারেনা, সেইরূপ চিক্ষুর নিক্ষিপ্ত শরজালও দেবীর চিন্ময় শরীরকে আচ্ছাদিত করিয়াও কোন প্রকার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিল না। ব্যষ্টিভাবে—সত্যে প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ়ভাবাপন্ন শরণাগত সাধক, অনন্ত চাঞ্চল্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও, মাতৃকৃপায় তিনি বিচলিত না হইয়া সর্ব্বাবস্থায় আত্ম-রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

উপরোক্ত উপমার আরও একটি উপলক্ষণ আছে; মেঘধারা সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিলেও, উচ্চতা হেতু যেমন উহা শৃঙ্গ বা শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতে পারেনা, সেইরূপ দেবী শরজালে বেষ্টিত হইলেও, তাঁহার শরীর অসঙ্গ এবং চিন্ময়হেতু শররাজির স্পর্শ হইতে তিনি বিমুক্ত রহিয়াছেন। ব্যষ্টিপক্ষে—সাক্ষীরূপে অবস্থিত শরণাগত

সাধক, জীবন-স্তরে চাঞ্চল্যভাবাপন্ন অনন্ত বিষয়-বিষদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও, তাহাতে তিনি তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীতে মাথা উঁচু করিয়া আত্ম-রক্ষায় তৎপর সন্তরণকারীর ন্যায় অভিভূত বা বিচলিত হননা! বরং স্থানুবৎ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করেন; ক্রমে মাতৃকৃপায় সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য ও বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইলে, সাধক মেঘমুক্ত রবির ন্যায় প্রোজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পান।—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।—(৩)

তস্য ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ৪
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতি সমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈঃ গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ॥ ৫
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্ম্মধরোঽসুরঃ॥ ৬

সভ্য বিবরণ।—অনন্তর দেবী শরসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহার (চিক্ষুরের) শরসমূহ ছেদন করিয়া, (তদীয়) অশ্বগণ সহ অশ্ব-সারথিকে নিহত করিলেন—(৪)॥ দেবী বাণসমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু এবং অত্যুচ্চ ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর ছিন্নধন্বা সেই অসুরের সর্ব্বাঙ্গে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন।—(৫) ছিন্নধন্বা, রথহীন, সারথিবিহীন সেই অসুর খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল।—(৪-৬)॥

তত্ত্ব-সুধা।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, চিক্ষুররূপী চাঞ্চল্য, চতুরঙ্গ বল সমন্বিত এবং বীর্য্য মন প্রাণ বুদ্ধি এই চারিটি প্রধান কেন্দ্রে তাহার বল বা শক্তি কেন্দ্রীকৃত; এতৎব্যতীত অহংপনা প্রত্যেক আসুরী ভাবেরই নিজস্ব বল। এক্ষণে দেবী-যুদ্ধ আরম্ভ হইল; তাই দেবী স্বয়ং চিক্ষুরের চতুরঙ্গ বল নাশ করার পর, তাহার অহংমঞ্চের সুউচ্চ ধ্বজাকে ছেদন পূর্ব্বক উহা অবনমিত করিলেন। এই দেবী-যুদ্ধ-রহস্য নিম্নে প্রদর্শন করা হইল।

(১) চিক্ষুরের প্রথম বল—বীর্য্য এবং কাম-কামনার বহুমুখী চাঞ্চল্য ; বীর্য্যের চাঞ্চল্য—মদনের 'পঞ্চশর'রূপে প্রকটিত হয় ; এতৎ ব্যতীত কাম-কামনার অনন্ত চাঞ্চল্যরূপী শরসমূহ মানবকে চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছাদিত করিয়া অভিভূত করিয়া ফেলে ! তাই অম্বিকা মা ভক্তের ঐ সকল আসুরিক চাঞ্চল্যকে ভগবানরূপ একলক্ষে আনয়ন-কারী বাণ সমূহ দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, কিন্তু একেবারে বিলয় করিলেন না ; কেননা চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ বিলয় হইলে, ভাবী অবশিষ্ট যুদ্ধের কারণও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এজন্য সমবেত চাঞ্চল্যরাশিকে দেবী, খণ্ড-বিখণ্ড বা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিহীন করিলেন ; অর্থাৎ সাময়িকভাবে চাঞ্চল্য নিরোধ হইল। (২) চিক্ষুরের দ্বিতীয় বল—অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত মনোময় রথের চাঞ্চল্য ; একমাত্র ভগবৎ নামরূপ এবং আত্মাভিমুখী বা ভগবৎ অভিমুখী আকর্ষণ ব্যতীত মনের চাঞ্চল্য নষ্ট হয় না ; তাই জগন্মাতা একলক্ষ্যাভিমুখী দেবভাবাপন্ন বাণদ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণের চাঞ্চল্য নিরোধ করিয়া সাধকের মনোময় আসুরী রথকে দেব-রথরূপে পরিণত করিতে লাগিলেন। মহাজন পদাবলীতে আছে—"চড়ি গোপীর মনোরথে মনমথের মন মথে" !—ইহাও অপূর্ব্ব সাধন কৌশল। (৩) চিক্ষুরের তৃতীয় বল—ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণ পরিচালিত মনোময় রথের সারথীরূপী বুদ্ধির চাঞ্চল্য। বুদ্ধিই মনের সারথি, কেননা মনের সংকল্প বা কল্পনা বুদ্ধির সাহায্যেই কার্য্যকরী হয়। দেবী, আসুরিক বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা সমূহকে দিব্য বাণাঘাত দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া নিস্ক্রিয় করিলেন—ইহাই মন্ত্রোশক্তির তাৎপর্য্য।

(৪) চিক্ষুরের চতুর্থ বল—প্রাণের চাঞ্চল্য—ইহা নানা প্রকারে অভিব্যক্ত হইলে, বহুমুখী শব্দ-প্রীতি বা আসুরিক ধনুর বিভিন্নমুখী শব্দ-চাঞ্চল্য কিম্বা বাকচাতুর্য্য উহাদের মধ্যে অন্যতম। যতদিন পারি-পার্শ্বিক বা জাগতিক বিভিন্ন শব্দ সমূহ, ঐক্যতানযুক্ত প্রণব-ধ্বনিরূপে

বা মাতৃময়রূপে প্রতিভাত না হইবে ; যতদিন পর্য্যন্ত বাক্ সংযম হইয়া সাধকের প্রাণময় অনাহত-ক্ষেত্রে নাদ-ধ্বনির অভিব্যক্তি না হইবে, যতদিন না সিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদের প্রাণের সুরে সুর মিলাইয়া অনুভব করিতে পারিব—"যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে—ততদিন পর্য্যন্ত নানা শব্দ-প্রীতি বা বহুত্বের মোহরূপ চাঞ্চল্য বিদূরিত হইবে না ! এজন্য মা চিক্ষুরের বহুমুখী শব্দ-প্রীতি আসুরী-ধনুক, বাণাঘাতে ছিন্ন করিয়া উহাতে প্রণব-ধ্বনিময় দিব্যভাব অর্পণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত চিক্ষুরের আত্মবল—অহংমঞ্চের সুউচ্চ ধ্বজা। ইহা অসুরগণের কিংবা অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের সার্ব্বভৌম শক্তি বা বল ! দেবী বিদ্য বাণাঘাতে আসুরিক ধ্বজাকে ছিন্ন করিয়া চিক্ষুরের অহংকারকে অবনমিত করিলেন। এইরূপে দেবী চিক্ষুরের সর্ব্বাঙ্গে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ আসুরিক চাঞ্চল্যকে বাণ-বিদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে দিব্যভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। ব্যষ্টিভাবে—মহাশক্তিরূপিণী মা শরণাগত ভক্ত-সাধকের আসুরিক ভাবাপন্ন চাঞ্চল্যের সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে অস্ত্ররূপ মঙ্গলময় দিব্য শক্তিদ্বারা আঘাত করত, সাধককে ক্রমে দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে থাকেন—ইহাই মন্ত্রশক্তির তাৎপর্য্য।

সাধকের জন্ম-জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত এবং আচরিত সংস্কার সমূহ সহজে নষ্ট বা বিদূরিত হয়না ; তাই দেবী চিক্ষুরের সমস্ত বল নষ্ট করিয়া তাহাকে দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিলেও সে অজ্ঞানতার প্রতীক্ জ্ঞাননাশক্-অজ্ঞানরূপ আসুরিক খড়গদ্বারা এবং জড়ত্ব ও মলিনত্বের অববোধক চর্ম্মদ্বারা সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে আক্রমণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রমত্ত হইয়া তাঁহার দিকে প্রধাবিত হইল।—(৪০৬)

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্দ্ধনি ॥
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতি বেগবান্ ॥ ৭
তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৮

সভ্য বিবরণ। অতি বেগবান্ চিক্ষুরাসুর তীক্ষ্ণখড়্গ দ্বারা সিংহকে শিরোদেশে প্রহার করিয়া, দেবীরও দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল—(৭)॥ হে নৃপ-নন্দন! সেই খড়্গ দেবীর হস্তে স্পর্শমাত্রই ভগ্ন হইয়া গেল; অনন্তর সেই মহাসুর ক্রুধে আরক্তনয়ন হইয়া হস্তে শূল গ্রহণ করিল।—(৮)

তত্ত্ব-সুধা। অতঃপর সেই অসুর তদীয় খড়্গদ্বারা প্রথমে দেবীকে আঘাত না করিয়া, দেবী-বাহন সিংহের মস্তকে অগ্রে আঘাত করিল! —ইহার কারণ সুস্পষ্ট; কেননা ধর্ম্ম-ভাব-সমষ্টিরূপ জ্ঞানময় সিংহকে যদি কোনরূপ অজ্ঞানতার আঘাতে আহত করিতে সমর্থ হওয়া যায়; অর্থাৎ সাধক যদি আসুরিক চাঞ্চল্যে অভিভূত বা প্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মভাব হইতে বিচ্যুত কিম্বা ভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে অসুররূপা অবিদ্যার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইতে পারে। পুরাকালে তপস্যা-নিরত মুনিগণকে তাঁহাদের তপোপ্রভাবরূপ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সুন্দরী অপ্সরাগণকে নিয়োজিত করা হইত। কঠোর তপস্যা করা কালীন, বুদ্ধদেবকেও 'মারের' আক্রমণরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল! এই সব কারণে, এখানেও অসুর সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানময় সিংহের মস্তকে আঘাত করিয়াছে।

মন্ত্রোক্ত "মুর্দ্ধনি" বা মস্তকে আঘাত উক্তিরও রহস্য আছে; স্থূলভাবে বিচার করিলেও, শরীরের অন্যস্থানে আঘাত করা অপেক্ষা মস্তকে আঘাত সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বা সাঙ্ঘাতিক হইয়া থাকে; এতৎব্যতীত সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, মস্তকটী পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধির আশ্রয়স্বরূপ; সুতরাং সাধকের জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তকে, যদি কোন ক্রমে অবিদ্যার অজ্ঞান-বিজৃম্ভণ প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তবে উহাই ক্রমে সাধককে তাঁহার ধর্ম্মভাব হইতে পাতিত করিতে সক্ষম হইবে।

অতঃপর অতি বেগবান্ অসুর, তদীয় খড়্গ দ্বারা দুর্গা মায়ের দক্ষিণ

হস্তে (সব্যে) আঘাত করিল। দুর্গাপূজা কালীন অবলম্বিত দুর্গার ধ্যানে দেখা যায় যে, দুর্গা দেবী, ত্রিশূল খড়্গ চক্র বাণ এবং শক্তি প্রভৃতি প্রধান অস্ত্রসমূহ, তাঁহার দক্ষিণ হস্তরাজি দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন * ; সুতরাং চিক্ষুর দুর্গা মায়ের দক্ষিণ হস্তেই আঘাত করিয়াছিল। বিশেষতঃ ঢাল-তলোয়ারধারী যোদ্ধাগণ বাম হস্তে ঢাল এবং দক্ষিণ হস্তে তলোয়ার ধারণ পূর্ব্বক, যখন, বিজয়ার্থী হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে, তখন ঢাল থাকা হেতু, মস্তকে আঘাত করা সহজসাধ্য হয় না, কিন্তু তলোয়ার-ধৃত দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিয়া বিপক্ষের অস্ত্র ধারণ-সামর্থ্যকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে ; এই নিয়মে এখানেও দেবীর প্রধান অস্ত্র ধারণকারী এবং বাণবর্ষণকারী দক্ষিণ হস্তে আসুরিক আঘাতই সমীচীন এবং স্বাভাবিক। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার "আনন্দ-লহরী" স্তবে 'সব্যং নয়নং' উক্তি দ্বারা মায়ের দক্ষিণ চক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়াছেন †। কোন কোন টীকাকার 'সব্যে' দ্বারা বামহস্তরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মতে মহাশক্তিরূপিণী কালিকা দেবী বাম হস্তে খড়্গ ধারণ করেন ; আবার স্ত্রীলোকের বাম হস্ত দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা অধিক বলশালী বলিয়া কথিত হয়, ইত্যাদিই কারণ ; কিন্তু এই যুক্তি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবং অবস্থায় মোটেই প্রযোজ্য নহে, কেননা এখানে দুর্গাদেবী খড়্গাদি বিশিষ্ট অস্ত্র, দক্ষিণ হস্তেই ধারণ করিয়াছেন।

মন্ত্রোক্ত 'তীক্ষ্ণধারেণ' এবং 'অতি বেগবান্' বাক্যগুলিও রহস্যময় ও ভাবব্যঞ্জক। চিক্ষুরের খড়্গটীকে 'তীক্ষ্ণধার' বলা হইয়াছে—ইহাতে

---

* দুর্গামাতার ধ্যানে আছে—"ত্রিশূলং দক্ষিণ হস্তে খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ"।

† "অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া, ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।" —হে জননী! তোমার দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছে ; আর তোমার বাম নয়ন চন্দ্র স্বরূপ বলিয়া রাত্রি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছে—আনন্দ-লহরী —(৪৮ শ্লোক)।

অজ্ঞানতারূপ অবিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বুঝিতে হইবে। চাঞ্চল্যের বাহ্যিক স্থূল বিষয়ের অভাব দৃষ্ট হইলেও, চিত্তের কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং দুর্জ্ঞেয় কেন্দ্রে উহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা সাধকগণ প্রথমে বুঝিতেই পারেন না; কিম্বা ক্ষুদ্র 'পরগাছার' ন্যায় প্রাথমিক অবস্থায়, উহা উপেক্ষিত হইতে থাকে; কিন্তু কালক্রমে উহাই একদিন সাধকের ধর্ম্মভাবকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়। মধ্যম চরিত্রের আসুরিক ভাব সমূহ সূক্ষ্মভাবাপন্ন, এজন্য, মন্ত্রে খড়্গকে তীক্ষ্ণধার বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। আর 'অতি বেগবান্' উক্তি দ্বারাও চাঞ্চল্যের অতি সূক্ষ্ম এবং শক্তিময় আসুরিক ভাবকে উপলক্ষ্য করা হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য; মন্ত্রের 'অরুণ-লোচন' উক্তিও রাজসিক লক্ষণ পরিব্যক্ত করিতেছে।

চিন্ময়ী দেবীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত দ্বারা কোনরূপ বেদনা বা ক্রিয়া উৎপাদন করা সম্ভবপর নহে; বরং উহা মায়ের সর্ব্ব কারণের কারণরূপ আধারে আহত হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়; এজন্য এই যুদ্ধে অসুরের খড়্গ দেবীর চিন্ময় দেহ স্পর্শ করা মাত্রই খণ্ড বিখণ্ড বা বিলীন হইয়া গেল; অর্থাৎ জ্ঞানময় দিব্য-ভাব স্পর্শে অজ্ঞানতা আপন অস্তিত্ব হারাইল। ব্যষ্টিভাবে—শরণাগত এবং সাক্ষীভাবে অবস্থিত সাধককে অজ্ঞানতাময় বিভিন্ন সূক্ষ্ম-চাঞ্চল্য দ্বারা প্রতিহত করার আসুরিক চেষ্টা, মাতৃ-কৃপায় সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

অতঃপর চাঞ্চল্যরূপী অসুরের একদিকে বহির্ম্মুখী সর্ব্ববিধ আসুরিক প্রচেষ্টা বিফল হইল এবং অন্যদিকে মাতৃ-প্রক্ষিপ্ত দেবভাবাপন্ন বাণাঘাতে, তাহার আসুরিকভাবসমূহ কতকটা পরিবর্ত্তিত বা বিশুদ্ধ হইতে লাগিল; তৎপর সে জাগতিক খণ্ড ভাবাপন্ন বিষয়-গোচরজ্ঞানময়, কিম্বা ত্রিপুটী-বিভাগাত্মক আসুরিক শূল গ্রহণ করিল।—(৭। ৮)

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ ॥ ৯

দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ১০

সভ্য বিবরণ। অনন্তর মহাসুর চিক্ষুর ভদ্রকালীর প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল; উহা স্বকীয় প্রভাজালে আকাশ-পটে সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।—(৯)॥ সেই শূলকে আসিতে দেখিয়া, দেবী স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন; সেই শূলে অসুর-নিক্ষিপ্ত শূলের সহিত মহাসুর চিক্ষুরও শতধা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল।—(১০)

তত্ত্ব-সুধা। চিক্ষুর ভদ্রকালীকে লক্ষ্য করিয়া বিষয়-গোচর জ্ঞানময় আসুরিক শূল নিক্ষেপ করিল; বিষয়-গোচর-জ্ঞানের চরম বিকাশ আধুনিক বিজ্ঞান—ইহাতেও সত্যের আংশিক ভাব বিকাশ হইয়া থাকে, এজন্য খণ্ড জ্ঞানময় আসুরিক শূলকেও মন্ত্রে 'আকাশে সমুজ্জ্বল রবিবিম্বের ন্যায় দীপ্ত' বলা হইয়াছে; ইহাই চিক্ষুরের সর্ব্বশেষ অস্ত্রত্যাগ। **ব্যষ্টিপক্ষে**—চাঞ্চল্য যখন সাধককে কোনরূপেই অভিভূত করিতে পারিল না, তখন সে সাধককে বিষয়-গোচর খণ্ড-জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে, কিম্বা অহং-ভাবাপন্ন জাগতিক বা সাংসারিক ত্রিপুটী বিভাগে বিমোহিত করিয়া তাঁহার ঐক্যবদ্ধ দেবভাবকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যে সাধক মঙ্গল-ময়ী **ভদ্রকালী** * মায়ের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই মঙ্গলময় হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি অবিদ্যার আসুরিক মায়াজাল-বিস্তার সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফলই হইয়া থাকে। চিক্ষুর নিক্ষিপ্ত আসুরিক শূলকে, মা দিব্য শূলাঘাতে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন! অর্থাৎ সাধক সূক্ষ্ম-চাঞ্চল্যের সর্ব্বশেষ আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়া মাতৃ-কৃপা প্রাপ্ত হইলেন;

---

* ভদ্রকালী—সুখপ্রদেতি; অথবা ভদ্রং মঙ্গলং কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুমিতি ভদ্রকালী; অর্থাৎ যিনি ভক্তকে আনন্দ বা মঙ্গল প্রদান করেন, তিনিই ভদ্রকালী কিম্বা যিনি সর্ব্বতোভদ্রস্বরূপা বা নিত্য মঙ্গলময়ী এবং কালাতীতা তিনিই ভদ্রকালী।

এইরূপে মাতৃভাবে বিভোর হইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন—মন্ত্রোক্তির ইহাই তাৎপর্য্য।

এখানে একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে—মা চিক্ষুরকে এবং তাহার প্রদীপ্ত শূলকে সম্পূর্ণ লয় না করিয়া, 'শতধা' খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; ইতিপূর্ব্বেও মা চিক্ষুরের বহিরঙ্গ বল সমূহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন; ইহার কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ চাঞ্চল্য যদি চিরতরে সম্পূর্ণ বিলয় বা উপশমিত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পুনরুত্থান হইবে না; কিন্তু পরবর্ত্তী লীলাসমূহে এবং কারণময় স্তরে উহা-দের ব্যুত্থান পুনরায় দৃষ্ট হইবে; এজন্য মা উহাদিগকে বিলয় না করিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন দ্বারা শক্তিহীন করিলেন। এইরূপে সাধকের চিত্তে আসুরিক চাঞ্চল্যের ক্রিয়াশীলতা সাময়িকভাবে উপশমিত হইল।—(৯।১০)

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দ্দনঃ॥ ১১

সত্য বিবরণ। মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে দেব-পীড়ক চামরাসুর গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থে আগমন করিল।—১১

তত্ত্ব-সুধা। চিত্তের অশুদ্ধতা বা সূক্ষ্ম মালিন্য-সমষ্টিই চামর—ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। পবিত্র ও বিশুদ্ধ রোমরাজির সমষ্টি-ভূত 'চামর' দ্বারা দেবতার আরতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; আবার অসুর-পক্ষে—অপবিত্র অবিশুদ্ধ মালিন্যময় ভাবসমষ্টিই অসুরগণের পুষ্টি এবং তুষ্টির প্রধান কারণ বা উপকরণ—উহাই আসুরিক চামর; এজন্য অসুর-রাজ মহিষের অন্যতম সেনাপতি চামর—মালিন্য-সমষ্টির ঘনীভূত বা মূর্ত্ত অবস্থা।

চামর গজারূঢ় হইয়া যুদ্ধার্থে সমাগত—'গজ' বা হস্তীর ভোগাসক্তি-ময় স্থূলভাব প্রথম চরিত্রে এবং উহার সূক্ষ্মভাব পূর্ব্বাধ্যায়ে 'ঐরাবত' সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। গজ শব্দের ধাতুগত অর্থ বন্ধন; ভোগাসক্তিময়

বিষয়ের মধ্য দিয়া খণ্ডিত সুখলাভের প্রয়াস কিম্বা দেহেন্দ্রিয় পরি-তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অবিশুদ্ধ বা মালিন্যময় অবস্থাই গজ—উহা আত্মময় বা পরমাত্মময় স্বরূপভাব বিকাশের প্রধান অন্তরায় বা পরিপন্থী স্বরূপ!—উহাই জাগতিক বা মায়িক বন্ধনের অন্যতম কারণ স্বরূপ। এই সব কারণে মন্ত্রোক্ত চামরের গজারোহণে আগমন ভাবটী সমীচীন এবং সুশোভন হইয়াছে।

চামরের আর একটী মন্ত্রোক্ত বিশেষণ 'ত্রিদশার্দ্দিন'—ত্রিবিধ দশাকে যিনি ভোগ করেন, কিম্বা ত্রিদশরূপী দেবতাগণকে যিনি পরাজিত করেন, তিনিই ত্রিদশার্দ্দিন। প্রথমতঃ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় ত্রিবিধ অবস্থাই জীব-জগতের মূল উপাদান এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়াদিরও মূল কারণ স্বরূপ; সমষ্টি ত্রিগুণই ব্যষ্টিভাবে অনন্ত রূপ-রসাদির আকারে বিভাবিত হইয়া বিশ্ব-প্রপঞ্চরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে! জ্ঞানের ত্রিপুটি বিভাগেও—দ্রষ্টারূপে রজোগুণ, দৃশ্য বা রূপরসাদি বিষয়রূপে তমোগুণ এবং দর্শনরূপে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে—অন্যান্য ত্রিপুটী বিভাগেও, ইহাই সার্ব্বভৌমিক নিয়ম। এই ত্রিপুটী বিভাগ দ্বারাই অখণ্ড অদ্বিতীয় স্বরূপ-জ্ঞান, উপরোক্ত রূপ ত্রিবিধ গুণময় বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; ক্রমে উহারাই ব্যষ্টিরূপে, অনন্ত ভাবে এবং অনুভাবে বিভাবিত বা সঙ্কুচিত হইয়াছে; এইরূপে মালিন্য-সমষ্টি-রূপ চামরই মানবের অখণ্ড স্বরূপ-জ্ঞানকে বিখণ্ডিত করিয়া ত্রিগুণময় সংসার-চক্রে আবদ্ধ করত ত্রিতাপজ্বালাময় বিষয় ভোগে উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছে! অর্থাৎ ত্রিগুণময় ত্রিবিধ অবস্থা বা দশা নানাপ্রকারে ভোগ করাইতেছে—এজন্য চামরের বিশেষণ ত্রিদশার্দ্দিন। দ্বিতীয়তঃ মায়িক বা আসুরিক প্রভাবে, প্রভাবিত কিম্বা অভিভূত হইয়া ধর্ম্মভাব হইতে বিচ্যুত হইলে, দেহ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ দেবভাব সমূহ নিজ নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এসম্বন্ধে পূর্ব্ব অধ্যায়ে

সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। ভোগোন্মত্ত অবিশুদ্ধ মলিন-চিত্ত ব্যক্তির নিকটে, তদীয় দেবভাব সমূহ সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারেনা; এজন্য চামররূপ মালিন্য-সমষ্টিকে মন্ত্রে 'ত্রিদশার্দ্দন' বা দেবভাব বিমর্দ্দনকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ব্যষ্টিভাবে—মাতৃ-কৃপায় সাধকের সূক্ষ্ম-চাঞ্চল্য সাময়িকভাবে উপশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁহার চিত্ত-দর্পণ সম্পূর্ণ মার্জ্জিত হয় নাই—এখনও উহা বিমলতায় এবং উজ্জ্বলতায় মণ্ডিত হইয়া স্বপ্রকাশ-ভাবাপন্ন হয় নাই—উহাতে মাতৃময় আত্ম-জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকিলেও, সেই পরম তত্ত্বের সম্যক্ রসাস্বাদন করার সৌভাগ্য এখনও সমাগত হয় নাই; তাই চিত্তের সূক্ষ্ম কেন্দ্রে অবস্থিত সংস্কাররাশি একে একে মাতৃ-কৃপায় মূর্ত্ত অসুররূপে আত্ম-প্রকট্ করিয়া ক্রমে মাতৃ-অস্ত্রে বা মাতৃ-অঙ্গে বিলীন হইতেছে!—এক্ষণে চিক্ষুররূপী মালিন্যও গজরূপী মদাশ্রিত হইয়া বিলয়ের জন্য প্রস্তুত হইল; ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।—(১১)

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥ ১২

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ ১৩

সত্য বিবরণ।—অনন্তর সেই চামরাসুর সত্বর দেবীর প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিল; অম্বিকা দেবীও তৎক্ষণাৎ হুঙ্কারের দ্বারা সেই শক্তিকে প্রতিহত এবং নিষ্প্রভ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন!—(১২)॥ শক্তি-অস্ত্র ভগ্ন এবং ভূতলে পতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া [দেবীর প্রতি] শূল নিক্ষেপ করিল; দেবী বাণসমূহ দ্বারা তাহাও ছেদন করিলেন।—(১৩)

তত্ত্ব-সুধা।—মালিন্য-সমষ্টিরূপী চামর আসুরিক বলে পরিপূর্ণ এবং

আসুরিক ভাবে প্রাণময় সূক্ষ্ম-শক্তি, দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল; দেবী উহাকে হুঙ্কার দ্বারা নিষ্প্রভ বা শক্তিহীন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন; অর্থাৎ উহার প্রাণময় আসুরিক ক্রিয়াশীলতা স্তম্ভিত করিয়া জড়ত্বে পরিণত করিলেন। মায়ের হুঙ্কারই সমষ্টিভাবে—প্রণব ধ্বনি; আর ব্যষ্টিভাবে—অনাহত ধ্বনি, বিভিন্ন নাদ-ধ্বনি, ভগবৎ নাম লীলা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বিবিধ আকারে ভক্ত ও সাধকগণের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে! —চিত্তের অবিশুদ্ধতা বা ম্যালিন্য বিদূরিত করিতে হইলে, ইহাদের মত ব্রহ্মাস্ত্র আর নাই। নাদ-শ্রবণ, স্তব-স্তুতি, জয়-ধ্বনি, অজপা জপ, নাম জপাদির মত চিত্ত মার্জ্জনাকারী অমূল্য চিন্ময় রসায়ন সাধন-জগতে দুর্লভ; তাই শব্দময়ী নামরূপ-ধারিণী মায়ের অতুলনীয় প্রভাব উপলব্ধি করিয়াই কলিকলুষ-নাশন পতিতপাবন গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন— "নামৈব কেবলম্" অর্থাৎ একমাত্র নামাশ্রয় দ্বারাই সিদ্ধি হইতে পারে।

হুং বা হুঙ্কার একটী অভিনব শক্তিশালী মন্ত্র বিশেষ—তন্ত্র-মন্ত্রাদিতে ইহার বিশেষভাবে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; ইহা প্রণবের উপলক্ষণ; তন্ত্র-শাস্ত্রে ইহাকে 'কূর্চ্চবীজ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগ-শাস্ত্রেও নানাবিধ অবস্থায় ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে,—হুঁ উচ্চারণ পূর্ব্বক দমভর বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা আছে—হুঙ্কার দ্বারা প্রাণময় জীবাত্মাকে কুণ্ডলিনী শক্তির সহিত একীভূত করিয়া ক্রমে চক্রাদি আরোহণ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে মিলন করার ব্যবস্থা আছে। মল্লগণ বা লগুড়ধারী লাঠিয়ালগণ পরস্পর সংঘর্ষকালীন হুঙ্কার উচ্চারণ দ্বারা একদিকে স্বপক্ষের শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে; পক্ষান্তরে, হুঙ্কারই বিপক্ষদলের বল-বীর্য্য স্তম্ভিত করিয়া ভীতি উৎপাদন করে। কামাদি রিপুকে স্তম্ভিত করিবার জন্য, কিম্বা উহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও হুঙ্কারাদি মন্ত্র-জপের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এতৎ ব্যতীত ব্যবহারিক জগতে

সাধারণ ভাবেও বিতর্কে, ক্রোধে এবং পরিপ্রশ্নাদিতেও হুঁ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। এইসব কারণে দেবী, চিক্ষুরের প্রভাবময় ও প্রাণময় শক্তির আক্রমণকে হুঙ্কার দ্বারা নিষ্প্রভ ও শক্তিহীন করিয়াছিলেন। ব্যষ্টিভাবে—সাধক যখন অপূর্ব্ব শক্তি সমন্বিত হুঙ্কার দ্বারা আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধনা দ্বারা বা মাতৃ-কৃপায় প্রাণবায়ুকে স্থির বা 'কুম্ভক' করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া চাঞ্চল্যও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়—ইহাই তাৎপর্য্য।

চামরের আসুরিক শক্তি বা অস্ত্র নিস্ফল এবং জড়ত্ব প্রাপ্ত দেখিয়া সে, সাংসারিক বা জাগতিক প্রপঞ্চের বহুমুখী ভোগাসক্তিতে আবদ্ধকারী বা আকর্ষণকারী অজ্ঞানতাময় আসুরিক শূল সাধকের দিব্যভাব সমষ্টিরূপা দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল—দেবী উহা পরমাত্মাভিমুখী এক লক্ষ্যকারী দিব্য বাণদ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ব্যষ্টিভাবে—হুঙ্কারাদি নাম-জপ দ্বারা প্রাণবায়ু স্থিরকারী সাধকের চিত্তে আসুরিক চাঞ্চল্যের প্রাণময় শক্তি ব্যর্থ হওয়ায়, অবিদ্যারূপী অসুর সাধকের চিত্তে জাগতিক প্রপঞ্চের ভোগাসক্তিময় স্মৃতি জাগ্রত করিয়া, তাঁহার সাধনা পণ্ড করিয়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যাঁহার লক্ষ্য পরমাত্মময় বা মহাশক্তিময় ভগবান, তাঁহাকে মায়িক প্রপঞ্চের লালসা দ্বারা অভিভূত করিবার প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্র করার একটী সাধন-কৌশল পরিব্যক্ত হইয়াছে—লক্ষ্য স্থির না হইলে যেমন বাণদ্বারা অভীষ্ট বস্তু ভেদ করা যায়না, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তএকাগ্রতার সর্ব্বপ্রধান সাধনা বা উপায়—আত্মস্বরূপ ভগবানে বাণের মত লক্ষ্য রাখিয়া এবং নিজ বিভিন্ন প্রকৃতি সমূহকে শক্তিময় মাতৃরূপে অনুভব করত, আত্ম-শুদ্ধি করা এবং সাক্ষীরূপে অবস্থিতি। তাই চিক্ষুর এবং চামরের চাঞ্চল্যময় অবিশুদ্ধ আসুরিক ভাবসমূহ ভদ্রকালী মা একলক্ষ্যকারী বাণাঘাত দ্বারা

দিব্য ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।—গীতার 'মামেকং শরণং ব্রজ' ভাবটীই চণ্ডীতে মূর্ত্ত হইয়া দেবী নিক্ষিপ্ত দিব্য বাণরূপে প্রকটিত।—(১২।১৩)

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা॥ ১৪

সত্য বিবরণ। অনন্তর সিংহ উল্লম্ফন পূর্ব্বক গজ-কুম্ভের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই অসুরের সহিত প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল।—(১৪)

তত্ত্ব-সুধা। গজ=ভোগাসক্তি বা বন্ধন; কুম্ভ=অমৃতময় ভাব অর্থাৎ আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎমুখী গতি বা মুক্তি। ক্ষীরোদ সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত অমৃতকুম্ভ, দেবাসুর-যুদ্ধ কালীন, হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরী এবং উজ্জয়িনী, এই চারিস্থানে রক্ষিত হওয়ায়, ঐ চারিটী তীর্থে অমৃত-কুম্ভযোগে কুম্ভমেলার উদ্ভব হইয়াছে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ও উৎসবাদিতে মঙ্গলময় কুম্ভ বা ঘট-স্থাপন করা হয়—ইহাতেও আনন্দরূপ অমৃত প্রাপ্তির সূচনা বা পূর্ব্বাভাস। বিশেষতঃ ঘটোৎসর্গের মন্ত্রাদিতে ঘটকে ধর্ম্মরূপে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকরূপে * এবং সর্ব্বদেবতার প্রীতিকারকরূপে পূজা করা হয়—সুতরাং কুম্ভ অমৃতময়ভাব। গজ-কুম্ভের অন্তরে বা মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া সাধকের ধর্ম্মভাব সমষ্টিরূপ সিংহের যুদ্ধলীলা অতি অপূর্ব্ব এবং আস্বাদনীয় বস্তু। ভোগাসক্তিময় গজকে পদদলিত করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ অমৃতময় কুম্ভকে আশ্রয় পূর্ব্বক চামররূপী মূর্ত্ত মালিন্য-সমষ্টির সম্মুখীন হইতে হইবে। তখন দেখা যাইবে—এক দিকে ভোগাসক্তির উদ্দাম ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস—অন্যদিকে অমৃতময় ত্যাগের মহিমান্বিত নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি; অপূর্ব্ব বীর্য্যময় আত্মিক বা পরমাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় তেজ! একদিকে সন্ধ্যার ক্রম বর্দ্ধমান্ অন্ধ-তমসা

*"ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা" * * এষ ধর্ম্মঘটো দত্তঃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকঃ। ইত্যাদি

অন্যদিকে রক্তিম উষার ক্রম-উদীয়মান দিব্য জ্যোতিঃ! এইরূপ জীবন-মরণের এবং বন্ধন-মুক্তির সন্ধি-স্থলে অবস্থান করিয়াই, আধ্যাত্মিক সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইবে।

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে; সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে—হস্তীরূপী গজাসুরকে দলন করিয়া তদুপরি সিংহ অবস্থিত, এবং সেই সিংহ-পৃষ্ঠে আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রী মাতা সমাসীনা!—কি অপূর্ব্ব ভাবের একত্রে সমাবেশ!—যখন গজাসুররূপী ভোগাসক্তির ত্রিতাপ জ্বালাময় উদ্দাম লালসাকে দলিত বা সুসংযমিত করিয়া সাধক কর্ত্তব্যবোধে অনাসক্তভাবে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন; ক্রমে মহাশক্তিময় ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, যখন সেই সাধক, অন্তর প্রদেশে অধ্যাত্ম-রাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তদীয় ধর্ম্মভাব-সমষ্টিকে সিংহরূপে পরিণত করিতে সক্ষম হন, তখন সেই ধার্ম্মিকের ধর্ম্মময় হৃদয়-আসনে, বা সিংহাসনে পরমাত্মময় ইষ্ট দেব-দেবীর আবির্ভাব হইয়া সাধককে পরমানন্দ প্রদান করে!—ইহাই জগদ্ধাত্রী পূজার তত্ত্ব ও রহস্য!—এই ভাবটীর সহিত, মন্ত্রোক্ত গজ-কুম্ভের উপরে অবস্থান করিয়া আধ্যাত্মিক যুদ্ধ-লীলারও অপূর্ব্ব রহস্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। চিত্ত-শুদ্ধির অন্তরায়স্বরূপ মালিন্য ভাবগুলিকে একটী একটী করিয়া প্রত্যাহার করত মাতৃ-চরণে সমর্পণ করা বা 'ডালি' প্রদান দ্বারা মাতৃ-পূজা সুসম্পন্ন করাই মন্ত্রোক্ত 'বাহুযুদ্ধ'।—(১৪)

যুদ্ধমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতি দারুণৈঃ॥ ১৫
ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম॥ ৬

সত্য বিবরণ। তৎপর যুদ্ধ করিতে করিতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা উভয়ে সেই হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইল এবং অতি

দারুণ প্রহার সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল।—(১৫)। তৎপরে সিংহ বেগে উল্লম্ফন পূর্ব্বক আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া এবং তথা হইতে পুনরায় ভূতলে নিপতিত হইয়া, চপেটাঘাতে চামরের মস্তক, দেহ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন ॥—(৬)

তত্ত্ব-সুধা।—গজ-কুম্ভরূপী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মধ্যে থাকিয়া আধ্যাত্মিক যুদ্ধকে সাধারণ মনে করিলে চলিবে না, কেননা ইহা যে আত্মার সহিত অনাত্মার সংঘর্ষ!—মায়া-শক্তির সহিত চিৎশক্তির অপূর্ব্ব শক্তিপরীক্ষা-রূপ দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম। এজন্য এই যুদ্ধ লীলা শুধু একই কেন্দ্রে বা স্থানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; তাই কখনও নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিয়া-স্থূল জড়ভাবের সহিত যুদ্ধ, আবার কখনওবা আকাশরূপ সুউচ্চস্থানে বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কেন্দ্রে বা স্তরে উঠিয়াও সংগ্রাম করিতে হইবে—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

সিংহ সবেগে আকাশে উঠিল, ইহাতেও সাধন-রহস্য আছে—সাধকের মনকে সাংসারিক বাধা-বিঘ্ন বা পারিপার্শ্বিক তমোগুণময় অবস্থার জ্বালাময় ক্রিয়াশীলতা হইতে উচ্চে বা আকাশে উঠাইতে হইবে; অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অবস্থায় আকাশের মত নিঃসঙ্গ হইতে হইবে। যিনি আধ্যাত্মিক-জগতে উচ্চে উঠিয়াছেন, তিনি নিম্নভূমির চাঞ্চল্য ও মালিন্যের আবিলতা দ্বারা অভিভূত হইলেও আত্ম-হারা হন না!—বরং বিরুদ্ধ অবস্থাকে পদদলিত করিয়া তিনি সানন্দে উচ্চ অবস্থান করেন। জাগতিক ভাবে, উচ্চস্থানে উঠিয়া নিম্নভূমি দর্শন করিতে পারিলেও দেখা যাইবে যে, সাধারণ উচু স্থান দূরের কথা, পাহাড় পর্ব্বতগুলি পর্য্যন্ত সমতল ভূমির মত বা চিত্রবৎ দেখা যায়! এই সব মন্ত্রে ঋষি ধাম্মিক সাধককে উচ্চে (আকাশে) উঠিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছেন; কেননা একবার উচ্চ অবস্থা লাভ করার পর, নিম্নভূমিতে আসিয়া যুদ্ধ করিলেও, আর পতনের সম্ভাবনা থাকিবেনা—এজন্যই পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য

আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশের ব্যবস্থা ছিল। সাধক উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ভাবের আদান প্রদানরূপ কর-প্রহার বা অভ্যাসযোগে প্রত্যাহার সাধনা দ্বারা মালিন্য সমষ্টিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্ম-ভাবে বা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হন—ইহাই মন্ত্রোক্ত কর-প্রহার দ্বারা চামরের শির পৃথক্ করার রহস্য ও তাৎপর্য্য। এখানে সিংহকে মৃগারি বলা হইয়াছে; মৃগ বা হরিণ স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল; যে সাধকের চাঞ্চল্য নষ্ট হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ ও লক্ষ্য স্থির হইয়াছে, সেই পুরুষ-সিংহই মৃগারি।—(১৫।১৬)

উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৭

সত্য বিবরণ।—দেবী উদগ্র অসুরকে শিলাবৃক্ষাদি দ্বারা বধ করিলেন এবং করাল অসুরকে দন্তমুষ্টি ও তলপ্রহারে নিপাতিত করিলেন।—(১৭)

তত্ত্ব-সুধা।—আত্মম্ভরিতা বা আত্ম-শ্লাঘায় উচ্চশির উদগ্রকে দেবী শিলা বৃক্ষাদি দ্বারা নিহত করিলেন—ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতৃ-হস্ত-ধৃত 'শিলা-বৃক্ষাদি' জড়ভাবাপন্ন নহে; উহা শালগ্রাম শিলা ও তুলসী বৃক্ষাদির ন্যায় চিন্ময়। যাঁহারা শালগ্রাম শিলা ও তুলসী বৃক্ষাদিতে ভগবৎ ভক্তি অর্পণ করিয়াও অপরের উপাসনাকে নিন্দা করত নিজ-ধর্ম্মে আত্ম-শ্লাঘা বোধ করেন, তাহারা উদগ্র অসুরের প্রভাবে প্রভাবিত। সেই সকল সাম্প্রদায়িকভাব-দুষ্ট সাধক যখন ভগবৎ চরণে শরণাগত হয়, তখন ভগবৎ শক্তিরূপিণী পরমাত্মময়ী মা চৈতন্যময় শিলা-বৃক্ষাদির আঘাতে অর্থাৎ শালগ্রাম শিলা ও তুলসী প্রভৃতির চৈতন্যময় ভাব বিশ্বময় প্রসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বোধিত করেন—এইরূপে সঙ্কীর্ণচেতা সাধকগণের ভ্রম বিদূরিত হয়—তখন তাঁহারা অনুভব করেন, পাহাড় মাত্রই শালগ্রাম, বৃক্ষ মাত্রই তুলসী—সকলই শক্তিময় ভগবৎ সত্তায় পরিপূর্ণ—সকলি চিন্ময় এবং আনন্দময়!!—ইহাই মন্ত্রোক্ত শিলাবৃক্ষাদির আঘাত-রহস্য।

এই মন্ত্রে এবং পরবর্ত্তী কতিপয় মন্ত্রে, পূর্ব্ববর্ণিত মহিষাসুরের আটটী প্রধান সেনাপতি ব্যতীত, আরও আটটী সহকারী সেনাপতির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের ব্যাখ্যাও ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হইবে। সেনাপতি সংখ্যা—(৯) করাল—সন্দেহ ও অবিশ্বাস : আধ্যাত্মিক জগতে শক্তিশালী বিঘ্নসমূহের মধ্যে ইহারা অন্যতম। ভগবান, গীতাতে বলিয়াছেন—"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ; "সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং সুখও নাই"। ভগবৎ দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আসুরিক ক্রিয়াশীলতা কোন না কোন আকারে সাধকগণের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাই শাস্ত্রে আছে,—"ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"—অর্থাৎ ভগবৎ দর্শন হইলে, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই করালরূপী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দুঃখদায়ী অভিব্যক্তি হয় ; তাই সাধকমাত্রই ইহাদের করাল-কবলে পতিত হইয়া দুঃখ পায় ; এজন্য মা, প্রথমে চপেটাঘাত [করতল প্রহার] দ্বারা ইহাদের স্থূলভাব, মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা সূক্ষ্মভাব এবং করাল-দন্তে চর্ব্বণদ্বারা ইহাদের কারণভাব নষ্ট করিয়া দিলেন!—ইহাই মন্ত্রোক্ত দন্ত মুষ্টি ও তল প্রহারের রহস্য।—(১৭)

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৮

উগ্রাস্যমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তথৈবচ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥ ১৯

বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্দ্ধরং দুর্ম্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ২০

সত্য বিবরণ।—দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধত অসুরকে, ভিন্দিপাল-অস্ত্রে বাস্কল অসুরকে এবং বাণসমূহ দ্বারা তাম্র ও অন্ধক

অসুরকে নিহত করিলেন।—(১৮)॥ ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী উগ্রাস্য উগ্রবীর্য্য এবং মহাহনু অসুরকে ত্রিশূল দ্বারা নিহত করিলেন।—(১৯)। দেবী খড়্গ দ্বারা বিড়ালাক্ষের মস্তক দেহ হইতে পাতিত করিলেন এবং বাণ সমূহ দ্বারা দুর্দ্ধর এবং দুর্ম্মুখ নামক অসুরদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। (২০)

তত্ত্ব-সুধা—সেনাপতি সংখ্যা—(১০) উদ্ধত—মোহে দৃঢ়তা বা ঔদ্ধত্ব; উদ্ধত প্রকৃতির সাধকেরা শাস্ত্র-প্রমাণ বা সৎযুক্তি মানিয়া লইতে চাহেনা; ভ্রান্ত বুদ্ধিতে তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে, তাহাই চরম বলিয়া মনে করে। ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায় যে, উদ্ধত ব্যক্তি তাহার কৃতকার্য্য খারাপ হইলেও, উহা স্বীকার করিতে চায় না; বরং আরও জেদ ধরিয়া বলে—'বেশ করেছি'—ইহাও মোহে দৃঢ়তা। এতৎব্যতীত সাধন-জগতে ক্রমোন্নতির চেষ্টা না করিয়া আপাতসুখকর একই প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাবজ্জীবন মুগ্ধ থাকাও বন্ধন সদৃশ; এজন্য এই অবস্থাও অসুর তুল্য—ইহাও মোহময় ঔদ্ধত্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ"। সাধকের মোহময় দৃঢ়তাকে মা, আত্ম-জ্ঞানরূপ গদাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।—তখন সাধক তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহকে শক্তিময় ও চৈতন্যময় বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। বাস্কল বা স্বার্থময় ঐকান্তিক 'মম'ত্ব-বোধকে দেবী ভিন্দিপাল অস্ত্রদ্বারা নিহত করিলেন। দেবীর হস্তে 'ভিন্দিপাল'—ঐক্যবদ্ধ চৈতন্যময়ভাব বা একীভূত জ্যোতিঃস্বরূপ; অর্থাৎ যাহা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূর্ব্বে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা এক্ষণে একমাত্র অত্যুজ্জল জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবৎ কেন্দ্র হইতে সতত উৎসারিত, এরূপ উপলব্ধি হইতে লাগিল!— ইহাই দিব্য ভিন্দিপাল অস্ত্রের কার্য্য।

সেনাপতি সংখ্যা—(১১) তাম্র—স্বেচ্ছাচারিতা; যাহারা শাস্ত্রের

অনুশাসন কিম্বা বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করত নিজেদের 'মনগড়া' ভাবে প্রভাবিত হইয়া, আধ্যাত্মিক-জগতে স্বেচ্ছাপরায়ণ হয়, তাহারাই, তমোগুণময় তাম্র অসুরের কবলে কবলিত। সেনাপতি সংখ্যা—(১২) অন্ধক—আত্ম-দোষ অদর্শী এবং পরছিদ্রান্বেষী ; অপরের দোষদর্শনকারী বা নিন্দাকারী ব্যক্তিগণ আত্ম-দোষ দর্শনে অন্ধ থাকে ; অর্থাৎ তাহা দেখিয়াও যেন দেখে না ; কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী সাধকগণের পক্ষে, অপরের দোষ অনুসন্ধান হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিয়া, আত্মদোষ ত্রুটী বিচ্যুতি সমূহ বিশেষরূপে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং একে একে উহাদিগকে পরমাত্মাতে বা মাতৃ-চরণে ডালি দিয়া বিশুদ্ধ হইতে হইবে। মা, তাম্র ও অন্ধক অসুরদ্বয়কে একলক্ষ্যকারী দিব্য বাণাঘাতে বিনষ্ট করিলেন। মহাশক্তিময় ভগবানই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, সেই সাধক বেধ-বিধি বা সনাতন-ভাব-ধারা উল্লঙ্ঘন করত স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেনা !—পরমাত্মময়ী মায়ের শ্রীচরণ লাভ করাই যাঁহার জীবনের ব্রত বা উপাসনা, সেই সাধকের পরছিদ্র-অন্বেষণের সুযোগ বা সময় কোথায় ?—ইহাই মন্ত্রোক্ত বাণদ্বারা তাম্র ও অন্ধককে লয় করার তাৎপর্য্য ও রহস্য ।—(১৮) ॥

সেনাপতি সংখ্যা—(১৩) উগ্রাস্য—ঈশ্বরবিহীন সাধনা বা নাস্তিকতা ; যাঁহারা আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের মহান্ উদার ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রভাবিত হয় এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে ; কিম্বা একমাত্র নিরাকারবাদ বা শূন্যবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক, ভগবানের শক্তিময় এবং রসময় সাকার বিভূতি সমূহ অগ্রাহ্য করে বা নিন্দা করে, তাঁহারাই উগ্রাস্য অসুরের প্রভাবে অহঙ্কৃত এবং বিভ্রান্ত। আবার কোন কারণে, সাধনায় বিফল বা ভগ্নমনোরথ হইলেও, কোন কোন সাধকের চিত্তে নাস্তিকতা প্রকাশ পায় এবং ভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাস আসে—

ইহাও উগ্রাস্যের প্রভাব। বিশেষতঃ ভগবৎ ভক্তিতেই মানুষের মস্তক অবনত হয়, আবার নাস্তিকতা দ্বারা প্রভাবিত হইলে, উচ্চ শির কোথাও নম্র বা নত হইতে চায়না; উহা উগ্রাস্যের প্রভাবে আরও উগ্রভাব ধারণ করে। [যাহার আস্য বা বদন উগ্র ভাবাপন্ন তাহার নাম উগ্রাস্য]।

সেনাপতি সংখ্যা—(১৪)—উগ্রবীর্য্য—আশঙ্কা এবং ভয়; ভাবী ভয় বা তজ্জনিত দুশ্চিন্তার নাম 'শঙ্কা' বা আশঙ্কা, যথা—"এই অসুখ যদি ভাল না হয়," "এই কার্য্য যদি সফল না হয়" ইত্যাদি অনাগত বিষয়ের জন্য চিন্তা; এই প্রকারে ভাবী ভয়ের আশঙ্কা করিলে. অশান্তি ব্যতীত কোন প্রকার শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। এতৎ ব্যতীত অষ্ট-পাশের সর্ব্বপ্রধান পাশ ভয়; ইহা অতীব শক্তি শালী, এজন্য নাম 'উগ্রবীর্য্য'। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্ববিধ ভয়ের প্রধান কারণ মৃত্যু; কেননা—সাপকে ভয় করি কেন?—'সাপে কামড়াইলে মরিয়া যাইব'—বাঘ ভালুক এবং ভূত প্রেতাদির ভয় সম্বন্ধেও মৃত্যুই একমাত্র কারণ। এই মৃত্যু-ভয় ভাবটীর স্বরূপ কি?—ইহা আত্ম-অস্তিত্ব নাশের কাল্পনিক আশঙ্কা জনিত মানসিক বিকার মাত্র!—আত্মার অমরত্বে বা অমৃতত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, মৃত্যু-ভয়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারেনা; সুতরাং সাধককে ভাবী এবং বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ ভয় হইতে বিমুক্ত হইতে হইবে। বিশেষতঃ গীতাতে ভগবান, মৃত্যুকে 'জীর্ণ বস্ত্র' পরিবর্ত্তনের সহিত তুলনা করিয়াছেন! মানুষের শরীরের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্রতম উপকরণও সতত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে!—মৃত্যুরূপ বিসর্গ দ্বারাই নব নব সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ হইতেছে! সুতরাং আধ্যাত্মিক পথে উন্নতিকামী সাধককে ভয়জনিত বিভীষিকা বিদূরিত করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী শিবরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী, ব্রহ্মজ্ঞানময় ত্রিশূল দ্বারা উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য এবং মানসিক বিকাররূপ 'মহাহনু' প্রভৃতিকে বধ করিলেন। নাস্তিকতা, ভয় এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে বিকারগ্রস্ত

হওয়া, এই তিনটী আসুরিক ভাবই অজ্ঞানতামূলক চিত্ত-বিকার হইতে সঞ্জাত, এজন্য জ্ঞানময়ী ত্রিনয়নী মা ত্রিশূলরূপ দিব্য-জ্ঞান দ্বারা উহাদের আসুরিক বিকার সমূহ দেবভাবে পরিবর্ত্তিত করিলেন।—(১৯)

বিড়ালাক্ষরূপী কুটিলভাবকে মা জ্ঞানের অসি দ্বারা সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ডিত করিয়া অর্থাৎ জড়ত্ব এবং অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত করিয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কেননা কুটিলতা থাকিতে আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রম-বিকাশ হইতে পারেনা; সুতরাং কথায় কাজে দ্বিভাবাপন্ন না হইয়া মনে প্রাণে সরলতা এবং ঐক্যভাব রক্ষা করা প্রয়োজন।

সেনাপতি সংখ্যা—(১৫) দুর্দ্ধর—ধৈর্য্যহীনতা, ইহা সাধন-পথে একটী সর্ব্বপ্রধান বিঘ্নস্বরূপ; সাধন করাবস্থায় নানাপ্রকার নিরস কঠিন ও বিঘ্ন সঙ্কুল স্তর, প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী উপস্থিত হইয়া থাকে; ধৈর্য্য এবং সতর্কতার সহিত ঐ সকল স্তর ক্রমে অতিক্রম করিতে হয়; কিন্তু ধৈর্য্যের অভাবে বহু অনর্থ উৎপাদিত হইয়া থাকে। সাধনায় অধৈর্য্য হইলে ক্রমে সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিয়া চিত্ত অধিকার করিবে এবং বহুদিনের অভ্যস্ত বা আয়ত্তীকৃত সাধনা একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে!—তন্নিমিত্ত সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রও মরুভূমিতে পরিণত হইবে। সুতরাং অধৈর্য্যরূপী অসুরকে দলন করিতেই হইবে। ধৈর্য্যকে দুঃখে বা অতি কষ্টে ধারণা করিতে হয়; কিংবা দুস্তর ধৈর্য্য-সাগর পার হওয়া সুকঠিন, এজন্য মন্ত্রে উহাকে 'দুর্দ্ধর' বলা হইয়াছে।

সেনাপতি সংখ্যা—(১৬) দুর্ম্মুখ—পারুষ্য বা রুক্ষতা; ক্রমোন্নতি-কামী সাধকের চিত্ত-ভূমি কর্কশ বা কঠিন রাখিলে চলিবেনা—উহাকে ভগবৎ লীলামৃত, নামামৃত এবং রূপ-ধ্যানাদি দ্বারা ক্রমে সরস প্রাণময় ও মধুময় করিয়া তুলিতে হইবে; বিশেষতঃ যে সাধকের আত্ম-রাজ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বময় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দ্বারা যাঁহার মহাপ্রাণ জাগ্রত, সেই সাধকের রুক্ষ বা কটু বাক্য প্রয়োগ দ্বারা অপরের দুঃখ উৎপাদন

করার সম্ভাবনা কোথায় ? তবে স্বভাবতঃ যদি কোন সাধকের বাক্যে বা ব্যবহারে রুক্ষতা থাকে, তবে ভগবৎ পাদ-পদ্মরূপ একলক্ষ্যে শরবৎ অনন্স্থির করিতে পারিলে, তাহা ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইবে, দুর্ম্মুখ সুমুখ হইবে; তখন সেই সাধক, সর্ব্বদা সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিতে অভ্যস্ত হইবে। এই সব কারণে মা, দুর্দ্ধররূপ অধৈর্য্যকে এবং দুর্ম্মুখকে একমুখী লক্ষ্যকারী দিব্য শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, অর্থাৎ উহাদের আসুরিক ক্রিয়াশীলতাকে চিরতরে উপশমিত করিলেন ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অনাহত-পদ্মস্থিত প্রাণময় বিশিষ্ট অসুরগণকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া একে একে নিজ চিন্ময় দেহে লয় করিলেন।

বিশেষ রহস্য—অহংতত্ত্বের রাজস অংশে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং তামস অংশে রূপ-রসাদি বিষয়-পঞ্চক উদ্ভব হইয়াছে; অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বিষয় এই ষোড়শ তত্ত্ব, মূল অহংতত্ত্ব হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অহংকাররূপী মহিষাসুরের পূর্ব্ব কথিত আটজন সেনাপতি এবং আটজন সহকারী সেনাপতি, মোট **ষোলজন** বিশিষ্ট অসুরকে উপরোক্ত ষোড়শ-তত্ত্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কোন কোন প্রাচীন টীকাকার এরূপও ইঙ্গিত করিয়াছেন। যে ভাবেই আস্বাদন করা যাউক না কেন, সকল ভাবই সুন্দর এবং আস্বাদ্য।—(২০)

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্॥ ২১
কাংশ্চিৎ তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্। ২২
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ২৩

সভ্য বিবরণ। এইরূপে স্বীয় সৈন্যগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে

মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই দেবী নিশ্বাস জাত প্রমথ সৈন্যগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।—(২১)॥ কতকগুলি গণকে তুণ্ডাঘাতে কতকগুলিকে খুরাঘাতে, কতক লাঙ্গুলাঘাতে, কতকগুলিকে শৃঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া, কতকগুলি গণ্ডিবেগদ্বারা, কতকগুলিকে ভীষণ গর্জ্জনদ্বারা কাহাকে কাহাকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণদ্বারা এবং অন্য কতক গণকে নিশ্বাস পবনদ্বারা ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল।—২২।২৩

তত্ত্ব-সুধা। রজোগুণের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি অহংকাররূপী মহিষাসুর, স্বপক্ষীয় বৃত্তি, ভাব এবং অনুভাব সকল বিমর্দ্দিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ মহিষ-মূর্ত্তি ধারণ করিল; এইরূপে পূর্ণ বিকশিত হইয়া, প্রাণময় ক্ষেত্রটী বিক্ষোভিত এবং দেব-ভাব সমূহকেও দলন করিতে আরম্ভ করিল। অহংতত্ত্বের রাজস অংশ হইতেই একাদশ ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব—ইহা শাস্ত্র-সম্মত সত্য; অহমিকার পরিপুর্ণ মূর্ত্তি মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হওয়ায়, তদীয় গুণসমূহও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং তৎসহ রজোগুণজাত ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সমুহও বিক্ষোভিত হইল। তখন মহিষ ত্রিগুণ এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চভূতাত্মক প্রপঞ্চ বা জল স্থল নভোমণ্ডলাদি উদ্বেলিত ও প্রকম্পিত করিয়া, দেব-বৃত্তিরূপী প্রমথ সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। মহিষাসুর অষ্টবিধ উপায়ে সাধকের ধর্ম্ম-ক্ষেত্রস্বরূপ দেহ-ক্ষেত্রকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল; তন্মধ্যে প্রথম তিনটীতে ত্রিগুণের বিকাশ এবং অবশিষ্ট পাঁচটীতে, পঞ্চতত্ত্বের বিচিত্র বিকাশ হইয়াছে, ইহা নিম্নে ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) **তুণ্ড-প্রহার**—তুণ্ড বা মস্তকই সত্ত্বগুণময় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতির আশ্রয়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে—ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ, নির্ম্মল এবং শক্তিময় অস্ত্রস্বরূপ; উহারা দেব-ভাবে পরিচালিত হইলে জগন্মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করে, আবার আসুরীভাবে পরিচালিত হইলে, উহারাই জ্বালাময় অত্যাচার প্রসব করে। সুতরাং মহিষাসুর জ্ঞানাঙ্গ

স্বরূপ তুণ্ড বা আসুরিক বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা দ্বারা সাধকের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় ভাবসমূহ বিলয়ের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল! মহিষাসুরের অষ্টবিধ কার্য্যের বিশেষ ফল পরবর্ত্তী মন্ত্র সমূহে বিবৃত হইয়াছে; তদ্বারা দেখা যাইবে যে, সে শৃঙ্গ সমন্বিত মস্তক দ্বারা পর্ব্বত সকল অর্থাৎ পর্ব্বত-প্রমাণ ভোগাসক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি উচ্চে (বুদ্ধিক্ষেত্রে) নিক্ষেপ করিয়া সাধকের সত্ত্বগুণময় অবস্থা নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। (২) খুর-ক্ষেপণ—ইহা পশ্বাদি চতুষ্পদ জন্তুর স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহাতে রজোগুণময় ক্রিয়াশক্তির বিকাশ। পরবর্ত্তী মন্ত্রে আছে, মহিষাসুর খুরদ্বারা মহীতল বা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতেছিল; প্রাণময় ক্ষেত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিরত সাধক, বিশ্বের সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভাবে শক্তিময় প্রাণের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই পৃথিবীর মাটী যে সেই জগদম্বা মা-টী,, তাহা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া সানন্দে প্রার্থনা করিতেছেন—"মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং"—"হে জগজ্জননি বসুন্ধরে! আমি যে সমস্ত পাপ বা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি হরণ কর।" এক্ষণে সাধকের এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানময় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ভাব সমূহকে মহিষাসুর, খুর-ক্ষেপণরূপ রজোগুণময় ক্রিয়াশীলতা দ্বারা বিদীর্ণ বা খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল!—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য। (৩) লাঙ্গূলাঘাত—লাঙ্গূলটীদ্বারা পশুগণের রস বা আনন্দের অভিব্যক্তি হয়; কেননা কোন কারণে আনন্দ অনুভব করিলে, গবাদি পশুগণ ধ্বজের ন্যায় ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া দৌড়াইতে থাকে; এজন্য লাঙ্গূলে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের বিকাশ দৃষ্ট হয়। সাধক পূর্ব্বে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপময় ক্ষেত্রে একরস আনন্দ ভোগ করিয়াছেন; তৎপর মহাশক্তি মায়ের কৃপায় তাঁহার মহাপ্রাণ জাগ্রত হওয়ায়, সর্ব্বত্র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া একরস চিদানন্দের অভিব্যক্তি হইয়াছে! তাই এক্ষণে মহিষাসুর সাধকের সমুদ্রবৎ বিশাল

পরমানন্দকে তমোগুণময় লাঙ্গুলাঘাত দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পরিচ্ছিন্ন বিষয়-মধু পানে প্রমত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

মহিষাসুর প্রথমে আসুরিক ত্রিগুণের বিকাশ করার পর, ক্রমে সাধকের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতময় দেহকেও বিক্ষোভিত করিতে লাগিল। মহিষাসুর (১) গর্জ্জন দ্বারা; (২) শৃঙ্গ দ্বারা; (৩) ভ্রমণ দ্বারা, (৪) নিশ্বাস-পবন দ্বারা এবং (৫) বেগ (মল-মূত্রাদি ত্যাগ) দ্বারা গণসৈন্যরূপী দেবভাব সমূহকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিল—ইহাতে যথাক্রমে শব্দময় আকাশতত্ত্ব, স্পর্শময় বায়ুতত্ত্ব, রূপময় তেজতত্ত্ব, রসময় অপ্ তত্ত্ব এবং গন্ধময় পৃথ্বিতত্ত্বের বিক্ষোভ হইয়াছিল! অর্থাৎ উক্ত পঞ্চভাবের আক্রমণে একদিকে যেমন শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন এবং আঘ্রাণ এই পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্বেলন প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনি অপর দিকে উপরোক্ত পঞ্চবিধ কার্য্যে বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ এবং পায়ু এই পঞ্চবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও বিক্ষোভ হইয়াছিল; ইহা ক্রমে দেখান যাইতেছে—(১) নাদ বা গর্জ্জন—নাদ বা গর্জ্জনে শব্দময় আকাশ-তত্ত্বের অভিব্যক্তি আর গর্জ্জনাদি বহির্ম্মুখী শব্দও বাক্‌রূপী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পরিব্যক্ত হয়। সাধক অন্তর্ম্মুখীভাবে ওঙ্কাররূপী প্রণব-ধ্বনি বা নাদ শ্রবণে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং বহির্জ্জগতের সমবেত ধ্বনিতেও ঐ প্রকার ঐক্যতানযুক্ত প্রণব-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন; কিন্তু মহিষাসুর গর্জ্জন বা বহির্ম্মুখী জাগতিক শব্দময় কোলাহলাদি উৎপাদন করিয়া সাধকের তন্ময় ও একাগ্রভাব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল—ইহাদ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ সূচিত হয়—ইহাই তাৎপর্য্য।

(২) শৃঙ্গ দ্বারা—পরবর্ত্তী মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মহিষাসুর শৃঙ্গ দ্বারা ঘন বা মেঘ সকলকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল; ব্যবহারিক জগতে বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়াই মেঘসকল খণ্ড-বিখণ্ড বা ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং শৃঙ্গদ্বারা আঘাত উক্তিতে স্পর্শময় বায়ুতত্ত্বের অভিব্যক্তি সূচনা করে। আর পশ্বাদি শৃঙ্গধারী জন্তুসমূহ শৃঙ্গদ্বারাই হস্ত বা আদান-প্রদানাদি শক্তির কার্য্য করিয়া থাকে; শৃঙ্গের সাহায্যেই উহারা কোন বস্তু উঠাইয়া দূরে নিক্ষেপ করে; আবার বিদারণাদি কার্য্যেও উহারা শৃঙ্গদ্বারা অস্ত্রাদির মত কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য মহিষাসুরের উপরোক্ত কার্য্যে হস্ত বা পাণীন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ হইয়াছিল। (৩) ভ্রমণদ্বারা—ব্যবহারিক জগতে ভ্রমণদ্বারাই দর্শনেন্দ্রিয়ের সার্থকতা হয়, দেশ-ভ্রমণদ্বারা একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেইরূপ অপরদিকে নানাবিধ উপভোগ্য এবং দর্শনযোগ্য বিষয়াদির দর্শনদ্বারা নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয়; এজন্য দেশ ভ্রমণদ্বারা দর্শনাদিতে, রূপময় তেজতত্ত্বের অভিব্যক্তি; আবার তেজস্বী না হইলে দেশ ভ্রমণও নিরাপদ নহে, সুতরাং মহিষাসুর ভ্রমণদ্বারা রূপময় তেজ-তত্ত্বের বিক্ষোভ উপস্থিত করিয়াছিল। আর পাদদ্বারাই ভ্রমণ বা গতি-শক্তির বিকাশ হয়; সুতরাং মহিষাসুরের ভ্রমণে 'পাদ' ইন্দ্রিয়ও সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

(৪) নিশ্বাস-পবন দ্বারা—বায়ুই সাধনার প্রাণ; বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হইয়া পড়ে, তখন সাধকের মন-প্রাণ 'আপময়' বা একরস আনন্দ অনুভব করে!—এই অবস্থায় জগতের কোনরূপ বৈষয়িক চাঞ্চল্য সেখানে সহজে প্রবেশ করিতে পারেনা; কুম্ভকের অবস্থায় সাধকের আপনা হইতে প্রত্যাহার হইতে থাকে এবং বিশিষ্ট আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিরত সাধকের চিত্তও আনন্দ-রসে ভরপূর হয় এবং তাঁহার প্রাণবায়ুও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এইসব কারণে নিঃশ্বাসের সহিত রসতত্ত্ব বা রসময় অপ্‌তত্ত্বের সম্বন্ধ বিজড়িত। আহার-বিহারাদি সর্ব্ববিধ ভোগময় কার্য্যাবলীতেও প্রাণ বায়ুর বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতির বিশেষরূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে।

মদনের শরাঘাতে বিদ্ধ হইলে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হয়; এজন্য মহিষাসুরের আসুরিক প্রাণময় সুদীর্ঘ নিশ্বাসাদির অভিব্যক্তিতে 'উপস্থ'রূপ কর্ম্মেন্দ্রিয় বিক্ষোভেরও চেষ্টা সূচনা করে। (৫) বেগ দ্বারা—অবিচারে যে কোন স্থানে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করা পশুগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা প্রকৃতি; সুতরাং মহিষাসুরও মলমূত্রাদি সবেগে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীকে ক্ষুন্ন এবং গণ সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিয়াছিল—অসুরের এই কার্য্যে গন্ধময় পৃথ্বিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছিল! আর বলা বাহুল্য যে, ইহাতে 'পায়ু' ইন্দ্রিয়ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সাধারণতঃ মল-মূত্র দির বেগ ধারণ করা সুকঠিন; এজন্য ঐরূপ বেগেতেও যে বিশেষ শক্তির বিকাশ, ইহা অস্বীকার করা যায়না; মহিষাসুর, প্রশান্ত এবং আনন্দরসে আপ্লুত ও তন্ময়তাপ্রাপ্ত সাধকের স্থূল-দেহে মল-মূত্রাদির বেগ-শক্তিকে উদ্দীপিত বা সংক্ষুব্ধ করিয়া সাধন কালীন তাঁহার আনন্দ-ভাবকে ভূমিতে অর্থাৎ নিম্নস্তরে জড়ত্বে বা নিরানন্দে পাতিত করিতে চেষ্টা করিল—ইহাও অনুরূপ তাৎপর্য্য।—(২১—২৩)

নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা॥ ২৪

সত্য বিবরণ।—সেই মহিষাসুর প্রমথ-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া মহাদেবীর সিংহকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল; তাহাতে অম্বিকা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।—(২৪)

তত্ত্ব-সুধা।—মহিষাসুর দেববৃত্তি সমূহকে পীড়িত করিয়া মহাদেবীর শ্রীচরণাশ্রিত তেজস্বী ধর্ম্ম-ভাব সমষ্টিরূপ সিংহকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল; কেননা সাধকের ধর্ম্মভাবকে আঘাত করিয়া কোন রূপে আসুরিকভাবে উহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই, অবিদ্যা পরিচালিত মহিষাসুরের উদ্দেশ্য বা দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা দেখিয়া জগন্মাতা অম্বিকা কোপ প্রকাশ করিলেন। সাধকের ধর্ম্মাচরণ এবং

ধৰ্ম্মভাব সমূহ সমস্তই মহাশক্তি মায়ের পদতলে সমর্পিত; সুতরাং শরণাগত সাধকের সাধনাদি বিষয়ে নিজস্ব ধৰ্ম্ম-কার্য্য আর কিছুই নাই! তথাপি ইচ্ছাময়ী জগন্মাতার ইচ্ছা পরিপূরণার্থে এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে, সাধক আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অবতরণ করিয়াছেন, সুতরাং শরণাগত ভক্তের বিপদ দেখিয়া অম্বিকা মা ক্রুদ্ধা হইলেন।

চণ্ডী-লীলায় এই মন্ত্রেই সর্ব্বপ্রথমে মায়ের ক্রোধময়ী চণ্ডী-মূর্ত্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে। 'চণ্ডী' শব্দের সাধারণ অর্থ ক্রুদ্ধা হইলেও, উহা মায়ের বহিরঙ্গ ভাব; কেননা তিনি একদিকে যেমন 'বজ্রাদপি কঠিন' প্রচণ্ডতাময়ী, আবার অন্যদিকে তিনি কুসুম হইতে কোমলা, প্রেমানন্দ-বিহ্বলা এবং করুণার পারাবার! তাই আমরা মায়ের কোপ পূর্ণা কালীমূর্ত্তিতে দেখিতে পাই—একদিকে রক্তাক্ত অসি, রক্তধারা প্রবহমান দানবমুণ্ড এবং মুখ-মণ্ডলে লেলিহান্ জিহ্বা; আবার অন্যদিকে মা বরাভয় করা ভক্ত-মনোহরা মৃদুমন্দ হাস্যাধরা! শরণাগত ভক্তের জন্যই মা অতি তেজস্বিনী এবং সর্ব্বলয়কারিণী ক্রুদ্ধা বা চণ্ডীভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন। প্রথম চরিত্রে—মায়ের প্রচণ্ডতাময়ী বা চণ্ডীভাবের বিকাশ হয় নাই—এজন্য সেখানে মা, কুমারী রূপিণী গায়ত্রী। মধ্যম চরিত্রে —মায়ের চিন্ময় দেহ সর্ব্বদেবগণের শক্তি বা তেজদ্বারা সুগঠিত; এজন্য এখানে মায়ের অতিতেজস্বিনী যুবতী চণ্ডিকা মূর্ত্তির বিকাশ। আর উত্তম চরিত্রে—মহাকারণরূপিণী মায়ের সর্ব্বলয়কারিণী প্রলয়ঙ্করী জ্ঞান বৃদ্ধা চণ্ডিকা মূর্ত্তির বিচিত্র ও বিভিন্ন অভিব্যক্তি! শরণাগত, ভক্তের বিপদ দেখিয়া স্নেহময়ী মা কুপিতা হইয়াছেন; সুতরাং অসুর নিধন অনিবার্য্য এবং অপরিহার্য্য; কেননা, মা যে—"শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণা"! আবার মায়ের কোপে সকলই সম্ভব! তাই সাধক গাহিয়াছেন—"কোপ আঁখির নিমিষে, জলে গিরি মিশে, খসে চন্দ্র-সূর্য্য শ্বাসে হয় প্রলয়।—(২৪)

সোঽপি কোপান্মহাবীর্য্যঃ খুরক্ষুন্নমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ব্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ২৫
বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্য্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ব্বতঃ॥ ২৬
ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ। ২৭

সভ্য বিবরণ। সেই মহাবীর অসুরও ক্রোধে খুরদ্বারা মহীতল বিদীর্ণ করিয়া শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা [দেবীর প্রতি] উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল।—(২৫)॥ পৃথিবী তদীয় বেগ ভ্রমণে বিশেষরূপে ক্ষুণ্ণ (দুঃখিত) ও বিশীর্ণ হইল; তদীয় লাঙ্গূলাঘাতে সমূদ্র চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল। (২৬)॥ মেঘসকল তাহার ইতস্ততঃ চালিত শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল; নিশ্বাস বায়ুদ্বারা শত শত পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। (২৭)॥

তত্ত্ব-সুধা। খুরদ্বারা মহীতল বিদীর্ণ করায় আসুরিকভাব এবং গর্জ্জনের তাৎপর্য্য ইতিপূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শৃঙ্গদ্বারা (শৃঙ্গ শোভিত মস্তক * দ্বারা অর্থাৎ আসুরিক বুদ্ধির প্রভাবে), মহিষাসুর পর্ব্বত সমূহ উচ্চে নিক্ষেপ করিতে লাগিল—সাধকের জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত সংস্কার ও সূক্ষ্ম কর্ম্মরাশিকে রজোগুণময় উদ্বেলন দ্বারা প্রাণময় ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া মহিষাসুর সাধককে তাঁহার ধর্ম্ম-ভাব হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। —মন্ত্রোক্তির ইহাও অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য॥ ভ্রমণে গতি-শক্তির চাঞ্চল্যময় ভাব নিহিত আছে; এজন্য মহিষ, সাধকের স্থির ও তন্ময়তা

---

* মহিষাসুরের অষ্ট প্রকার কার্য্য বর্ণনায়, এই মন্ত্রাবলীতে 'শৃঙ্গ' শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার প্রথমটী—পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত "তুণ্ড-প্রহার" রূপে ধরিতে হইবে; আর দ্বিতীয়টী শৃঙ্গরূপেই গণ্য করা কর্ত্তব্য; কেননা সেখানে শৃঙ্গের বিশেষণ রহিয়াছে 'ধুত' বা কম্পন।

প্রাপ্ত প্রশান্তভাবকে ভ্রমণরূপ গতি-শক্তির ইতস্ততঃ চাঞ্চল্য দ্বারা বিক্ষুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। আর লাঙ্গুলাঘাতরূপ রস তত্ত্বের পরিচ্ছিন্ন উদ্বেলন দ্বারা দেহস্থ আনন্দময় কোষরূপ রস-সমুদ্রকে আলোড়িত ও তরঙ্গায়িত করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিতে লাগিল। মহিষাসুর শৃঙ্গ-কম্পনরূপ বিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তিদ্বারা দেহস্থ মেঘরূপ বিদ্যুৎ-শক্তির রসময় কেন্দ্রটী যাহা এতক্ষণ সাম্য ও নিশ্চল অবস্থায় ছিল, তাহাকে কম্পনের গতি-বেগদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিল— অর্থাৎ দেহস্থ তড়িৎকেন্দ্র আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ করিয়া বিভিন্ন তড়িৎ-প্রবাহের রস-চাঞ্চল্য প্রবৃত্ত করিল। অতঃপর কুম্ভকে প্রাণবায়ু স্থির প্রাপ্ত সাধকের চিদাকাশে, জাগতিক বা বৈষয়িক বহির্মুখী তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাসকে দীর্ঘ ও ঘন সঞ্চরণশীল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল—ইহাই 'ভূপাতিত করা'। মন্ত্রোক্তি সমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য, এইসকল কার্য্যাবলীতে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত।

বিশেষ রহস্য—মহিষাসুরের যুদ্ধ ব্যাপারে সাধকের শরণাগতি মূলক ভাবসমূহ সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ করার তত্ত্ব ও রহস্য নিহিত আছে। যথা—(১) **তুণ্ডপ্রহার**—জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তকে সত্ত্বগুণময় ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সমূহকে শক্তিময় বা মাতৃময়রূপে অনুভব করাই দেহস্থ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সর্ব্বোত্তম কার্য্য—ইহাই তুণ্ডপ্রহার; অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত সাধক সাক্ষীরূপে স্বকীয় মন বুদ্ধি অহং চিত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যাবলী দর্শন করেন এবং উহাদিগকে ইচ্ছাশক্তিময়ী মায়ের কার্য্য, কিম্বা মাতৃময় ও শক্তিময় বলিয়া অনুভব করেন। (২) **খুরাঘাত**—প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী সাধক রজোগুণের সর্ব্ববিধ ক্রিয়াশীলতাকে ক্রিয়াশক্তি-রূপিণী মায়ের শক্তিময় কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি করেন—ইহাই রজোগুণময় খুরাঘাত। (৩) **লাঙ্গুলাঘাত**—সাধক রূপ-রসাদি তমোগুণময় বিষয়-সংযোগে যে পরিচ্ছিন্ন আনন্দ প্রাপ্ত হন,

উহা যে মহাকারণরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃ-আধার হইতেই সতত উৎসারিত এবং উহা যে একীভূত ভূমানন্দেরই বহির্মুখী অনন্ত বিকাশের একটী ধারা বা আনন্দ স্পন্দন, ইহা আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। দেহস্থ শক্তিরূপা অষ্টধা-প্রকৃতির প্রধান শক্তি অহংকারই ঐ সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিষয়-মধু পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন!—উহাতে আত্মারূপী আমি সাক্ষী মাত্র; কেননা কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ভোর্ক্তৃত্বাভিমান প্রকৃতির, উহা আমার নহে! —এবম্বিধ জ্ঞান-শক্তির আত্ম-জ্ঞানময় কার্য্যাবলীই লাঙ্গুলাঘাত।

(৪) নাদময় গর্জ্জন—সর্ব্ববিধ জাগতিক শব্দ বা কোলাহলকে ঐক্য বদ্ধ প্রণব-ধ্বনিরূপে আস্বাদন করাই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা। প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা যাঁহার জীবন মধুময় হইয়াছে, তাঁহার নিকট বাহ্য প্রকৃতির অনন্ত কলরব, কিম্বা পারিপার্শ্বিক শব্দময় কোলাহলও বীণার সুমধুর ঝঙ্কারবৎ আনন্দপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (৫) শৃঙ্গাঘাত—শৃঙ্গদ্বারাই আদান প্রদান হয়—এজন্যে ইহাতে প্রত্যাহার সাধনার ভাব নিহিত আছে। মহিষাসুর শৃঙ্গাঘাত দ্বারা পর্ব্বত সমূহকে আকাশে নিক্ষেপ করিয়াছিল—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পারিপার্শ্বিক বা বৈষয়িক পর্ব্বতপ্রমাণ কর্ম্ম সমূহকে আকাশ-তত্ত্বে উঠাইতে হইবে, অর্থাৎ উহাদের সহিত আকাশবৎ নির্লিপ্ত অনাসক্ত ও নিঃসঙ্গভাব রক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে! পক্ষান্তরে, বিষয়কে শক্তিময় মাতৃরূপে সেবা করিতে হইবে। (৬) ভ্রমণ—স্থূলভাবে—বাহ্য জগতে বিচরণ বা ভ্রমণাদিজনিত রূপ-রসাদি বিষয় ভোগেও মাতৃ-স্তন্য পানের আস্বাদন অনুভব করিতে হইবে; সূক্ষ্মভাবে—চিন্তাসমূহের ভ্রাম্যমান্ গতি-শক্তি সমূহকে মাতৃময় শক্তিরূপে গণ্য ও অনুভব করিয়া মনঃস্থির করিতে হইবে! —রামপ্রসাদের উক্তি "যত দেখ নেত্র-পুটে সবই মায়ের চিত্র বটে"—ইহাই প্রকৃত দর্শন! ইহাই প্রেমময়ী জগদম্বা মায়ের

বিশ্বব্যাপী প্রেম-মহাযজ্ঞে সাধকের আত্মাহুতিদ্বারা অপূর্ব্ব সম্বেদন লাভ!

(৭) নিশ্বাস পবন—নিজ নিজ নিশ্বাস প্রশ্বাসকে জীবন রক্ষাকারী মহাপ্রাণময়ী শক্তি বা জগদ্ধাত্রীরূপে অনুভব করিতে হইবে!—পবন-হিল্লোলের শান্তিপ্রদ পরশকে চিন্ময়ী-মায়ের আত্ম-হারা স্নেহময় সুকোমল পরশ জ্ঞানে পুলকিত হইতে হইবে! প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী সাধকের প্রাণ-বায়ু কুম্ভকেই থাকুক, কিম্বা গতিবিশিষ্টই হউক, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? কেননা তাঁহার নিকটে সবই যে ব্রহ্মময় মাতৃময় এবং শক্তিময় ভগবৎভাবে পরিপূর্ণ। (৮) বেগ—মল-মূত্রাদির বেগ এবং উহাদের ত্যাগ দ্বারা যেমন স্থূল দেহের শুদ্ধি সম্পাদন করা হয়, সেইরূপ চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ না হইলে সত্য-প্রতিষ্ঠা এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। সুতরাং পঞ্চভৌতিক দেহকে সাধনদ্বারা কিম্বা ভূতশুদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়াদ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া জীবভাবকে পরমভাবের সহিত মিলন করাইতে হইবে! এইরূপে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহা অশুদ্ধ বোধে পূর্ব্বে বিচার দ্বারা বা অন্য কোন কারণে ত্যাগ করা হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মময় আত্মময় এবং সচ্চিদানন্দময়!! —(২৫-২৭)

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ॥ ২৮

সত্য বিবরণ। তখন সেই চণ্ডিকা ক্রোধোদ্দীপ্ত মহিষাসুরকে এইরূপে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য কোপ করিলেন —(২৮)।

তত্ত্ব-সুধা। এখানে মা দ্বিতীয়বার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন; তাই ঋষি, মন্ত্রে অম্বিকা মাতাকে 'চণ্ডিকা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধক যখন অসুরের নির্য্যাতন বা অত্যাচার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া অতি দুঃখিত হন এবং পরমাত্মময়ী মাতৃ-চরণে শরণাগত হন, তখনই

মায়ের প্রচণ্ডতাময়ী ক্রোধ-মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (২৮)

সা ক্ষিপ্ত্বা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে ॥ ২৯
ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবৎ তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩০
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ শায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ ॥ ৩১
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩২
ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৩

সত্য বিবরণ। চণ্ডিকা দেবী অসুরের উদ্দেশে পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন; সেই মহাযুদ্ধে মহাসুর পাশবদ্ধ হইয়া মহিষরূপ ত্যাগ করিল ॥—(২৯)॥ অনন্তর সে তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল; অম্বিকা সিংহরূপধারী মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করা মাত্র, সে খড়্গপাণি পুরুষরূপে দৃষ্ট হইল॥ —(৩০)। তৎক্ষণাৎ দেবী খড়্গ ধারণ করিল॥—(৩১)॥ গজরূপী সেই অসুর শুণ্ডদ্বারা মহাসিংহকে আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জন করিতে লাগিল; দেবী খড়্গদ্বারা সিংহাকর্ষণকারী সেই মহাগজের শুণ্ড ছেদন করিলেন ॥—(৩২) অনন্তর মহিষাসুর পুনরায় মহিষ-দেহ অবলম্বন করিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় চরাচর ত্রিলোক বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল ॥—(৩৩)॥

তত্ত্ব-সুধা।—মা যখন বন্ধনের জন্য ইচ্ছা করেন, তখন মাতৃ-হস্তস্থিত পাশটি বন্ধন-রজ্জুরূপে ক্রিয়াশীল হয়; আবার যখন তিনি মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই পাশই প্রেম-রজ্জুরূপে পরিণত

হইয়া থাকে। অহংকাররূপী মহিষাসুর মায়ের প্রেম-রজ্জুতে ধরা পড়িলনা, কিন্তু সিংহরূপ ধারণ করত আরও শক্তিশালী হইয়া প্রকটিত হইল; [কেননা প্রাকৃতিক নিয়মে মহিষ তৃণ-ভোজী, আর পশুরাজ সিংহ মাংসাশী এবং অধিক শক্তিশালী]। তখন দেবী, সিংহের মস্তক ছেদন দ্বারা তাহার অজ্ঞানতাকে পৃথক্ করিয়া দিলে, মহাসুর আসুরিক খড়্গাধারী তেজস্বী নর-দেহ ধারণ পূর্ব্বক আরও শক্তিশালীরূপে প্রতিভাত হইল। তৎপর দেবী দিব্য বাণাঘাতে তাহার আসুরিক ভাব সমূহ ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া দিলেন; তখন সে তদপেক্ষা শক্তিশালী মহাগজরূপে আত্ম-প্রকাশ করিল। সাধারণ গজ বা হস্তী সিংহকে ভয় পায় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে সিংহ গজকেই আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু এখানে মহাগজ শুণ্ডদ্বারা সিংহকেই আকর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। —এই বিপরীত ভাব মহাগজাসুরের অতিশয় শক্তিমত্তার পরিচায়ক্। মহাগজাসুর দেবী-বাহন সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী সিংহকে আক্রমণ করিলে, দেবী জ্ঞানময় খড়্গ দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন। তখন সে পুনরায় মহিষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অষ্টবিধ উপায়ে ত্রিলোককে বিক্ষুব্ধ করিতে লাগিল। যৌগিক ব্যাখ্যায়—ত্রিলোক অর্থে এখানে মণিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধ-চক্র: কেননা এক্ষণে অনাহত-চক্রেই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হইতেছে; সুতরাং স্বর্গবৎ উর্দ্ধে অবস্থিত বিশুদ্ধ-পদ্ম এবং পাতালবৎ নিম্নে অবস্থিত মণিপুর-পদ্মটীই বিশেষরূপে আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইল বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ মুলাধার হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত চক্র বা পদ্মস্থিত দেবভাব এবং আসুরীভাব সমূহ গ্রাস করিয়া, কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি সম্পূর্ণ অনাহত-পদ্মে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং যোগ-শাস্ত্রমতে ঐ পদ্মগুলি সকলেই ম্লানভাবাপন্ন হইয়া জড়ত্বে পরিণত হইয়াছে—এজন্য উহারা পাতাল সদৃশ।

অহংকাররূপী মহিষাসুরের দেহ-পরিবর্ত্তনাদি ব্যাপারে নানাপ্রকার

রহস্য ও তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে; ইহা ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে। সাধকের অহংকার সহজে নষ্ট হয়না; একদিকে উহা অবনমিত হওয়ার কারণ উপস্থিত হইলেও, অন্যদিকে অন্য আকারে উহা আত্ম-প্রকাশ করে। ব্রজধামে কালীয় দমন-লীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহংকাররূপী কালীয় নাগের উচ্চ মঞ্চরূপ শিরে নৃত্য করিয়া উহাকে অবনমিত করিলে, সে অন্য শির উচ্চ করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, তখন উহাও ভগবান নৃত্যরূপ শ্রীপাদ-পদ্মের আঘাত দ্বারা দলন করিলেন; এইরূপে এক একটি করিয়া কালীয়ের উন্নত ও গর্ব্বিত শিরসমূহ দলন করিলে, সে রজোগুণময় রক্ত বমন করিতে করিতে ক্ষীণবল হইয়া ভগবানের শরণাগত হইয়াছিল। এখানে ভগবতীর যুদ্ধ-লীলাতেও অহংকারের পঞ্চবিধ বা অষ্টবিধ * বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। মহিষাসুর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবতী মায়ের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ না করিয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্তই গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল।

সংসারে বা ব্যবহারিক জগতেও দেখা যায় যে, সাধকগণ ধর্ম্মের বিশিষ্ট আবরণে সুশোভিত হইয়া কিম্বা উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াও অহংকারের ঐন্দ্রজালিক মহাবীর্য্যময় শক্তির কবল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে সমর্থ হন না! আবার ইহাও দেখা যায় যে, কোন কোন সাধকের চিত্তে দুর্ব্বলতা বা সংস্কার-বীজ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিলেও রজোগুণময় আসুরিক ক্রিয়াশীলতা উহাদিগকে বিশেষরূপে আশ্রয় করিয়া বলপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণের

* পুরাণান্তরে মহিষাসুরের উপরোক্তরূপ পঞ্চবিধ আকার ধারণ ব্যতীত, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও শূকর এই ত্রিবিধ অতিরিক্ত আকার ধারণের উল্লেখ আছে। গীতোক্ত অষ্টধা-প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াই অহংতত্ত্ব বিক্ষোভিত হয়—সুতরাং উহাদিগকে অহং-কাররূপী মহিষাসুরের অষ্টধা অভিব্যক্তিরূপেও আস্বাদন করা যাইতে পারে।

মধ্যেও অহংকার নানারূপে প্রকট্ হইয়া, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য এবং শান্তি-পূর্ণ সমন্বয়ের পরিবর্ত্তে, জ্বালাময় বিশৃঙ্খলা অসার বাগাড়ম্বর এবং নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করে; তদ্বারা নিজেরাও সন্তাপিত হন, আর অপরকেও দুঃখিত করেন—ইহাও অহংকাররূপী মহিষাসুরের বীর্য্যময় প্রভাব। যেখানে ধর্ম্ম, দম্ভের বা অহংকারের ধর্ম্মরূপে প্রকটিত হয়; ধর্ম্ম প্রচারক যেখানে অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণকে নিন্দা দ্বারা নিজধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন; ধার্ম্মিক যেখানে উচ্চ মর্য্যাদা বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হন, সেখানে অহংকারের জ্বালাময় তাপ, ধর্ম্মের রসময় ও প্রেমময় মহাভাবটী বিশুষ্ক করিতে থাকে! এইরূপে ক্রমশঃ সাধকের প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রটী রসহীন মরুভূমিতে পরিণত করে; সুতরাং ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মোহ পরিত্যাগ করিয়া, উহার অন্তরালে যে প্রেমানন্দময় রস-ধারা সতত উৎসারিত হইতেছে, তাহার সন্ধান লইয়া এবং পান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে!—ধর্ম্মের বাহ্য খোসাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চেষ্টা বা উহাতে বিমুগ্ধ থাকা, আত্ম-প্রতারণারই নামান্তর মাত্র! —এইসকল ব্যাপারেও অহংকাররূপী মহিষাসুর, বিভিন্নভাবে এবং রূপে আত্ম-প্রকট্ করিয়া জীব-জগতে জ্বালাময়-ভাব উদ্গিরণ করে।

মহিষাসুরের আকার পরিবর্ত্তনের অন্তরালে সাধনার স্তররাজিও সুসজ্জিত আছে—মহিষাসুরের প্রথম মহিষমূর্ত্তিই ভোগাসক্ত অহং-কারী সাধারণ বদ্ধ-জীব। ভোগাসক্ত মানব ভগবৎ বিধানে কর্ম্ম-সূত্রে যখন ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাহার আত্ম-কৃপা হইয়া সাধনায় প্রবৃত্তি জন্মে; এই অবস্থায় তিনি সাধন ভজন আরম্ভ করেন; ক্রমে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া একরস-ভাবাপন্ন এবং তেজস্বীরূপে প্রতিভাত হন—ইহাই সিংহরূপ ধারণ।

তৎপর সেই সাধক আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শক্তি-জ্ঞান বা জগৎরহস্য অবগত হওয়ার জন্য, বিশিষ্ট জ্ঞান-চর্চ্চা করিতে প্রবৃত্ত হন; কেননা, মহাদেব শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে" অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ করা হাস্যাস্পদ। এইরূপে সাধক নেতি নেতি বিচারাদি দ্বারা মায়িক দৃষ্টি বা মোহময় ভাব ক্রমে খণ্ডন পূর্ব্বক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আস্বাদন করিতে থাকেন; কিম্বা স্বকীয় জীবভাবীয় চাঞ্চল্য ও মালিন্য, যাহা স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদাদিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা বিবেক-অসি বা জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ক্রমে খণ্ডন করিয়া প্রাণময় এবং বিশুদ্ধভাবাপন্ন হইতে থাকেন—ইহাই খড়্গপাণি পুরুষরূপে পরিবর্ত্তন। অতঃপর সাধক যখন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত আত্ম-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন যাহা বিবেক ও বৈরাগের তাড়নায় পুর্ব্ব বন্ধনের কারণ বোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই জাগতিক ভোগাসক্তিময় গজও এক্ষণে তাঁহার নিকটে মহাশক্তিময় প্রেমানন্দপ্রদ 'মহাগজ'রূপে প্রতিভাত হইল—সাধক এইপ্রকারে সত্যে, জ্ঞানে ও প্রাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করিলেন—ইহাই সাধনার মহাগজময় অবস্থা। তৎপর সমুন্নত সাধক সাধারণ মানবের ন্যায় সংসারের সর্ব্ববিধ কার্য্যে এবং ভাবে যোগদান করিয়াও নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জগতকে ব্রহ্মময় শক্তিময় এবং আত্মময় ভগবানরূপে আস্বাদন করত প্রেমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।—ইহাই পুনরায় মহিষরূপ ধারণের রহস্য ও গূঢ় তাৎপর্য্য। [যোগশাস্ত্র, চিত্তের নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ভাবকেও 'মুক্ত'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।]

অহংকার, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ এই জাগতিক পঞ্চবিধ বিষয়েই বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়; ইহাও মহিষাসুরের পঞ্চবিধ রূপ ধারণের অন্যপ্রকার রহস্য। (১) দেহাত্ম-বোধে এবং জড়ভাবে আত্যন্তিক বা ঐকান্তিক আসক্তিই অহংকাররূপী মহিষাসুরের স্বাভাবিক

বৃত্তি, এজন্য মহিষাসুরের মহিষরূপ ধারণে, পৃথ্বি বা গন্ধ-তত্ত্বের অভিব্যক্তি। (২) সাধক যখন কর্ম্ম-সূত্রে, ভোগ এবং ত্যাগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা সীমা-রেখাতে উপস্থিত হইয়া, একদিকে অনাত্ম-ভাব সমূহকে বর্জ্জনের চেষ্টা করিতে থাকেন এবং পক্ষান্তরে নিত্য বা আত্মভাব লাব্ধর প্রচেষ্টা দ্বারা একরসভাবাপন্ন হন, তখন তাঁহাকে সিংহ-ধর্ম্মী বলা যায়; এজন্য মহিষাসুরের সিংহরূপ ধারণে রস-তত্ত্বের বিকাশ। (৩) খড়্গা তেজস্তত্ত্বের অভিব্যক্তি, ইহা পূর্ব্বেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আর তেজস্বী না হইলে কেহ তেজময় খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না; এজন্য মহিষাসুরের খড়্গপাণি মূর্ত্তিতে, তেজ-তত্ত্বের বিকাশ সূচনা করে। (৪) মহাগজ দেবী-বাহন সিংহকে শুণ্ডদ্বারা ধৃত করত আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহাতে স্পর্শ-তত্ত্বের অভিব্যক্তি; বিশেষতঃ সাধকগণ প্রত্যাহাররূপ কর দ্বারাই, ধর্ম্মভাব সমূহ আকর্ষণ এবং বিরুদ্ধ ভাব সমূহকে বিকর্ষণ বা বর্জ্জন করিয়া থাকেন; এজন্য মহাগজ আকার ধারণে, স্পর্শ-তত্ত্বের বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। পরিশেষে (৫) পুনরায় মহিষরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ গর্জ্জনাদির ক্রিয়াশীলতা—নাদময় গর্জ্জনে আকাশ-তত্ত্বের অভিব্যক্তি। এইরূপে মহিষাসুর সমষ্টিভাবে পঞ্চতত্ত্বময় জাগতিক প্রপঞ্চকে এবং ব্যষ্টিভাবে সাধকের পঞ্চভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চবিষয়কে বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী সাধকের কর্ত্তব্য—অহংকার কর্ত্তৃক প্রপঞ্চমুখী বিক্ষুব্ধ ভাবসমূহকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐক্যবদ্ধ করিয়া আরাত্রিকের একীভূত জ্যোতিঃ-সমষ্টির ন্যায় প্রাণে ও জ্ঞানে উদ্দীপ্ত করত মহাশক্তিময় ভগবানের বিশ্বময় প্রেম-পূজার মহান্ আরতি সুসম্পন্ন করা এবং আত্ম-হারা হইয়া আত্ম-লাভ করা!!—(২৯-৩৩)

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥—(৩৪)

সভ্য বিবরণ। অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া দিব্য সুরা (আসব) পান করিলেন এবং আরক্তনেত্র হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন। —(৩৪)

তত্ত্ব-সুধা। যখন সাধকের মহাপ্রাণ জাগ্রত হয়, যখন তিনি সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে প্রাণময়ী মায়ের সন্ধান পাইয়া জ্ঞানে অবনত এবং প্রেমে পুলকিত হন; তখন জগন্মাতা শরণাগত ভক্ত সাধকের প্রদত্ত প্রেমানুরাগ প্রেমানন্দে পান করিয়া থাকেন! এইরূপে পুনঃ পুনঃ সেই আনন্দ-সুধা স্বয়ং পান করিয়া কিম্বা শরণাগত ভক্তসাধককে স্তন্য-সুধারূপে পরিচ্ছিন্ন বিষয়-মধু পান করাইয়া মায়ের জগন্মোহন ত্রিনয়ন জবা ফুলের মত অরুণ বর্ণ রূপ ধারণ করে। মহামায়া মা, নিজকে অনন্তভাবে বিভাবিত করিয়া, প্রপঞ্চময় সংসাররূপ মধু-চক্রে রূপ-রসাদি বিষয়গত পরিচ্ছিন্ন আনন্দ-কণা সমূহও স্বয়ং পান করিয়া থাকেন! অর্থাৎ জগত-দেহের যে কোন আধারে বা যে কোন ভাবে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের অভিব্যক্তি হউক না কেন উহা প্রকৃতিরূপিণী মা, ছিন্নমস্তারূপে সতত পান করিতেছেন!—জীব-জগতের সর্ব্বত্রই ত্রিপুটী বিভাগ এবং ত্রিগুণের খেলা অভিব্যক্ত—ইহাই ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে তিনটি রক্তধারারূপে সুশোভিত। পালনের সহায়ক সত্ত্বগুণময় ভোগ-ধারাটী মা স্বয়ং পান করিতেছেন, আর রজোগুণময় ভোক্তারূপী ধারা এবং তমোগুণময় ভোগ্য বা বিষয়রূপী-ধারাটী মায়ের একাত্ম-ভাবাপন্ন শক্তিদ্বয় আনন্দ-মধুরূপে পান করিয়া বিহ্বল এবং আরক্তলোচনা হইতেছেন! —ইহাই মায়ের দিব্য-সুরা পানের গূঢ় তাৎপর্য্য।

এখানে মায়ের অসুর-দলনী ক্রোধময়ী চণ্ডিকা মূর্ত্তির বিকাশ হইলেও, ঋষি মন্ত্রে তাঁহাকে 'জগন্মাতা'রূপে বিশেষিত করিয়াছেন; কেননা মায়ের চণ্ডভাব জগতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্যই প্রকাশ পায়। আবার ব্যবহারিক জগতে মাতা সন্তানকে নানা প্রকারে তাড়না

করিলেও মাতৃ-হৃদয় স্নেহ-রসে ও করুণায় সতত আপ্লুত থাকে! আর মায়ের বাহ্যিক কশাঘাত বা বাক্য-বাণ প্রয়োগ প্রভৃতিও সন্তানের মঙ্গলই সাধন করিয়া থাকে।

একাধারে একই সময়ে ক্রোধের এবং হাসির অভিব্যক্তি মহামর্মান্বিতা জগন্মাতার মুখ-মণ্ডলেই একমাত্র সম্ভবে! চণ্ডিকা মায়ের হাস্যে, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ভাব নিহিত থাকিলেও, এই ক্ষেত্রে মায়ের হাস্যদ্বারা ভাবী প্রলয় সূচনা করিতেছে। এতৎ সম্পর্কে হাস্য দ্বারা অহংকারকে প্রলয় করা সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক গল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং উপভোগ্য, যথা—ত্রিপুর-শাসন দেবাদিদেব শম্ভু ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার মানসে বিচিত্র তেজময় দিব্যরথ প্রস্তুত করিলেন—সমস্ত দেবগণের শক্তি সমূহকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ঐ রথ প্রস্তুত হইল—এইরূপে দেবগণের মধ্যে কেহ রথের চক্ররূপে, কেহ কেহ রথের অন্যান্য অংশে, কেহ সারথীরূপে কেহ বল্গারূপে কতক অশ্বাদিরূপে, কেহ ধনুরূপে, আবার কেহবা অস্ত্রাদিরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। তখন সেই সর্ব্ব-বিজয়ী অপূর্ব্ব দিব্য মহারথে মহাযোগেশ্বর মহাদেব প্রলয়মূর্ত্তিতে সমাসীন হইয়া জয়-যাত্রা করিলেন। এই অবস্থায় দেবগণের মধ্যে কেহ অভিমান করিলেন—আমি রথ-চক্র হইয়াছি, তাই রথটী চলিতেছে! সুতরাং আমিই ত্রিপুর-জয়ের বিশেষ কারণস্বরূপ; কেহ অভিমান করিলেন—আমি সারথী হইয়াছি, তাই যুদ্ধের বিশেষ সুবিধা হইবে; কাহারও মনে হইল, আমি অশ্ব না হইলে রথ টানিত কে? —আবার কেহ অহংকার করিলেন, আমি বাণ হইয়াছি তাই অসুরকে বিদ্ধ করিব। এইরূপে দেবগণ সকলেই নিজ নিজ খণ্ড শক্তিসমূহকে অ সম্ম ত্রিপুর-জয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন সর্ব্বান্তর্যামী শম্ভু দেবতাগণের এবম্বিধ অহংকৃত ভাব উপলব্ধি করিয়া প্রলয়কারী বিকট হাস্য করিলেন!—সেই হাস্য দ্বারাই ত্রিপুরাসুর নিহত

হইয়া গেল! তখন দেবতাগণ লজ্জিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। সংসারে বা বৈষয়িক ব্যাপারেও আমরা কর্ত্তৃত্ব-অভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমানরূপ অহংকার দ্বারা বিমোহিত হইয়া সর্ব্বদাই মনে করি—আমরাই সমস্ত করিতেছি এবং সুখ-দুঃখ শোক-মোহাদিও আমরাই ভোগ করিতেছি; কিন্তু আমরা যে যন্ত্রস্বরূপে পরিচালিত হইয়া ইচ্ছাময়ী মহামায়া মায়েরই ইচ্ছা পরিপূরণ করিতেছি!—আমাদের দেহ-রথে যে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বররূপী ভগবান অধিষ্ঠিত হইয়া মায়া-যন্ত্র বা সূত্রধারের পুত্তলীবৎ সর্ব্বথা আমাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন, এই পরম ও চরম সত্য, প্রাণ-প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারেনা; তাই কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীবের অহংকৃত-ভাব দেখিয়া জগন্মাতার বদনে হাস্য ফুটিয়া উঠে।—(৩৪)

ননর্দ্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্॥ ৩৫
সাচ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্॥ ৩৬

সত্য বিবরণ।—সামর্থ্য ও উৎসাহজনিত গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া সেই অসুরও গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং শৃঙ্গদ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥—(৩৫)॥ মদ্যপানে সমধিক আরক্ত-বদনা দেবী চণ্ডিকা, শরনিকর দ্বারা অসুর-নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত সমূহ চূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং জড়িত স্বরে তাহাকে বলিলেন॥—(৩৬)॥

তত্ত্ব-সুধা।—মহিষাসুরকে যে পূর্ব্বাপর 'অহংকার'রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, উহা নিছক্ কল্পনা নহে; কেননা এখানে, মন্ত্রোক্ত **'বলবীর্য্য-মদোদ্ধত'** উক্তি দ্বারা মহিষাসুরের অহমিকা-প্রকৃতি নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। আর অন্ততঃ সমবলী না হইলে, বিপক্ষকে সহজে পরাভূত করিতে পারা যায়না; এজন্য জগন্মাতাও যেন মধুপান দ্বারা

মদোদ্ধতা বা মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়াছেন। বল, বীর্য্য, মদ বা অহংকারে উদ্ধত মহিষাসুর, চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সদৃশ অবশিষ্ট জড়ভাব সমূহ শৃংরূপ হস্তদ্বারা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহামুক্তির সন্ধিক্ষণ সমাগত প্রায়। তাই মহাশক্তিশালী অসুর ইতিপূর্ব্বে প্রায় সর্ব্বস্বই মাতৃ-চরণে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; এক্ষণে তাহার শেষ জড়ত্বভাব কিম্বা পর্ব্বতপ্রমাণ সঞ্চিত-কর্ম্ম সমূহ যাহা রজোগুণের পরিপূর্ণ উদ্বেলনে প্রাণময় ক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই এক্ষণে মাতৃ-অঙ্গে নিক্ষেপ বা সমর্পণ করিল; অর্থাৎ ঐ সকলকে চৈতন্যময় এবং মাতৃশক্তিময় বলিয়া অনুভব করত সাক্ষীভাব অবলম্বন করিল। সাধক পক্ষে—শরণাগত ভক্ত-সাধক তাঁহার জড়ভাব বা অজ্ঞানতা এবং সঞ্চিত-কর্ম্মের মূর্ত্ত-বিকাশ প্রভৃতি, যাহা এতকাল বন্ধনরূপে দুঃখদায়ী হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে মাতৃময় বা শক্তিময় বলিয়া উপলব্ধি করায়, মুক্তি লাভের আনন্দময় পূর্ব্বাভাস বা অপূর্ব্ব প্রশান্তি লাভ করিল।—এইরূপে সাধক মাতৃ-কৃপায় সাক্ষীভাবে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরীন্ অশুদ্ধ সংস্কার ও কর্ম্মের বোঝা ক্রমে অপসারিত হইয়া তাহার জীবন-নিকুঞ্জ মধুময় হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমশঃ তিনি অমৃতময় আনন্দের খনিতে পরিণত হইতেছেন!

এই মন্ত্রে ভূতশুদ্ধিরও সুন্দর ইঙ্গিত রহিয়াছে; ক্ষিত্যাদি প্রপঞ্চ দ্বারাই জীব-দেহ গঠিত হইয়াছে; এই পঞ্চভূতকে বিশুদ্ধ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভই ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য। মহিষাসুরও পঞ্চতত্ত্বময় পর্ব্বততুল্য জড়ভাব বা অজ্ঞান সমষ্টিকে মাতৃ-অঙ্গে নিক্ষেপদ্বারা বিলীন করত পরোক্ষে ভূতশুদ্ধি বা আত্ম-শোধন কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছিল। শাস্ত্রে বিবিধ প্রকার ভূতশুদ্ধির উল্লেখ আছে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রমতে—"প্রাণায়াম-ক্রমে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব কুণ্ডলিনী শক্তিতে বিলীন করত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন সাধনই ভূতশুদ্ধি।" কেহ বলিয়াছেন—অবিশুদ্ধ ভাব

পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-শুদ্ধি পূর্ব্বক অভীষ্ট দেবের সদৃশ চিন্তাই ভূতশুদ্ধি। কাহারও মতে—নিজেকে বহ্নি-প্রাচীর মধ্যে ভাবনা করত মন্ত্র * পাঠক্রমে জীবভাবকে পরমভাবের সহিত মিলন করিয়া পরমানন্দ লাভ করাই ভূত-শুদ্ধি। আবার কেহ—মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, প্রণব প্রকাশিত হৃদ্ কমলে জীবাত্মার ধ্যান ইত্যাদি প্রক্রিয়াদ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলন করাকে বিশিষ্ট ভূতশুদ্ধি বলিয়াছেন। যাহাহউক মহিষাসুরও স্বকীয় অবশিষ্ট আসুরীভাব বা অবিশুদ্ধ জীবভাবকে মাতৃরূপা পরমাত্ম ভাবের সহিত মহামিলন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইল—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য। ব্যষ্টিভাবে—সাধক 'মম'ত্বের বা গর্ব্ব অনুভব করিবার যোগ্য যথাসর্ব্বস্ব মাতৃ চরণে সমর্পণ করায়, তাহার প্রাণময় হৃদয়-পদ্ম শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল! অর্থাৎ সর্ব্বত্র মাতৃশক্তিময় অনুভূতি হওয়ায় স্বার্থময় নিজস্ব আর কিছুই রহিলনা—সাধক এইরূপে পূর্ণ মাতৃকৃপা লাভের যোগ্যতা লাভ করিল। তখন জগজ্জননী সাধকের জড়ত্ব এবং অজ্ঞানতা সমষ্টি, দিব্য শরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এইরূপে ভক্ত-প্রদত্ত প্রেমানুরাগে অভিরঞ্জিত হইয়া জগদম্বা মা প্রেমানন্দে আকুল হওয়ায়, শ্রুতি-মধুর গদগদ ভাষণে সাধককে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।—(৩৫।৩৬)

দেব্যুবাচ ॥ ৩৭

গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৮

সত্য বিবরণ। দেবী কহিলেন॥ ৩৭॥ রে মূঢ়! আমি যতক্ষণ

---

* ভূতশুদ্ধির একটি মন্ত্র—"ওঁ মূল শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না-পথেন জীব-শিবং পরম শিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩॥ ওঁ পরম শিব সুষম্না পথেন মূল শৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা ॥ ৪ ॥

মধুপান করি, ততক্ষণ তুই গর্জ্জন কর, গর্জ্জন কর; আমি তোকে বধ করিলে, দেবগণ শীঘ্র এই স্থানেই গর্জ্জন করিবেন।—(৩৮)

ভক্ত-সুধা। মাতৃ-বিমুখ সাধক এতকাল, যে বিষয়-মধু নিজে পান করিতে ব্যস্ত ছিলেন, আজ প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ফলে দেখিলেন—সেই মধু মা স্বয়ং পান করিতেছেন! অর্থাৎ এক্ষণে বিষয়-মধু মাকে আস্বাদন করিতে দিয়া সাধক সাক্ষীভাব অবলম্বন করিয়াছেন!—তাই আজ মায়ের এত আনন্দ—ইহাই মন্ত্রোক্ত মায়ের মধুপান! এইরূপে জগজ্জননী ভক্ত-প্রদত্ত প্রেমানন্দ-সুধা পানে বিহ্বল হইয়া যেন শরণাগত এবং বিশুদ্ধভাবাপন্ন সাধককে বলিলেন—"আমি মধু পান করি, আর তুমি উহা দর্শন করিয়া আনন্দে জয়-ধ্বনি কর।"

'মধু' শব্দের অর্থ আনন্দ; শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চভাবের চরম অভিব্যক্তি মধুর ভাবে—উহাতেও আনন্দের আতিশয্য সূচনা করে। শীতের জাড্য এবং সঙ্কোচ ভাব দ্বারা অভিভূত হইলে, বৃক্ষাদির চৈতন্য ও আনন্দভাব অন্তর্মুখী হইয়া সত্তাতে মাত্র অবস্থিতি করে অর্থাৎ তখন বৃক্ষ-লতাদির সমস্ত পত্রাদি পতিত হওয়ায়, উহারা যেন সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় একত্বভাবাপন্ন হইয়া বিরাজ করে, কিন্তু মধু-ঋতুর সমাগমে, তাহাদের জড়তা বিদূরিত হয়; তখন তাহারা যেন "অহং বহু স্যাম্"—'আমি বহু হব' এই পরমাত্মময় ভাবে বিভাবিত হইয়া ক্রমে অনন্ত পত্র পুষ্প ফলাদিতে সুশোভিত হয় এবং বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করে! এইরূপে ফুলহীন পলাশ বৃক্ষেও শত সহস্র ফুলের বিকাশ হইয়া থাকে—ইহাতেও 'আমি বহু হব' ভাবের অভিব্যক্তি! ক্রমে স্তবকে স্তবকে অশোকাদি পুষ্প-সম্ভার, রূপে রসে ভরপুর হইয়া আপন গৌরবে ফুটিয়া উঠে! এইরূপে প্রকৃতি দেবী মধু-মাসে নবীন সাজ-সজ্জায় সুশোভিত হইয়া থাকেন; তাই সাধক গাহিয়াছেন—"পলাশে সিঁদুর পরি, অশোকে বাঁধি কবরী, মালতী মাধবীদলে করি কণ্ঠহার। সেজেছে প্রকৃতি

দেবী কত শোভা তাঁর ॥” এহেন মধু-মাসেই মধুময় দোল-মঞ্চে আনন্দময় পুরুষোত্তম মাধবের সহিত আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী মাধবীর প্রেমানন্দময় মিলন সংসাধিত হয়। এই দোল বা বসোন্তাৎসবের মধু-মিলনকে কেহ কেহ মদনোৎসব-রূপে উল্লখ করিয়া থাকেন। এই মদনোৎসবের অন্তরালেও আমি ‘বহু হব’ এই ভাব বিরাজিত; কেননা ‘মদন’ কথাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—মদ+অন বা অনট্=মদন; এখানে মদ শব্দে অহংকারের সূক্ষ্মভাব বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা বুঝায়; আর অন বা অনট্ সংযোগে মদরূপী অহংকারের সক্রিয় বা ঐশ্বর্য্যময় ভাব প্রকট করা হয়; সুতরাং “অহং বহু স্যাম্” আমিত্বের প্রসারভাব মদন শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত। এইরূপে প্রাকৃত জগতে অহংকার যখন জড়ভাব হইতে বিমুক্ত বা বিশুদ্ধ হইয়া বাহ্যরূপে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ করে, তখন উহাই মদনোৎসব বা চৈতন্যময় দোললীলা রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। বসন্তোৎসব কোন না কোন আকারে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মধু-মাসে বাহ্য প্রকৃতিতে যখন ঐশ্বর্য্যের সুবিকাশ হইয়া জীব-জগতকে বিমোহিত করিতে থাকে, তখন অন্তর্ম্মুখী ভাবেও প্রেমানন্দের মাধুর্য্যময় রস-লীলা দোলের চৈতন্যময় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যেন জীবের হৃদয়-ক্ষেত্রে উৎসারিত হইতে থাকে! শরৎ কোমলতা ও বিমলতা আনয়ন করে, আবার বসন্ত উহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া প্রাণময় ও চৈতন্যময় করিয়া তুলে।

বিশুদ্ধ অহংকারই দোল-মঞ্চস্বরূপ—উহাতে ত্রিগুণের তিনটী ধাপ এবং পঞ্চ-তত্ত্বের পাঁচটী সিঁড়ি যুক্ত থাকে। এই পঞ্চতত্ত্বময় পাঁচটী সিঁড়ি অতিক্রম করত এবং ত্রিগুণময় অহংকারকে দলন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইলে, সেখানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়।—তখন জীব-শিব, পরম-শিবের সহিত মিলিত হইয়া দোল-মঞ্চের প্রেমানন্দ-ময় দোলাতে আরোহণ করত চৈতন্যময় ভাব দ্বারা নিত্য দোলায়িত

হন এবং চিদানন্দের প্রেম-বিলাস সুসম্পন্ন করেন! মহিষাসুরের অহংভাব বিশুদ্ধ হওয়ায়, এক্ষণে সে মায়ের শ্রীপাদপদ্ম ধারণের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে! এজন্য মধুমাসে মাধব-মাধবীর মধু-মিলনোৎসবের অনুরূপ প্রেমানন্দের লীলা প্রকাশ করিবার মানসে জগদম্বা মা আজ আনন্দমধু পানে প্রমত্ত হইয়া বিশুদ্ধভাবাপন্ন মহিষকে মধুময় গদ গদ স্বরে যেন বলিতেছেন—হে মধু-লুব্ধ আনন্দ-মুগ্ধ সন্তান! আনন্দ-ধ্বনি করিতে থাক; আমিও আনন্দ-সুধা পান করিয়া লই; তারপর তোমার দেবত্ব-প্রাপ্তিতে বা মহামুক্তি লাভে দেবতাগণও শীঘ্রই আনন্দে জয়-ধ্বনি করিবেন!—তোমার বিশুদ্ধদেহরূপ চিন্ময় দোল-মঞ্চে, আমি স্বয়ং অধিষ্ঠান করিয়া, তোমাকে আত্মময় স্বরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব! অতঃপর তোমাকে আমি প্রেমানন্দের দোলায় দোলাইয়া এবং আনন্দ-মধু পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিব!—ইহাই মন্ত্রোক্ত মধুপান-লীলার গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য!

সাধকের এবম্বিধ প্রাণময় এবং মধুময় অবস্থায় সমস্ত জগত মধুময় বা প্রেমানন্দময় বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। এইরূপে জলে স্থলে অনলে অনিলে নভোমণ্ডলে, সর্ব্বত্র মধুমতী মায়ের মধুময় আনন্দ-লীলা দর্শন করিয়া সাধক প্রেমে পুলকিত হন! এইপ্রকার প্রাণময় ও ব্রহ্মজ্ঞানময় অবস্থা আস্বাদান করিয়াই উপনিষদের ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—"এই আত্মা সর্ব্বভূতের মধু এবং সর্ব্বভূতও এই আত্মার মধু"! আবার দেব-দেবীপূজা এবং বিশিষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র সম্বলিত ক্রিয়া-কাণ্ডে পাঠ করা হয়—"বাতাস মধু * বহন করিতেছে, সিন্ধুসকল মধু

---

* "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বী র্নঃ সন্তোষধীঃ॥ মধু নক্তমুতোষসো। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ মধুমান্ নো বনস্পতি মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥"

ক্ষরণে নিরত। ওষধি সমূহ আমাদিগকে মধু দান করিবার জন্য স্থিত * * পৃথিবীর ধূলিকণা গুলিও মধুময়!!—কি অপূর্ব্ব দর্শন, প্রাণময় মহান্ ভাবরাশির কি সুন্দর অভিব্যক্তি ও সমাবেশ!! (৩৭। ৩৮)

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৪০
ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাৎ ততঃ।
অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত এবাতি দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১

সভ্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন ॥ ৩৯ ॥—দেবী এই কথা বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই মহাসুরের উপরে আরোহণ করিলেন এবং পদদ্বারা কণ্ঠদেশ নিপীড়ন করিয়া বক্ষে শূলাঘাত করিলেন ॥—(৪০) ॥ অনন্তর সেই অসুরও দেবীর পদভরে আক্রান্ত হইয়া নিজ মুখ হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র দেবীর মহাবীর্য্যপ্রভাবে নিরুদ্ধ হইল। (অর্থাৎ আর বাহির হইতে পারিল না) ॥—(৪১) ॥

তত্ত্ব সুধা। জীবন-সংগ্রামে আসুরিক প্রভাবাদি হইতে বিশেষ উচ্চে উঠিতে হইবে এবং উহাদিগকে দলন পূর্ব্বক আত্মভাবে বা ভগবৎ ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সংসারে পাশবিক শক্তি বা আসুরিক বল, ত্রিতাপ জ্বালারূপে প্রকটিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে মানবের আনন্দ-ধারাটী বিশুষ্ক করত তাহার প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রটী মরুভূমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে!—একটু শান্তিময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবারও যেন অবসর হয় না; বহির্জ্জগতে এবং অন্তর্জ্জগতে সর্ব্বত্রই এই বিরুদ্ধ শক্তির তাণ্ডব নৃত্য সকলকেই দুঃখিত করিতেছে! সুতরাং এইসকল পারিপার্শ্বিক উৎপীড়নে 'হাল' ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা—মহাশক্তিময় ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমে ধৈর্য্য, বিশ্বাস এবং অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা-পথে

উন্নত হইয়া, বিরুদ্ধ অবস্থা সমূহকে পদদলিত করত আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এজন্য **আনন্দময়ী দুর্গামাতা** একপদ পশু-বলরূপী সিংহের উপর এবং অন্যপদ আসুরিক-বলরূপী মহিষের উপর সংস্থাপন করিয়া অর্থাৎ উহাদের পাশবিক এবং আসুরিক বল-বীর্য্যকে স্তম্ভিত করিয়া, সানন্দে ও সগর্ব্বে দণ্ডায়মানা!—জগন্মাতার এই যুদ্ধ-কৌশল সাধক-জীবনে আনন্দ লাভ করিবার অন্যতম উপায় স্বরূপ—ইহাই মন্ত্রোক্ত 'সমুৎপত্য সারূঢ়া' বলার রহস্য ও তাৎপর্য্য। একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—"চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত **বিরুদ্ধ অবস্থা** সমূহ মানব-জীবনকে নিষ্পেষিত করিয়া নিরানন্দে ডুবাইয়া ফেলিবার জন্য সতত সংগ্রাম করিতেছে!—ইহাই মানুষের জীবন এবং প্রত্যেকের জীবন-স্তরেই এই সত্য কোন না কোন আকারে পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং তেজস্বিতা এবং ভগবৎ কৃপাদ্বারা এই সকল বিরুদ্ধ অবস্থাকে দলন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষা করত স্বরূপ আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে"।

এইরূপে জগন্মাতা অসুরের স্কন্ধে আরোহণ করত দিব্য জ্ঞানময় শূলদ্বারা তাহার কণ্ঠে আঘাত করিলেন; অর্থাৎ তাহার দেহস্থ রজোগুণময় কর্ম্মের রাজ্য এবং তমোগুণময় জড়ত্বের রাজ্য হইতে সত্ত্বগুণময় মস্তকরূপী জ্ঞানের রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, কণ্ঠে দিব্য শূলাঘাত করিলেন। তখন সেই ছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে অসুর, নর-দেহ ধারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ-বহির্গত হওয়া মাত্র, মহাশক্তিময়ী মা উগ্রতেজে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন! অর্থাৎ তাহার অপরার্দ্ধ বিকশিত হইতে দিলেন না। ইহার কারণ সুস্পষ্ট, কেননা অহংকার যদি পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কারণাংশে বা বীজাংশের কাম-কামনাদির ভাবী অস্তিত্ব বা বিক্ষোভের সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা; কিন্তু এখনও কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং তাহার সহচরগণকে বধ করিতে হইবে; তাই মা অহংকারের অর্দ্ধাংশ

মাত্র বিকশিত করিয়া উহা বিলয়ের জন্য প্রস্তুত করিলেন। সাধক পক্ষে—তাঁহার আগামী বা ক্রিয়মান কর্ম্ম এবং জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইলেও, এখনও প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ভোগ শেষ হয় নাই। শাস্ত্রে আছে—"প্রারব্ধং নিশ্চয়াদভুঙ্ক্তে শেষঃ জ্ঞানেন দহ্যতে"—অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়, অবশিষ্ট কর্ম্ম (সঞ্চিত ও ক্রিয়মান) জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জীবন্মুক্তি লাভ করিলেও, প্রারব্ধের কবল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হননা। এই বিধানে এখানেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী সাধকের জীবনে প্রারব্ধ-কর্ম্মের বীজ সমূহ বিনষ্ট হয় নাই, ভবিষ্যতে দেশ কাল পাত্রানুসারে উহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী; এজন্য চণ্ডী-সাধনার দ্বিতীয় স্তরে, সাধকের অহংকারের সূক্ষ্ম ভাবমাত্র বিনষ্ট হইল, আর কারণ-রাজ্যটী সম্প্রতি নষ্ট হইল না, কিন্তু অপ্রকট অবস্থায় রহিল—ইহাই তাৎপর্য্য। (৩৯-৪১)

অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুদ্ধমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ॥ ৪২
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥ ৪৩
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বাপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৪৪

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষাসুর বধোনাম তৃতীয় মাহাত্ম্যম্। শ্লোক সংখ্যা—৪১; মন্ত্র সংখ্যা—৪৪

সত্য বিবরণ। অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইয়াই সেই মহাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল; দেবী মহাখড়্গদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক নিপাতিত করিলেন॥—(৪২)॥ অনন্তর অবশিষ্ট সমস্ত দৈত্যসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল; দেবগণও পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন॥ (৪৩)॥ দেবগণ (নারদাদি) দিব্য মহর্ষিবৃন্দ সমভিব্যাহারে দেবীকে স্তব করিতে

লাগিলেন ; (বিশ্বাবসু প্রভৃতি) গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিতে লাগিলেন, আর (উর্ব্বশী প্রভৃতি) অপ্সরীগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ (৪৪) ॥

তত্ত্ব সুধা।—চণ্ডিকা দেবী মহাসুরের কণ্ঠ-দেশ দিব্য জ্ঞানময় মহা অসিদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাকে পূর্ণ দিব্যভাবে এবং পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—এইরূপে বীর সন্তানকে পদাশ্রিত অবস্থায় পূজা গ্রহণের অধিকার প্রদান পূর্ব্বক মহামুক্তি প্রদানে ধন্য করিলেন!—সাধকের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম্মরাশি জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল ; সাধক স্বীয় প্রাণকে উদ্বুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ করিয়া মহাপ্রাণরূপে পরিণত করিলেন। এইরূপে সাধক প্রাণময় ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের বিশিষ্ট চাঞ্চল্য সমূহ বিলয় পূর্ব্বক বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদ করত বিশুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ-পদ্মে আরোহণ করিলেন!—স্বজাতীয় ভেদ অপসারিত করিতে সক্ষম হওয়ায় সাধকের সূক্ষ্ম বা প্রাণময় জগতে অভেদ দৃষ্টি প্রসারিত হইল—তাঁহার প্রাণময় কোষ ভেদ হইল। এই প্রকারে তিনি প্রাণে ও জ্ঞানে সম্যকরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া শক্তি-জ্ঞান লাভ করত আত্ম-চৈতন্যময় মহাভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। যৌগিক ব্যাখ্যায়—কুলকুণ্ডলিনী শক্তি মহিষাসুরের অনুচরগণকে প্রাণময় ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া নিজ দেহে ক্রমে লয় করিলেন ; অতঃপর অর্দ্ধবিকশিত অবস্থায় মহিষাসুরকে তাঁহার চিন্ময় দেহে বিলয় করিলেন এবং অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অসুরগণকেও স্বকীয় দেহে লীন করত বিশুদ্ধ-চক্রে আরোহণ করিলেন—এইরূপে যোগী-সাধকের প্রাণময় বিষ্ণু-গ্রন্থি ভেদ হইল!—অনাহত-পদ্মটী সঙ্কুচিত হইয়া অধোমুখী বা নিক্রম অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রথম খণ্ডে দেখান হইয়াছে যে, দেবী-মহাত্ম্যের প্রথম চরিত্র—সত্ত্বগুণের অন্তর্ম্মুখী লীলা এবং আসুরিক চাঞ্চল্য এবং ভাবঅমুহর স্থূল অবস্থা ; মধ্যমচরিত্র—রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী বিকাশ এবং আসুরিক ভাবের সূক্ষ্ম অবস্থা ; উত্তম চরিত্র—তমোগুণের অন্তর্ম্মুখী

প্রলয়লীলা এবং আসুরী ভাবের কারণময় অবস্থা। এখানে মধ্যম চরিত্রে ঐ সকল ভাব, দেবগণের মধ্যে জগন্মাতাতে মহিষাসুরে এবং সাধক-চিত্তে কিরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা ক্রমে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইতেছে। **দেবগণ পক্ষে**—রজোগুণময় সূক্ষ্ম অহংকারের **তামসলক্ষণ**—নিজ নিজ খণ্ড শক্তি সমূহের উপর নির্ভর করিয়া মহাসুর বধের চেষ্টা এবং তৎকর্ত্তৃক পরাজয়। **রাজস লক্ষণ**—সংঘবদ্ধ হইয়া হরি-হরের নিকট গমন এবং অসুর বধের জন্য উপায় নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা। **সাত্ত্বিক লক্ষণ**—নিজ নিজ তেজপুঞ্জদ্বারা জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তি মূর্ত্তি গঠন এবং অস্ত্র সমর্পণ দ্বারা আত্ম-নিবেদন। **জগন্মাতা পক্ষে**—পরমাত্মময়ী বিশুদ্ধ অহংকাররূপিণী দুর্গা মাতার **সাত্ত্বিক লক্ষণ**—ত্রিলোকব্যাপী জ্যোতিঃ বিকাশ এবং তন্মধ্যে ইষ্টদেবীরূপে প্রকাশিত হইয়া দেবগণকে দর্শন ও অভয় দান। **রাজস লক্ষণ**—অস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি গ্রহণ, সংগ্রাম এবং মধুপানে আরক্তনয়ন। **তামস লক্ষণ**—মহিষাসুর এবং তদীয় সহকারী-গণকে হুঙ্কারাদি নানা উপায়ে বিলয় করা এবং স্বকীয় চিন্ময় মূর্ত্তিকেও অন্তর্হিত করা। **মহিষাসুর পক্ষে**—জগন্মাতার উপাসনাদ্বারা সাযুজ্য লাভের প্রচেষ্টা—**সাত্ত্বিক লক্ষণ**। যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে মর্ত্তে প্রেরণ (অর্থাৎ দেবভাব সমূহকে জড়ত্বে পরিণত করা) —**রাজস লক্ষণ**। বলবীর্য্য-মদোদ্ধত হওয়া, আনন্দদায়িনী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও দেবীর সহিত শত্রুতা ও সংগ্রাম করা এবং ইচ্ছামত বিভিন্ন তামসী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীব-জগতের সন্ত্রাস উৎপাদন পূর্ব্বক বিনষ্ট হওয়া—**তামসলক্ষণ**। **সাধক পক্ষে** - স্বীয় দেবভাব সমূহকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা না করা, রিপু-বিজয়ী তেজস্বীরূপে প্রতিভাত না হওয়া, শরণাগতির অভাব ইত্যাদি—**তামস লক্ষণ**। কর্ম্মময় সাধনাদ্বারা আত্মোদ্ধারের সম্যক্ চেষ্টা ; প্রমথ সৈন্য বা প্রাণময় স্বকীয় দেবভাব সমূহ দ্বারা মহাশক্তিময়ী মায়ের যুদ্ধলীলাতে সাহায্য করা—**রাজস**

লক্ষণ। সমষ্টিভাবে সর্ব্বভূতে এবং সকল কর্ম্ম-প্রবাহে এবং ব্যষ্টিভাবে নিজদেহের সর্ব্ববিধ কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডশক্তির ক্রিয়া দর্শন না করিয়া সকলের মূলে ও অন্তরালে মহাশক্তিকে উপলব্ধি করা অর্থাৎ একমাত্র মহাশক্তিই জীবের দর্শন শক্তি, শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতিরূপে ক্রিয়াশীলা, এরূপ অনুভব করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করাই—সাত্ত্বিকলক্ষণ।

ক্ষিতি-তত্ত্বময় ইন্দ্রিয়-দ্বার সমূহকে 'গো' বলা হয়; ইন্দ্রিয়ের প্রবাহ-শক্তিসমূহ যখন ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে ভগবৎরূপ দর্শনের জন্য আকর্ষিত বা লালায়িত হয় তখন তাহারা গোস্বরূপ! অর্থাৎ সাধকের মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের ভগবৎ অভিমুখী প্রগতিই গোপীভাব। এইরূপে ইন্দ্রিয়রূপী গোপিগণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষিকেশরূপী * আনন্দময় গোবিন্দকে বা পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য পরম-রসে বিভাবিত হইয়া যখন, সহস্রার-স্থিত নিত্য-ধাম অভিমুখে জয়-যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদের নিকটে সর্ব্বপ্রকার বিষয়-রস বিষবৎ তুচ্ছ বোধ হয়।—তাঁহারা বিষয়াসক্তিরূপ কুল পরিত্যাগ করত পরমাত্মা-রূপী অকুল প্রেম-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্ম-নিবেদনের মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন! এই প্রকারে প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত সাধকের ইন্দ্রিয়রূপী গোপিগণ সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে কৃষ্ণ-রূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তখন তাঁহারা দর্শন করেন—সাংসারিক বা জাগতিক সর্ব্ববিধ কার্য্যও শক্তিময় ও আনন্দময় ভগবৎ সত্তায় পূর্ণ এবং ভগবৎ চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত! এইরূপ প্রাণময় অবস্থায়, সাধকের অহংকার বিশুদ্ধ হইয়া আপনা হইতে ভগবচ্চরণে অবলুণ্ঠিত হয় এবং জীবন্মুক্তির পরমানন্দময় মহাভাব ক্রমে আস্বাদিত হইয়া থাকে। তখন জীব-জগতের সেবা, কিম্বা দারা-পুত্রাদির সেবাও কৃষ্ণ-সেবারূপে প্রতিভাত হইয়া সাধকের পরমাত্মাতে পরম-প্রীতি বা প্রেম সংস্থাপিত হয়!—ইহাই ভব-রাস-মঞ্চে সর্ব্বান্তর্যামী আনন্দময় পরমাত্মার সহিত অহংবিজয়ী বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন জীবাত্মার মহা-

* হৃষীক=ইন্দ্রিয়; ঈশ=কর্ত্তা বা অধিপতি, সুতরাং হৃষীকেশ=ইন্দ্রিয়াধিপতি।

সম্মিলন বা ব্যষ্টি রাসলীলা! অতঃপর বিশুদ্ধ অহংকারের রাস-মঞ্চে বা দোল-মঞ্চে গোপীভাবাপন্ন বিশুদ্ধ জীব, মহাশক্তিময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেম-বিলাসে মগ্ন হন এবং প্রেম দোলায় প্রেমানন্দে দোলাইত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া থাকেন!—এইরূপ প্রেমানন্দের লীল-খেলা সাধকের বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে সমভাবে চলিতে থাকে! বহির্জগতে ভগবৎ লীলাতত্ত্ব স্বতঃই স্ফুরিত হইতে থাকে, আর অন্তর্ম্মুখী অবস্থায় সাধক ইষ্ট দেব-দেবীর প্রতি মানসোপচারে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক স্তব-স্তুতি করিতে থাকেন; তাঁহার দেহে বিভিন্ন প্রকার নাদের অভিব্যক্তি হয় এবং ভগবৎ বিলাস হেতু পুলক কম্পন ও বৈবর্ণাদি সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহও প্রকাশ পাইয়া থাকে!—ইহাই যথাক্রমে মন্ত্রোক্ত (১) দেবগণ ও মহর্ষিগণের স্তব, (২) গন্ধর্ব্বগণের জয়গান এবং (৩) অপ্সরাগণের নৃত্য!!—(৪২—৪৩)

এক্ষণে আসুন পাঠক পাঠিকাগণ! আমরাও প্রেমানন্দদায়িনী করুণারূপিণী ভক্তবৎসলা দুর্গামাতার শ্রীচরণ-সরোজে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করত আমাদের মায়িক অহংকারকে অবনমিত ও বিশুদ্ধ করি।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

পুরুষকার এবং দৈব—এতদুভয়ের যুগপৎ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি, যথা—"দৈবানুকূলতা শক্র শক্ত পৌরুষ চেষ্টিতম্। ফলতে সর্ব্বলোকানাং কৃষেবৃষ্টিরিব স্বয়ং॥"—দেবীপুরাণ, ২০অ (১১ শ্লোক)। অর্থাৎ হে শক্র! বৃষ্টিরূপ দৈবের অনুকূলতা হইলেও, কৃষিকার্য্য পুরুষকার-সাধ্য; পুরুষকারের শক্তিময় চেষ্টার সহিত, দৈবের অনুকূলতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সর্ব্বলোকের যথাযথ ফল প্রদান করিয়া থাকে।

মধ্যম চরিত্র

চতুর্থ অধ্যায়—শক্রাদি স্তুতি

ঋষিরুবাচ ॥ ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ ॥ ২

সভ্য বিবরণ।—ঋষি কহিলেন—দেবী মহালক্ষ্মী, মহাবলশালী দুরাত্মা মহিষাসুর এবং তদীয় অসুরসেনা নিহত করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ গ্রীবা এবং স্কন্ধ অবনমিত করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন; স্তবকালীন প্রহর্ষ ও আনন্দজনিত পুলক (রোমাঞ্চ) হওয়ায়, দেবগণের কলেবর পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিল।—(১।২)

তত্ত্ব সুধা।—সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেবগণ মহামায়া মায়ের অসুর দলন-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইয়াছেন—তাঁহাদের অন্তর বাহির আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবতীর সর্ব্ববিমোহন জ্যোতির্ম্ময়ীরূপ সন্দর্শন এবং তদীয় মহাবীর্য্যময়ী নানাবিধ লীলা আস্বাদনে ও পরিচিন্তনে দেবগণ প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; তাই তাঁহাদের দিব্য মুকুট-শোভিত উচ্চ শির ও সুচারু দেহ ভূমিতে অবনমিত হইয়া মাতৃ-পদে লুটাইয়া পড়িয়াছে! কি দেবগণ, কি মানবগণ, সকলের নিকটেই প্রণাম মহাযজ্ঞ স্বরূপ *। দেবগণ কায়মনোবাক্যে প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন—গ্রীবা ও স্কন্ধের অবনমন, প্রণতি এবং দেহের পুলক দ্বারা কায়িক প্রণাম; কৃতজ্ঞতাময়

---

*"নমস্কারো মহাযজ্ঞঃ প্রীতিদঃ সর্ব্বতঃ সদা। সর্ব্বেষামেব দেবানামন্যেষামপি ভৈরব ॥"
"ত্রিকোণমথ ষট্‌কোণমর্দ্ধচন্দ্রং প্রদক্ষিণম্। দণ্ডমষ্টাঙ্গমুগ্রঞ্চ সপ্তধা নতি লক্ষণম্ ॥"
—কালিকা পুরাণ ৬৬অ—২০।৬ শ্লোক।

প্রহর্ষ বা আনন্দভাব দ্বারা **মানসিক** প্রণাম এবং স্তুতিমূলক অপূর্ব্ব বাক্য-বিন্যাস দ্বারা **বাচিক** প্রণাম সূচিত হইয়াছে। এতৎ ব্যতীত এই স্তবরাজিতে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মভাবেরও সুন্দর অভিব্যক্তি হইয়াছে। জাগতিক বিধানে প্রণামের পাত্রটির ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য যতই প্রণামকারীর জ্ঞান-বুদ্ধির গোচরীভূত হইতে থাকে, যতই প্রণম্যের মহত্ত্ব বা বিশালত্ব উপলব্ধি হইতে থাকে, ততই স্বাভাবিক নিয়মে প্রণামকারীর মস্তক প্রণম্যের চরণে আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাতে **জ্ঞানের** ভাব অভিব্যক্ত। বৃক্ষ যেমন ফলভরে অবনত হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর চিত্তও জ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণতি পূর্ব্বক প্রশান্তি লাভ করে। ক্রমে সাধক সশ্রদ্ধ আত্ম-নিবেদন-রূপ প্রেম-যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন—ইহাদ্বারা সাধকের জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ক্রমে **প্রেম-ভক্তিতে** পরিণত হয়। তখন প্রেমিকভক্ত কায়মনোবাক্যে মহাশক্তিময় ভগবানের স্তব-স্তুতি ও গুণানুবাদ বা প্রশংসাময় কীর্ত্তন দ্বারা দিকদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলেন!—এই প্রকার ভগবৎ উপাসনাতে কর্ম্ম-ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং স্তবাদিতে জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মের বিকাশ স্বাভাবিক!

আর্য্যঋষিগণ প্রণাম ও স্তব-স্তুতির অপূর্ব্ব ক্রিয়াশীলতা এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াই—বেদ-বেদান্ত, যোগ-শাস্ত্র এবং তন্ত্র পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে স্তব-মালার অপূর্ব্ব বিন্যাস্ করত বিশ্ববাসীকে অমূল্য সম্পদ্ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দেবী-মাহাত্মের স্তবরাজিও, শ্রুতি স্মৃতি, এবং দর্শনাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসম্মত অপূর্ব্ব মন্ত্র-বিন্যাস! এই অভূতপূর্ব্ব স্তবমালা নিয়মিতভাবে পাঠ করিলে, মন্ত্র-ধ্বনি পাঠকের অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক চিত্ত-ক্ষেত্র সুনির্ম্মল করিয়া দিবে!—চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত-একাগ্রতার এমন সহজ সরল সাধনা আর নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই গীতা ও

চণ্ডীর স্তব-সমূহ শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

মাতৃকৃপায় অহংকারের বহির্ম্মুখী সূক্ষ্ম ক্রিয়াশীলতা সর্ব্বপ্রকারে নিরোধ হইয়াছে—এইরূপে দুঃখদায়ী অনাত্ম ও অজ্ঞানতামূলক ভাবসমূহ উপশমিত হওয়ায়, সাধক কায়মনোবাক্যে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া আত্মময় এবং মহাশক্তিময় ভগবচ্চরণে শরণাগত হইয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত মানবের আত্মভাব বা ভগবৎ ভাবের সহিত আত্মীয়তা না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত অহংকার বিশুদ্ধ হইয়া মাতৃ-চরণে অবনত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহাকে দুরাত্মা বলা যাইতে পারে। এইরূপে যতই আত্মার দুরত্ব বা দুঃখদায়ক অনাত্ম-ভাব বিদূরিত হইয়া ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ হয়, ততই বিশুদ্ধ জীব-ভাব, পরমাত্মভাবে অবনমিত হইয়া পড়ে এবং আত্ম-নিবেদনের মহাযজ্ঞ ক্রমে সুসম্পন্ন হয়—ইহাই মন্ত্রে মহিষাসুরকে দুরাত্মা বলার তাৎপর্য্য।

স্তব-স্তুতি দ্বারা সাধকগণ নিজেদেরই আত্মোন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। ভগবান বা ভগবতী মায়ের পক্ষে স্তুতি নিন্দা বা গালিবর্ষণ সকলই সমান—কেননা ভক্ত যেমন অভীষ্ট-সিদ্ধিতে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা ইষ্ট দেব-দেবীর স্তব স্তুতি করেন, আবার ত্রিতাপ-তাপে তাপিত হইয়া অভিমানভরে তাঁহাদিগকে গালি প্রদান করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হন না—কিন্তু পরমাত্মময়ী মা সকল অবস্থাতেই 'অম্লান বদনা, প্রেম-করুণায় পরিপূর্ণা! সুতরাং স্তবরাজি জীব-জগতের সর্ব্বতোমুখী কল্যাণের জন্যই ব্যবস্থিত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় আনন্দ লহরী স্তবে মাকে বলিয়াছেন—"হে মাতঃ! সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমি বাক্যসমূহের জননী বিধায়, আমি তোমার বাক্যদ্বারাই তোমার স্তব করিলাম!—ইহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই"!—ইহাও অতি সুন্দর স্তব সমর্পণ।

"তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকাকার, এই শ্লোকে শ্রী, মায়া, কাম এবং

বাগ্‌ভব বীজ উদ্ধার করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের স্তব সমূহ মহর্ষিগণ এবং দেবগণ সমবেত ভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের উক্তিদ্বারা এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে—"যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ" এই দেব্যুক্তিদ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত। দেবগণের পিতৃ-পিতামহ-স্বরূপ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা ভৃগু এবং কশ্যপাদি মহর্ষিগণও দেবতুল্য এবং তাঁহারাও দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াই স্তব করেন ; এজন্য মন্ত্রে মহর্ষিদের কথা এখানে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই।—(১।২)

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ৩

[স্তব মন্ত্র সমূহের অনুবাদ এবং শব্দানুগত ব্যাখ্যা এখানে স্তবাকারে পর পর বিবৃত হইল ; এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট তাৎপর্য্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যার পর বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল।]

সমগ্র দেব-শক্তিসম্ভবা যে দেবী নিজ শক্তি দ্বারা এই সমুদয় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, নিখিল দেব-মহর্ষিগণের পূজনীয়া সেই অম্বিকা দেবীকে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি ; তিনি আমাদের সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণ বিধান করুন—(·)॥ মাগো জগজ্জননি! তুমিই আত্ম-শক্তি প্রভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছ ; তুমিই পরমাত্ম-শক্তিরূপে কিম্বা আত্মময় পুরুষ এবং শক্তিময় প্রকৃতিরূপে এই জীব জগত প্রসারিত বা উৎপাদন করিয়াছ। তোমাকে কেহই প্রকাশ করিতে পারেনা, অথচ তুমিই সমস্ত প্রকাশ করিয়া থাক ; কেননা তুমি যে দ্যোতনশীলা—স্বয়ং স্বপ্রকাশ স্বরূপ ; তোমারই ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে জীবাত্মার সহিত মহাশক্তিময় পরমাত্মার মিলন সংসাধিত হইয়া থাকে। হে জগদম্বে। সমস্ত দেবগণের তেজরাশি বা শক্তি সমূহ

একত্রিত হইয়া তোমার বিশ্ব-বিমোহন দুর্গামূর্ত্তি সুগঠিত হইয়াছে; কিম্বা নিখিল দেবগণের পরিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহ একমাত্র তোমারই জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তি হইতে সম্ভূত!—তুমিই সর্ব্ব কারণেরও কারণস্বরূপা; বিশেষতঃ মহৎ আদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সমূহের কার্য্যোৎপাদন সামর্থও একমাত্র তোমা হইতে সতত উৎসারিত! মাগো অম্বিকে! দেবগণ ও মহর্ষিগণ সতত ভক্তিভরে তোমার পূজা করিয়া থাকেন, আমরা ভক্তি-হীন, নতি বিহীন, তোমার মহাপূজা করিবার সামর্থ্য কোথায়?—প্রেম-ফুলে এবং অশ্রু-জলে নাকি তোমার সর্ব্বোত্তম পূজা হয়; কিন্তু আমাদের যে কোন সম্বলই নাই!—মহাপুজার যে কোন উপকরণই সংগৃহীত হয় নাই।—তথাপি তুমি যে মা—অজ্ঞান এবং অসমর্থ সন্তানগণের প্রতি যে তোমায় অহেতুকী করুণা অধিক পরিমাণে বিতরিত হয়!—তাই অযোগ্য হইলেও তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তুমি আমাদের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ সাধন কর—বিশ্বের অমঙ্গল বিদূরিত হউক।—(৩)।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ ৪

ভগবান অনন্ত, ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরও যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব এবং সামর্থ্য বর্ণনা করিতে অসমর্থ, সেই চণ্ডিকা দেবী সমুদয় জগত পরিপালন করিতে এবং অমঙ্গলজনিত ভয় বিনাশ করিতে ইচ্ছা করুন॥—(৪)॥

হে বিশ্ব-জননি! জগত পরিপালক সহস্রবদন মহাবল অনন্তদেব সহস্রমুখে তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়াও তোমার অপরিসীম সামর্থ্যের কিছুমাত্রও কীর্ত্তন করিতে পারেননা! জগৎস্রষ্টা চতুরানন ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে বেদস্তুতি দ্বারাও তোমার গুণগান করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। বিশ্ব-সংহরণকারী জ্ঞানময় পঞ্চানন, অনন্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও তোমার

অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রভাব বর্ণন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ! এজন্য একমাত্র তুমিই তোমাকে জানিতে পার; অন্য কেহ তোমার কণামাত্রও জানিতে বা প্রকাশ করিতে পারেন না!—কেননা, অংশ হইয়া পূর্ণকে কিরূপে প্রকাশ করিবে?—সসীম হইয়া কিরূপে অসীমকে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে! তাই পরমভক্ত পুষ্পদন্ত, মহিমা বর্ণন-স্তবে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণবর্ণ গিরি যদি কালী (কিম্বা কালীর গুড়িকা) স্বরূপ হয়, জলধি যদি পাত্র হয়, নন্দনের পারিজাত-শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পাত্র হয়, স্বয়ং সরস্বতী যদি অনন্তকাল ব্যাপিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি হে প্রভো! তোমার গুণ বর্ণনা শেষ হইবেনা"। মহাশক্তিরূপিণি মা! তুমি আমাদের অসদ্বৃত্তিরূপ অসুরভয় এবং সর্ব্ববিধ অশুভ বিনাশ কর—মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদানে ধন্য কর!—আমাদের মতি তোমার অভয় শ্রীপাদ-পদ্মে লগ্ন হইয়া পদারবিন্দের মকরন্দ-পানে চিরতরে বিভোর হউক!—আমরা মা-মা বলিয়া যেন আত্ম-নিবেদন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারি।—(৪)

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৫

হে দেবী! তুমি সুকৃতিশালী জনগণের ভবনে শ্রীরূপা, তুমি পাপাত্মাদিগের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, জ্ঞানী বা বিবেকিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপা, সজ্জনগণের চিত্তে শ্রদ্ধারূপা, সৎকুলজাত জনগণের হৃদয়ে তুমি লজ্জারূপা এতাদৃশী তোমাকে আমরা প্রণাম করি, হে দেবি! তুমি এই বিশ্ব পরিপালন কর!—(৫)॥ সদসৎরূপিণি মা! তুমিই পুণ্যবানদিগের গৃহে বহিরঙ্গভাবে ধন ধান্যাদি সম্পদরূপা শ্রী, আর অন্তরঙ্গভাবে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যরূপিণী মহালক্ষ্মী; আবার তুমিই পাপাচারিগণের গৃহে নিরন্তর

বিপদ ও দুঃখরূপা অনৈশ্বর্য্য বা অলক্ষ্মী! তাই ঋষিগণ তোমারই উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যায় নমঃ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। জ্ঞানায় নমঃ অজ্ঞানায় নমঃ॥ বৈরাগ্যায় নমঃ অবৈরাগ্যায় নমঃ। ধর্ম্মায় নমঃ অধর্ম্মায় নমঃ॥" হে মাতঃ! তোমার এবম্বিধ বিষামৃতের সংমিশ্রণযুক্ত মহাকারণময় অপূর্ব্ব ভাব মন-বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা যায়না, এজন্য উহা অচিন্ত্য এবং অজ্ঞেয়। হে মাতঃ! তুমিই বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল-চিত্ত মনীষিগণের হৃদয়ে স্বর্গাপবর্গদাতা অধ্যাত্ম বুদ্ধিরূপা; তুমিই বেদমার্গানুগামী সজ্জনগণের হৃদয়ে আস্তিক্য-বুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা। সৎকুলজাত সদাশয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে তুমিই অকার্য্যে বৈমুখ্যরূপা লজ্জা! হে সর্ব্বরূপিণি মা! সর্ব্বকারণের কারণ হইলেও তুমি এই প্রকারে সম্যক্‌রূপে বিশ্ব রক্ষা ও পালন কর—তোমাকে আমরা বিনয়-ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি। [পূর্ব্ব মন্ত্রে দেবীর সর্ব্ব কারণত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; আর এই মন্ত্রে কার্য্যরূপেও যে একমাত্র দেবী বিরাজিতা, ইহা প্রকাশ করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী—অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ ভাবেও মহামায়া মায়ের একাধারে দ্বিবিধ অভিব্যক্তি, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।]—(৫)

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৬

হে দেবি! মনবুদ্ধির অগোচর তোমার এই রূপ, আমরা বাক্যদ্বারা কিরূপে বর্ণনা করিব! অসুর-ক্ষয়কারী তোমার অমিত বিক্রম, যুদ্ধে অসুরগণ ও দেবগণাদি বিষয়ে তোমার অনুপম কার্য্যকলাপ, সকলকে অতিক্রম করিয়াছ—কিরূপে উহা বর্ণনা করিব?—(৬)॥ হে সর্ব্বপ্রকাশিকে! মন-বুদ্ধির অগোচর চিন্তাতীত তোমার সেই অরূপ জ্যোতির্ম্ময় রূপ—যাহা সর্ব্ব কারণের কারণ, যে রূপ-সাগরের কণিকা

বা বিন্দুমাত্র জাগতিক সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া জীবমাত্রকেই রূপ-মুগ্ধ করিতেছে—বিশ্বের সমস্ত রূপময় সৌন্দর্য্যরাশি যে জ্যোতির্ম্ময় মহাকেন্দ্র হইতে সতত উৎসারিত, সেই পরম রূপময়ীর রূপ স্তব-বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা অসম্ভব। হে শক্তিরূপিণি মা! অসুর-দেহে অমিত বল-বীর্য্য ও সামর্থ রূপেও তোমারই অচিন্তনীয় বিকাশ। এইরূপে রণ-ক্ষেত্রে তোমার অনুপম শক্তি লীলা-চাতুর্য্য আমরা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ—কেননা উহা যে অব্যক্ত এবং অসীম!—(৬)

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৭

হে দেবি! তুমি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী হইয়াও জগতের মূল কারণ স্বরূপা; তুমি রাগাদি দোষের বিষয়ীভূত নহ; তুমি অসীম, এজন্য হরি-হরাদি দেবগণেরও অজ্ঞেয়া; তুমি সর্ব্বাশ্রয়া; এই নিখিল জগৎ তোমারই অংশমাত্র; তুমিই বিকারবিহীনা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।—(৭) হে মহাকারণরূপিণি জগজ্জননি! তুমিই সমস্ত জগত সৃষ্টির হেতু বা নিমিত্ত কারণ; আবার তুমিই ত্রিগুণময়ীরূপে জগতের উপাদান কারণ। তুমিই রজোগুণময়ী ব্রাহ্মী বা ক্রিয়া-শক্তিরূপে জগত সৃজন কর; তুমিই সত্ত্বগুণময়ী বৈষ্ণবী বা ইচ্ছা-শক্তিরূপে জগত পালন কর; আবার তমোগুণময়ী রুদ্রাণী বা জ্ঞান-শক্তিরূপে তুমিই জগত সংহরণ কর—অতএব সৃষ্টি,স্থিতি-প্রলয়াত্মক ত্রিবিধ কার্য্যের তুমিই একমাত্র হেতু। এইরূপে ত্রিগুণময়ী হইলেও, তুমি রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের অতীতা অন্তহীনা এবং অজ্ঞেয়া; এজন্য বিরিঞ্চি, হরি, হরাদি পর্য্যন্ত কেহই তোমাকে জানিতে পারেন না! সুতরাং অনন্ত দোষে দোষী জীব কিরূপে তোমাকে জানিবে? তবে 'তুমি যাহাকে জানাও, তিনিই কেবল জানিতে

পারেন'—এই মহাজন বাক্য সত্য; তাই তোমার অহেতুকী কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। হে জগদম্বে! এই জগত তোমারই অংশ স্বরূপ; অর্থাৎ তোমার একপাদে পরিবর্ত্তনশীল জীব-জগত, আর অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতময়—এইরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। মহামায়া মা! ত্রিগুণময় অনন্তভাবে বিকৃত ও বিভাবিত হইয়াও তুমি অব্যাকৃতা বা বিকার রহিতা এবং বাক্য দ্বারাও অনভিব্যক্তা। তুমিই আদ্যা (নিত্যা, মূলা প্রকৃতিরূপা) পরমা প্রকৃতি। যোগমায়া রূপিণি মা! তুমি পরমেশ্বরকে পর্য্যন্ত জীবভাবাপন্ন করিয়া বন্ধন করিতে সমর্থা!—এমনি অপরিসীম তোমার শক্তি এবং দুজ্ঞের্য় তোমার স্বভাব! হে বিশ্বজননি! 'আদ্যা'রূপে তুমি সন্ময়ী সন্ধিনী-শক্তি; 'অব্যাকৃতা'রূপে তুমি চিন্ময়ী সংবিদা-শক্তি; আবার পরমারূপে তুমিই আনন্দময়ী হ্লাদিনী শক্তি—এইরূপে তুমিই একাধারে ত্রিমূর্ত্তিরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া বা যোগমায়া!—(৭)

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রযাতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৮

হে দেবি! সমস্ত দেবগণ, সর্ব্ববিধ যজ্ঞে যাঁহার উচ্চারণে তৃপ্তি লাভ করেন—তুমিই সেই 'স্বাহা' মন্ত্র এবং পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু বলিয়া লোকে তোমাকেই 'স্বধা' মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন।—(৮)॥ হে মন্ত্র-রূপিণি মা! অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমূহে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরিতৃপ্ত হন, কেননা তুমিই যে স্বয়ং সেই মন্ত্ররূপা! আবার শব্দ ও মন্ত্রাদি সকলই রূপময়—তাই দেবগণ তোমার রূপময়ী এবং শব্দময়ী 'স্বাহা' রূপটী দর্শন, শ্রবণ এবং আস্বাদন করিয়া পরিতুষ্ট হন! আবার শ্রাদ্ধাদি পিতৃ-যজ্ঞে 'স্বধা' মন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি

আনয়ন করা হয়—তুমিই যে তৃপ্তিদায়িনী 'স্বধা'রূপা—তোমার 'স্বধা' রূপটী দর্শন শ্রবণ ও আস্বাদন করিয়াই যে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত ও পুলকিত হন! হে জগজ্জননি! স্বাহা-স্বধা উপলক্ষণ মাত্র—কেননা তুমি যে বাঙ্‌ময়ী ও শব্দময়ী!—তুমি যে সমস্ত মন্ত্রের আধার এবং আধেয়—স্বয়ং মন্ত্ররূপিণী!—(৮)

যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে * সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ ৯

হে দেবি! যে বিদ্যা মুক্তির হেতু এবং দুরনুষ্ঠেয় মহাব্রত যে বিদ্যার বিষয়ীভূত, তুমিই সেই ব্রহ্মজ্ঞানরূপা ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনভূতা পরমা বিদ্যা (ব্রহ্ম-বিদ্যা); অতএব জিতেন্দ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মোক্ষার্থীগণ এবং রাগাদি দোষবিহীন মুনিগণ ব্রহ্ম বিদ্যারূপা তোমাকে সাধনা করিয়া থাকেন—(৯) হে ব্রহ্ম-স্বরূপিণি মা! অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ এবং শৌচ-তপাদি যম-নিয়মের কঠোর সাধনাদ্বারা আত্ম-শোধন করত যে বিদ্যা লাভ করিতে হয়, মুক্তির কারণস্বরূপা সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা তুমি, সুসংযত এবং রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে বিমুক্ত মুমুক্ষুগণ এবং মুনিগণ মহাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী তোমায়ই উপাসনা করিয়া থাকেন।

[চণ্ডী গ্রন্থের "দেবী-ভাষ্য" টীকাকার. কেনোপনিষদে বিবৃত হৈমবতী উমা এবং দেবগণের দর্পচূর্ণ বিষয়ক প্রথম খণ্ডে বর্ণিত উপাখ্যানটী এই মন্ত্রে উদ্ধার করিয়া তদনুযায়ী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করা হইল—"ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃগণ (ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতি দেবগণ)-

---

* মন্ত্রোক্ত অভ্যস্যসে কথাটীর সহিত গীতার 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়' উক্তির সাদৃশ্য আছে। সাধনায় অগ্রসর হওয়াই অভ্যাস যোগের ফল। অভ্যাস শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ—অভি=সম্মুখে; অস্=ক্ষেপণ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতি লাভ।

মৌনাবলম্বী * হইয়া, সুসংযত দোষমুক্ত ও মোক্ষপ্রার্থী হইলে, যিনি মুক্তিদায়িনী অচিন্তনীয়া মহাব্রতশালিনী (উমা) রূপে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন, হে দেবি! তুমিই সেই ভগবতী পরমা বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানদায়িনী]—(৯)

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধান-
মুদ্‌গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ১০

হে দেবি! তুমি শব্দ-ব্রহ্মস্বরূপা, তুমি সুবিমল ঋক্‌ ও যজুর্ব্বেদের আশ্রয়; তুমি উদাত্তাদি স্বরযোগে রমণীয় পদপাঠযুক্ত সামবেদেরও আশ্রয়; আবার তুমি ত্রয়ী বা বেদত্রয়রূপা; তুমিই অখিল ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা ও পালনকারিণী ভগবতী; তুমিই বার্ত্তা বা বৃত্তিরূপা; তুমিই জগতের সমস্ত দুঃখহারিণী এজন্য পরমা বা শ্রেষ্ঠা।—(১০)। হে বেদমাতা গায়ত্রীরূপিণি শব্দব্রহ্মময়ি মা! তুমিই মূলাধার হইতে মণিপুর, পর্য্যন্ত স্থূলভাবাপন্না বৈখরী নাদরূপে প্রকাশিতা হও, তুমিই প্রাণময় অনাহত-চক্রে সূক্ষ্মভাবাপন্না মধ্যমা নাদরূপে, ব্যোম্‌তত্ত্বময় বিশুদ্ধ-চক্রে কারণভাবাপন্না পশ্যন্তী নাদরূপে এবং আজ্ঞা-চক্রে মহাকারণ ক্ষেত্রে বা মহাকাশে তুরীয়ভাবাপন্না পরা নাদরূপে ধ্বনিতা হও! আবার সর্ব্ববিধ শব্দ, মন্ত্র এবং নাদের সমন্বয়ে তুমিই ওঙ্কার বা প্রণবরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাক!—তাই তুমি 'শব্দাত্মিকা' বা বাঙ্‌ময়ী! হে বেদত্রয়রূপিণি মা! তুমিই ঋষিগণের বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত চিত্ত সত্যময়

* ক্ষুদ্র তৃণ নাশেও অসমর্থ হইয়া, দেবগণ লজ্জায় মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। আর মন্ত্রোক্ত ইন্দ্রিয়-তত্ত্বের সারই ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ; তাঁহাদের গর্ব্বাদি অপগত, এজন্য—'অস্ত সমস্ত দোষ'; তাঁহাদের অভ্যাসে বা সম্মুখে অবিচিন্ত্য মহব্রতা উমা আগমন করিলেন—'দেবী-ভাষ্য'

অনুভূতি বা সম্বেদনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলে—উহাই বেদ! সেই সম্বেদনগ বাঙ্‌ময় বা শব্দময় বিক্ষিপ্ত মন্ত্ররাজরূপে সুশোভিত করিয়া তুমি ঋক্‌বেদের সৃষ্টি করিয়াছ; অতঃপর স্বরহীন তালমানহীন মন্ত্রসমূহ ঐক্যবদ্ধ করিয়া তুমিই যজুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিয়াছিলে; তৎপরে বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহকে তালমানলয়ে উচ্চৈঃস্বরে বা উদাত্তস্বরে গীতের ব্যবস্থা করিয়া তুমিই সামবেদের সুবিকাশ করিয়াছিলে। হে পরমাত্মময়ি মা! নির্গুণ বা গুণাশ্রয় হইলেও, এইরূপে গুণময় ও সগুণভাবাপন্ন * হইয়া নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ বেদত্রয়রূপেও তুমিই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছ। মা! তুমিই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক শান্ত-ঘোর-মূঢ় কিম্বা প্রকাশ-প্রবৃত্তি-মোহ; তুমিই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, দেশ কাল পাত্র প্রভৃতিরূপে আপনাকে অনন্ত ত্রিধা-মূর্ত্তিতে বিভক্ত করিয়া 'ত্রয়ী' রূপ ধারণ করিয়াছ! হে দেবি! তুমিই সকলার্থ প্রকাশিকা সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী মহাদেবী ভগবতী; তুমিই সংসারে জীবকে মায়াবদ্ধ করিয়া সংসারস্থিতির কারণ সংঘটনপূর্ব্বক, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ; আবার তুমিই সংসার-প্রবৃত্তিতে বিচ্ছেদ † ঘটাইয়া জীবকে মুক্তি প্রদানে ধন্য করিতেছ। হে সর্ব্বরূপিণি মা! তুমিই কৃষি, বাণিজ্য, গোপালনাদি বৃত্তিরূপা বার্ত্তা বা জীবিকা! আবার তুমিই কালরূপে ভূতগণকে সংসার-কটাহে পাক করিতেছ!—ইহাও তোমার অপূর্ব্ব বার্ত্তা! তথাপি মা তোমার করুণার শেষ নাই—তুমিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গারূপে নিখিল জগতের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হরণ করিয়া থাক! তাই তুমি পরমা পরমেশ্বরী বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা!—ইহাও

* গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন"—হে অর্জ্জুন! বেদসকল ত্রিগুণাত্মক্, তুমি গুণাতীত হও।

† ভবস্য সংসারস্য প্রবৃত্ত বিচ্ছেদায় ইতি—নাগোজী; অন্যরূপ ব্যাখ্যা—ভাবনায় —অনুবর্ত্তনায়, অর্থাৎ সংসারে বদ্ধ করিবার জন্য।

জগতের পক্ষে সর্ব্বোত্তম বার্ত্তা বা সুসংবাদ। [পূর্ব্ব মন্ত্রে, দেবীকে ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যারূপে স্তব করা হইয়াছে ; এই মন্ত্রে—পরাবিদ্যা বা মহাবিদ্যা লাভের হেতুভূতা, বেদ-বিদ্যা বা অপরা-বিদ্যা পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। চণ্ডী-সাধক মহাবিদ্যা, বিদ্যা, অবিদ্যা সমস্তই মাতৃময় ও শক্তিময়রূপে দর্শন এবং অনুভব করিবেন—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।]—(১০)

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥ ১১

হে দেবি ! তুমি অখিল শাস্ত্র জ্ঞানদায়িনী মেধা (সরস্বতী) ; তুমিই দুস্তর ভব-সাগর-পারে তরণীস্বরূপা, দুর্জ্জেয়া অসঙ্গা দুর্গা ; তুমিই নারায়ণের হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী বা কমলা ; তুমিই শশিশেখরের হৃদয়-বিহারিণী গৌরী —(১১)।

হে মহামেধারূপিণি মা। তুমিই মানবের চিত্ত-ক্ষেত্রে অনন্ত শাস্ত্রার্থ এবং বেদান্ত-প্রকাশিকা শাস্ত্রোজ্জ্বলা 'ধী' বা ধারণাবতী মেধারূপিণী সরস্বতী ; তুমিই শরণ গত ভক্ত সাধকের প্রাণময় ক্ষেত্রে মধু-কৈটভবিনাশকারী মহাপ্রাণরূপী শ্রীহরির হৃদয়-পদ্ম-বিহারিণী শ্রী বা লক্ষ্মীরূপা অর্থাৎ তুমিই শরণাগত ভক্ত সাধকের হৃদয়-প্রদেশ, আধ্যাত্মিক সম্পদ্ দ্বারা বিভূষিত করিয়া থাক ; আবার তুমিই শশাঙ্ক-শেখর হরের অঙ্ক-সুশোভিনী গৌরীরূপে ভক্তকে জ্ঞান বিতরণ দ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাক। মেধারূপে তুমি সৃজনকারিণী ব্রাহ্মীশক্তি সরস্বতী ; বৈষ্ণবী-শক্তিরূপে তুমি পালনকারিণী কমলা এবং মাহেশ্বরী-শক্তিরূপে তুমি লয়কারিণী গৌরী ; আবার দুর্গারূপে তুমি এই ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়রূপা ত্রিগুণময়ী মহাদেবী এবং ত্রিগুণের

আশ্রয়স্বরূপা গুণাতীতা পরমাত্মময়ী মহামায়া।—(১১)॥

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥ ১২

পূর্ণচন্দ্রসদৃশ নির্ম্মল, উৎকৃষ্ট সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পরম রমণীয় ঈষৎহাস্যবিশিষ্ট তোমার বদন-মণ্ডল অবলোকন করিয়াও যে মহিষাসুর বলপূর্ব্বক প্রহার করিতে পারিয়াছে, ইহা অতি অদ্ভুত; কিম্বা মহিষাসুর ক্রোধবশে তোমাকে দেখিয়া (বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই) সজোরে প্রহার করিয়াছে, তথাপি তোমার বিমল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অতি উত্তম কনককান্তি তুল্য কমনীয় শ্রীমুখখানা ম্লান হয় নাই। বরং মৃদুমন্দ হাস্যেরই বিকাশ হইয়াছিল!—ইহা অতি অদ্ভুত বটে!—(১২)॥ মাতৃ-স্তন্যপানে নিরত অজ্ঞান-শিশু মাতৃক্রোড়ে হস্ত-পদাদি সঞ্চালনদ্বারা আঘাত করিলেও সন্তানের মাতা যেমন কুপিতা হন না, বরং তাঁহার স্নেহমুগ্ধ বদনে হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠে; তেমনি-ভাবে; হে বিশ্ব-জননি! তোমার চিন্ময়-দেহে, অজ্ঞানান্ধ মহিষাসুরের প্রহাররূপ ক্রীড়া দ্বারাও তুমি ক্রুদ্ধা হও নাই! বরং তোমার বদন কমলে মধুময় হাস্যেরই বিকাশ হইয়াছিল। [চণ্ডভাবের লক্ষণ—ভ্রুকুটি-কুটিলতা, ভীষণতা এবং রক্তিমতা; কিন্তু মহিষাসুরের কোপময় প্রহারসত্ত্বেও মাতৃ-বদনে এই লক্ষণত্রয়ের একটীও প্রকাশ পায় নাই! বরং উহাদের বিপরীত সৌম্য ভাবেরই বিকাশ হইয়াছিল; এজন্য যুদ্ধের সময়ে ঋষি, মাকে বলিয়াছিলেন—'অনায়স্তাননা দেবী' মায়ের চণ্ডভাব পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রকাশ পাইবে]—(১২)

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটিকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।

প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈ র্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ ১৩

হে দেবি! ক্রোধাবিষ্ট ভ্রূকুটি-করাল উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রসদৃশ (ঈষৎ রক্তবর্ণ) তোমার বদন দর্শন মাত্র মহিষাসুর যে তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ত্যাগ করে নাই, ইহা অতি আশ্চর্য্য; কারণ কুপিত যম-দর্শনে কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে?—(১৩)॥ হে জগজ্জননি! সংসারে দেখা যায়—জননী কুপিতা হইয়া নিজ সন্তানকে ভয় দেখাইয়া বলেন—'মেরে ফেলব', 'কেটে ফেলব' ইত্যাদি; তথাপি ক্রুদ্ধা হইলেও মা মনে-প্রাণে সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন না; বরং অবাধ্য, দুষ্ট ছেলের প্রতিই তাহার স্নেহদৃষ্টি বিশেষ বৃদ্ধি পায়! সেই স্বাভাবিক নিয়মে, হে জগদ্ধাত্রি মা! তুমি কুপিতা হইয়াছিলে বটে, কিন্তু তুমি যে মা!—তুমিতো মাতৃত্ব হারাইয়া যমরূপে পরিণত হও নাই!—তাই মহিষাসুর তোমার চণ্ডমূর্ত্তি দর্শনে বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই; আর উদীয়মান চন্দ্রালোকে যেমন ক্রমশঃ রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে, সেইরূপ হে জগদম্বে! তোমার পূর্ণচন্দ্রসদৃশ আনন দর্শনে মহিষাসুরের অজ্ঞানান্ধ্য ক্রমে বিলয় পাইতেছিল!—তাই সে বিনষ্ট হয় নাই, বরং সাযুজ্য বা অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।—(১৩)॥

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য ॥ ১৪

হে দেবি! প্রসন্না হও; তুমি সর্ব্বোত্তমা—শ্রেষ্ঠা; তুমি প্রসন্না হইলেই জগতের কল্যাণ হইয়া থাকে; আর কুপিতা হইলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত কুল ধ্বংস করিয়া থাক। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম; যেহেতু মহিষাসুরের সুবিপুল সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়াছে!—(১৪)

মাগো! তুমি পরিতুষ্টা হইলেই জগতে শান্তি ও আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যায়—সকলেই প্রেমানন্দ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হয়! আবার তুমি রুষ্টা হইলে, জীবের দুঃখের অবধি থাকে না—বিপর্য্যয় প্রলয়রূপে সংসারকে গ্রাস করিতে যেন উদ্যত হয়!—তথাপি তোমার চণ্ডী-মূর্ত্তি জীব-জগতের মঙ্গলপ্রদ; আমরা মাতৃ-বিমুখ সন্তান, শরণাগত হওয়া তো দূরের কথা, আমরা অহংকারে মত্ত হইয়া তোমার প্রাণময় অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহি না! তাই হে চিন্ময়কল্যাণময়ি! আমাদের মঙ্গলের জন্যই তুমি চণ্ডীরূপ ধারণ করিয়া অপ্রীতিকর জাগতিক আঘাতদ্বারা আমাদের প্রাক্তন সংস্কার রাশি এবং মালিন্য বিশোধিত করিয়া দেও!—করুণাময়ী মা! তোমার ক্রোধময়ী মূর্ত্তির শাসনই আমাদিগকে মায়া-নিদ্রা হইতে জাগাইয়া, চৈতন্য সম্পাদন করে—ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে সচ্চিদানন্দে প্রতিষ্ঠিত করে! সুতরাং চণ্ডী-সাধকের দৃষ্টিতে তোমার শান্তমূর্ত্তি এবং প্রচণ্ডমূর্ত্তি উভয়ই সমান—উভয়ই জীব-জগতের মঙ্গলপ্রদ!—(১৪)

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৫

হে দেবি! তুমি যাঁহাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া সর্ব্বদা অভ্যুদয় দান কর, তাঁহারাই লোক-সমাজে পূজনীয় হইয়া থাকে; তাঁহাদেরই ধন-রত্নাদি লাভ হয়; তাঁহারাই যশোলাভ করিয়া থাকেন; তাহাদেরই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ কখনও বিনষ্ট হয় না; তাহারাই সুকৃতিশালী, তাহাদেরই পুত্র ভৃত্য ও ভার্য্যা প্রকৃত প্রস্তাবে বিনীত হইয়া থাকে—এজন্য তাহারা ধন্য—(১৫)॥ হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি মা! তোমার কৃপা যিনি লাভ করিতে সমর্থ, তিনি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন, এতৎব্যতীত তাঁহার প্রাণময় ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ আধ্যাত্মিক সম্পদেরও

অভ্যুদয় হইয়া থাকে—তিনি ভক্তি ধনে ধনী হন, যশোবিস্তারের ন্যায় তাঁহার আমিত্বের প্রসার হয়, তাঁহার চতুর্ব্বর্গাদি পুণ্য লাভ হয়; ভৃত্যরূপী যড়রিপুগণ তাঁহার বাধ্য থাকে—আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহার জ্ঞানরূপী বিনয়ী পুত্র এবং শান্তিরূপিণী ভার্য্যারও সম্যক্‌রূপে অভ্যুদয় হইয়া থাকে।—(১৫)

ধর্ম্মাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রযাতি চ ততো ভবতী প্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১৬

হে দেবি! তোমার প্রসাদে সম্মানপ্রাপ্ত পুণ্যবান জনগণ প্রতিদিন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সমস্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; তাহার ফলে তোমার কৃপায় স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করেন; এজন্য তুমি ইহলোক স্বর্গ এবং মোক্ষ এই ত্রিলোকেই ফলদাত্রী—(১৬) হে জগন্মাতঃ! তোমার জগতবাসী সন্তানগণ তোমাকে ঐহিক সুখ লাভের জন্য, পারত্রিক বা স্বর্গসুখ লাভের জন্য, সকামভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন; আবার কেহবা মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিষ্কামভাবে তোমার উপাসনা করেন; কিন্তু তুমি, ভিন্ন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন তোমার সকল সন্তানকেই যথাযোগ্যভাবে পরিতোষ বিধান করিয়া থাক; কেননা, তুমি যে স্নেহময়ী মা—তুমি যে প্রেম করুণার পারাবার!—(১৬)

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১৭

মা দুর্গে! দুর্গমে বা সঙ্কটে পড়িয়া একাগ্রচিত্তে তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি জীবগণের ভয় দূর করিয়া থাক; বিশেষতঃ সুস্থ অবস্থায় (সম্পদে) তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি ভক্তগণকে তত্ত্ব-

জ্ঞানের উপযোগী বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক ; হে দারিদ্র্য দুঃখ ভয়হারিণি মা! সকল জীবের উপকারার্থে সদা দয়ার্দ্র-চিত্তা একমাত্র তুমি ব্যতীত আর কে আছে ?—(১৭) হে জগজ্জননি! তুমি তোমার প্রিয়-মানব-সন্তানগণের মধ্যে কাহারও দারিদ্র্য নাশ করিয়া তাহাকে ঐহিক সুখভোগ প্রদান কর ; কাহারওবা দুঃখ নাশ করিয়া স্বর্গসুখ প্রদান কর ; আবার কাহারও ভয়-ভাবনা চিরতরে উপশমিত করিয়া কৈবল্য বা মুক্তি প্রদানে ধন্য কর। সচ্চিদানন্দময়ি মা! এইরূপে তুমি, স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ অবস্থাতে শরণাগত সাধকের কর্ম্ম-সংস্কার নাশ এবং কর্ম্মফল খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার অহমিকা ও মমতার দৈন্য ভাব বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর ; ক্রমে তাঁহার আসুরিক চাঞ্চল্য ও মালিন্য বিলয় করত আত্যন্তিক দুঃখ নাশপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কর ; পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে অমৃতত্ব বা পরমানন্দময় মোক্ষ প্রদানে ধন্য কর!—সুতরাং তুমিই জীব-জগতের ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ-দায়িনী, কর্ম্মফল খণ্ডনকারিণী করুণারূপিণী মা!—(১৭)॥

এভির্হতৈ র্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥ ১৮

হে দেবি! এই অসুরগণ নিহত হইলে, জগত যথার্থ সুখ লাভ করিতে পারে, পরন্তু ইহারা আর চিরকাল নরক গমনযোগ্য পাপানুষ্ঠান করিতে পারিবে না ; পক্ষান্তরে সম্মুখ-সংগ্রামে নিহত হইয়া, ইহারা স্বর্গে গমন করিতে পারিবে, এই মনে করিয়াই (অনুগ্রহ বুদ্ধিতে) তুমি জগতের অহিতকারী দৈত্যগণকে বধ করিয়াছ।—(১৮) হে মঙ্গলময়ি মা! তোমার সমস্ত কার্য্যই জগতের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; যাহা বাহ্য-দৃষ্টিতে দুঃখময় বা

অমঙ্গলজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহাও পরিণামে সুমঙ্গল ফলই প্রসব করিয়া থাকে। তোমার এই কোমল-কঠোর লীলা জীব-জগতের সর্ব্বত্রই অভিব্যক্ত!—তোমার বাহিরের আঘাত, অন্তরে স্নেহময় আশীর্ব্বাদস্বরূপ! তাই তোমার ভক্ত অনুভব করিয়াছেন—"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা, সেত দুঃখ নয় মা, দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা। সন্তান মঙ্গল তরে জননী তাড়না করে, তাই বহিগো সুখে শিরে, দুখেরি পসরা॥" হে করুণাময়ি মা! তুমিই কৃপাপরবশ হইয়া শরণাগত সাধকের দেহস্থ রিপুর অত্যাচার উপশমিত করিয়া তাঁহাকে সুখ-শান্তিপ্রদ অধ্যাত্ম-জগতে প্রতিষ্ঠা কর; তুমিই সেই সাধকের সঙ্কোচময় ভাব বিদূরিত করিয়া এবং পাপকার্য্য হইতে বিরত রাখিয়া অর্থাৎ ভাবী নরক যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিয়া, তাঁহাকে প্রাণে ও জ্ঞানে সুশোভিত কর। আবার তুমিই ভক্তের আসুরিক বৃত্তি ও ভাবসমূহকে স্বীয় অসীম বীর্য্যপ্রভাবে দেব-ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাক—ইহাই সংগ্রাম-মৃত্যু দ্বারা স্বর্গলাভ!—এইরূপে জীব-জগতের সর্ব্বত্র তোমার অনুগ্রহ-বুদ্ধিই সুবিকশিত!—(১৮)।

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকোরতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎপ্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্ত রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতি র্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৯

মা! তুমি দৃষ্টিমাত্রই কি অসুরগণকে ভস্ম করিতে পারিতে না? —(অবশ্যই পারিতে) তথাপি তাহা না করিয়া শত্রুগণের প্রতি যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহার কারণ এই যে,—'শত্রুগণ তোমার অস্ত্রাঘাতে পুত-দেহ হইয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক'—(ইহাই তোমার অভিপ্রায়) অতএব শত্রুগণের প্রতিও তুমি অতিশয় উদার-ভাবাপন্না এবং দয়ার্দ্র চিত্তা। (১৯) হে জগদম্বে তুমি জীব-জগত

সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছ; সুতরাং সৃষ্ট কোন বস্তুর প্রতিই তোমার প্রতিহিংসা ভাব থাকিতে পারে না; তবে বাহিরের নিগ্রহ ভাব সর্ব্বতোমুখী জীব-জগতের মঙ্গলের জন্যই অভিব্যক্ত হয়—উহা প্রেম-করুণার ছদ্মবেশ মাত্র! মাগো ত্রিনয়নি! তুমি ইচ্ছা করিলে, শরণাগত ভক্তের সমস্ত আসুরিক বৃত্তি ও ভাবসমূহ তোমার জ্ঞানময় দৃষ্টিদ্বারা তৎক্ষণাৎ ভস্ম করিতে পার; কিন্তু সেরূপ করিলে আনন্দের আতিশয্যে ভক্তের চিত্ত-বিভ্রম ঘটিতে পারে; এজন্য ক্রমশঃ শস্ত্রপাতরূপ দিব্য আঘাতে সাধকের আসুরিক ভাবসমূহ কিছু কিছু করিয়া সংশোধন করিয়া থাক, ইহাতেও তোমার দয়া এবং মহান্ অন্তর্দ্দৃষ্টি পরিব্যক্ত! (১৯)

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥ ২০

হে দেবি! তোমার খড়্গপ্রভাসমূহের বিস্ফুরণ এবং ত্রিশূলাগ্র-ভাগের দীপ্তিদ্বারা যে অসুরগণের দর্শন-শক্তি বিনষ্ট হয় নাই, তাহার কারণ—অসুরগণ তোমার জ্যোতির্ম্ময় সুধাংশুকলা বা অর্দ্ধচন্দ্রসুশোভিত অতুলনীয় বদনমণ্ডল দর্শন করিতেছিল।—(২০) জ্যোতির্ম্ময়ি মা! তোমার চিন্ময়ী রূপ দর্শনের সৌভাগ্য যে লাভ করিয়াছে, সে সুরই হউক, নরই হউক, বা অসুরই হউক, তাহার দৃষ্টি-শক্তি তো বিনষ্ট হইতে পারে না—সে দৃষ্টি যে তোমার সৌন্দর্য্য-সুধা পানে নিমগ্ন থাকে!—সে বিভোর দৃষ্টি তো পার্থিব কোন বস্তুতে আর ফিরিয়া আসিতে চাহে না।—তাই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনে মুগ্ধা ব্রজ-গোপিগণ, কৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত সহস্র নয়ন সৃষ্টি না করাহেতু বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন; আবার চৈতন্য চরিতামৃতেও আছে—"শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে। কোটি কোটি ভক্ত নেত্র ভৃঙ্গ করে পানে॥ যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর। মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥" মহামায়া মা!

আর কত দিন বাহিরের রূপে ভুলাইয়া রাখিবে?—কবে তোমার রূপময়ী চিন্ময় তনু দর্শন করাইয়া, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের চরম সার্থকতা করিবে?—সে দিন কি আসিবে না?—(২০)।

দুর্ব্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ২১

হে দেবি! দুর্ব্বৃত্তগণের দৌরাত্ম্য নাশই তোমার স্বভাব; তোমার এই অচিন্তনীয় রূপ, দেব-পরাক্রমনাশকারী অসুর-বিমর্দ্দক অনন্ত বীর্য্য এবং বৈরিগণের প্রতিও তোমার এইরূপ অপরিসীম দয়া, এই সমস্তই অতুলনীয়—(২১) হে মহাশক্তি-রূপিণি মা! তুমি শরণাগত ভক্তের অন্তরে অবস্থিত পাপকারী সূক্ষ্ম বৃত্তিসমূহকে উপশমন করিয়া, সাধককে শান্তি প্রদান করিয়া থাক, এবম্বিধ করুণা প্রকাশ করাই তোমার স্বভাব; তোমার এই প্রকার অনন্ত রূপ এবং চরিত্র অতুলনীয় বটে। হে করুণাময়ি মা। দেহস্থ দেবভাবসমূহ বিধ্বংসকারী আসুরিক ভাব-সমূহের বীর্য্য ও পরাক্রম তুমিই বিনাশ করিয়া থাক! আবার তুমিই কৃপাপরবশ হইয়া ভক্তের আসুরী-ভাবসমূহকে দেবভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া থাক—এই প্রকারে বৈরিগণের প্রতিও তোমার অশেষ করুণা প্রকাশ পায়; সুতরাং তোমার সমস্ত কার্য্যই জগন্মঙ্গল স্বরূপ।—(২১)

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যাতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥ ২২

হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে! এমন শত্রুভীতিপ্রদ মনোহর রূপইবা আর কোথায় আছে? হে বরদে! চিত্তে কৃপা এবং সময়ে নিষ্ঠুরতা এই উভয়ের একত্রে

সমাবেশ, ত্রিভুবনের মধ্যে কেবল তোমাতেই দেখা যায়। (২২)॥ বরাভয়-করা মা! তুমি ভক্তকে বর দান কর, এজন্য তুমি বরদা (অভীষ্টপ্রদা তাই করুণাময়ী); আবার অভক্তরূপী বর বা দৈত্যগণকে খণ্ডন কর এজন্যও তুমি বরদা (তাই নিষ্ঠুরা)। পাষাণময় হিমালয় ভেদ করিয়া যেমন পতিতপাবনী মন্দাকিনীর পুত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ গিরিনন্দিনি মা! তুমিও নিষ্ঠুরতায় মধ্য দিয়াই তোমার করুণা-ধারা জগতে সতত উৎসারিত করিতেছ!—ভক্ত অভক্ত সকলেই তোমার করুণা-ধারায় অভিষিক্ত! তাই কবি বলিয়াছেন —"তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩

(দেবি!) তুমি শত্রুসংহার দ্বারা এই ত্রিভুবন রক্ষা করিলে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নিহত করিয়া, সেই শত্রুগণকেও স্বর্গ প্রদান করিলে, আমাদের প্রচণ্ড দৈত্যভয়ও বিদূরিত করিলে—তোমাকে প্রণাম করি। —(২৩)॥ মাগো অভয়ে! তোমার সকল কার্য্যই সর্ব্বাঙ্গিন এবং সার্ব্বজনীন্ কল্যাণের নিমিত্ত!—শত্রু মিত্র সকলেই সমভাবে তোমার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া থাকে! তুমি শরণাগত সাধকের দেহস্থ রিপুকুলকে দলিত করিয়া তাঁহার দেহ-ত্রিপুরে শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক সভ্য প্রতিষ্ঠা কর, তৎপর আসুরিক ভাব সমূহকে দেবভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া তুমি হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রাণময় ও চিন্ময় স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর—তখন ভক্ত-সাধক প্রাণময় আত্ম-চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হন। পরিশেষে তুমি ভক্তের জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রচণ্ড দৈত্য ভয় বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া ধন্য কর। আনন্দময়ী মা! আমরা তোমার অকৃতী দীন সন্তান হইলেও, তোমায় নামে, তোমারই পরমাত্মময়

অমৃত-ধামে জয়-যাত্রা করিয়াছি! —এক্ষণে তোমার অহেতুকী কৃপাই আমাদের জীবনের দুঃখময় দুর্গম পথের একমাত্র সহায়ক আলোস্বরূপ! —আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞানালোক এবং প্রেমানন্দ-সুধা বিতরণ করিয়া ধন্য কর। প্রেমভক্তিহীন দীন সন্তানগণের প্রণতি গ্রহণ কর। —নমোনমস্তে!!—(২৩)

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ ২৪

প্রাচ্যাংরক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৫

হে দেবি! শূলদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; হে মাতঃ! খড়্গদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, ঘণ্টাধ্বনি ও ধনুর জ্যা-ধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।—(২৪)॥ হে প্রকাশময়ি মা! তুমি তোমার দিব্য জ্ঞানময় ত্রিশূল বিঘুর্ণিত করিয়া, আমাদের অন্তরস্থ মোহ-তম বা অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করত, আমাদিগকে রিপুগণের কবল হইতে রক্ষা কর; তোমার তেজতত্ত্বময় দিব্য খড়্গাঘাতে আমাদের দুর্ব্বলতারূপ আসুরিক প্রভাব বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত কর; মাগো! তোমার নাদময় দিব্য ঘণ্টা-ধ্বনি এবং ধনুর্জ্যা নিঃসৃত প্রণব-ধ্বনি দ্বারা আমাদের সর্ব্ববিধ আসুরিক ভাবসমূহ স্তম্ভিত করিয়া দেও!—আমরা তোমার ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া যেন আত্ম-হারা হই। এইরূপে করুণাময়ী মা! তোমার দিব্যজ্ঞান দ্বারা আমাদের অনন্ত জড়-প্রতীতি নষ্ট করিয়া দেও—আমরা যেন সর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র সকল ভাবে, তোমার প্রেমানন্দের বিলাস প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে পারি।—(২৪।২৫)।

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৬

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥ ২৭

হে মাতঃ। ত্রৈলোক্যে তোমার যে সকল সৌম্য এবং অতি ভীষণ মূর্ত্তি আছে, তদ্বারা আমাদিগকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা কর।—(২৬)॥ হে অম্বিকে! খড়্গ শূল গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র তোমার কর-পল্লবে সুশোভিত, তদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর। (২৭)॥ হে জগজ্জননি! সম্পদের সময়ে যেন সকল অবস্থায় তোমার সম্পদ্‌ময়ী শান্তি ও আনন্দপ্রদ সৌম্য-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; বিপদের সময়ে তোমার বিপদময়ী ঘোরা মূর্ত্তি দর্শনে ভীত এবং অবসাদগ্রস্ত না হইয়া, যেন তোমার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। এইরূপে তোমার কৃপায় যেন বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে তোমার চিন্ময় অধিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রেমানন্দে আত্ম-হারা হই। মা! তুমি যখন অনুগ্রহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাক্ষাৎভাবে সকলকে কৃপা বিতরণ কর, তখন উহা—সৌম্যা; আর যখন নিগ্রহ-মুর্ত্তি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে বা পরোক্ষ-ভাবে করুণা প্রকাশ কর, তখন উহা—ঘোরা। কিন্তু শরণাগত ভক্তের দৃষ্টিতে তোমার শান্ত-ভাব বা প্রচণ্ড-ভাব সকলই সমান!—সকলই সচ্চিদানন্দময়! হে শান্ত-ঘোররূপিণি বিশ্ব-বিমোহিনি চণ্ডিকে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।—(২৬।২৭)

ঋষিরুবাচ॥ ২৮

এবংস্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥ ২৯
ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈশ্চ ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥ ৩০

সভ্য বিবরণ ঋষি কহিলেন—দেবগণ জগদ্ধাত্রী মাকে এইরূপ স্তব করিয়া, নন্দন-কাননজাত দিব্য কুসুম, গন্ধ এবং অনুলেপন দ্বারা (জগন্মাতার) পূজা সম্পন্ন করিলেন। সমস্ত দেবগণ ভক্তিভরে দিব্য ধূপদ্বারা দেবীকে আরতি করিলেন। অনন্তর প্রসন্নবদনা দেবী, প্রণত দেবগণকে বলিলেন।—(২৮-৩০)

তত্ত্ব-সুধা। সৌভাগ্যবান মানবের বিলোমগতিপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি সমূহ যখন মহাশক্তিময় ভগবানের দিকে আকৃষ্ট ও পরিচালিত হইয়া আনন্দ-সুধা পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ যথাযথ যজ্ঞভাগ লাভে পরিতৃপ্ত হন এবং সংঘবদ্ধ হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রতিভাত হন ; ক্রমে সেই জ্যোতিতে সাধকের ইষ্টমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এইরূপে সূর্য্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ শরণাগত ভক্ত সাধকের অজ্ঞান-তমসা ইষ্ট-দেবদেবীর অভ্যুদয়ে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন পরমাত্মময়ী জগন্মাতা ভক্তের প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে নন্দনের দিব্য সম্ভার দ্বারা পূর্ণ করেন—এই অবস্থায় ভক্ত তাঁহার দিব্যভাব সমূহ দ্বারা ইষ্টদেব বা দেবীর মহাপূজা সুসম্পন্ন করেন ; অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রাণময় পুষ্পে, ভক্তিরূপ চন্দন মাখাইয়া, গন্ধ দ্রব্যাদির অনুলেপনরূপ কর্ম্ম-সহযোগে মহাপ্রাণময়ীর পরমাত্মময় মহাপূজা সম্পন্ন করত, জ্ঞানময় ধূপ দ্বারা তাঁহার আরতি করেন। —বিশুদ্ধ দেহরূপ নন্দনের এই সকল দিব্য উপকরণই মাতৃময় পরমাত্ম-পূজার প্রাণময় সর্ব্বোত্তম সম্ভার !!—(২৮-৩০)

দেব্যুবাচ ॥ ৩১

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৩২

(দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপূজিতা) ॥

সভ্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—হে দেবগণ ! তোমরা তোমাদের অভীষ্ট বর আমার নিকট প্রার্থনা কর।—(৩১।৩২)। (তোমাদের স্তব ও পূজায় অতীব প্রীতিলাভ করায়, এক্ষণে বর দানে ইচ্ছুক হইয়াছি)

তত্ত্ব-সুধা।—জগন্মাতার পরিতোষ সম্পাদন করিতে পারিলে, ভক্তের সকল অভীষ্টই পরিপূরণ হইয়া থাকে। দেবী-মাহাত্ম্যের অতুলনীয় স্তবরাজি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিলে ভগবতী সহজেই পরিতুষ্ট হন—এই অভয় বাণী এখানে স্বয়ং মা শ্রীমুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

দেবা উচুঃ ॥ ৩৩

ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৪
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ ৩৫
যশ্চ মর্ত্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে।
তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈ র্ধনদারাদিসম্পদাম্ ॥
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্ব্বদাম্বিকে। ৩৭

সত্য বিবরণ। দেবগণ বলিলেন—ভগবতী আমাদের সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছেন!—কিছুই অবশিষ্ট নাই। যেহেতু আমাদের শত্রু এই মহিষাসুর নিহত হইয়াছে।—(৩৪)॥ হে মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে একান্তই বর দিতে হয়, তবে এই করিও—আমরা যেন তোমাকে স্মরণ করিতে পারি; বিপদে পড়িয়া যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখন তুমি আমাদের পরম বিপদসমূহ বিনষ্ট করিও।—(৩৫) আর হে অম্বিকে! মর্ত্ত্যবাসী যে কোন লোক এই স্তব-রাজ দ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, হে অমলাননে, তুমি তাঁহাদের প্রতি সতত প্রসন্না থাকিও এবং তাঁহাদের জ্ঞান, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ধন-দারাদি সম্পদের বৃদ্ধি সাধন করিও।—(৩৬।৩৭)

তত্ত্ব-সুধা। জ্ঞান-প্রেমের উৎসস্বরূপা সর্ব্ব-রসাধার সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের দর্শন, সৌভাগ্যবশে লাভ করিলে আর কিছুই বাকী থাকে না, আসুরিক বৃত্তি ও ভাবসমূহও চিরতরে উপশমিত হয়; তাই দেবগণ সানন্দে বলিলেন—"আর কিছুই অবশিষ্ট নাই" লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণী দেবীর সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—"স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"—"হে প্রভো! আপনার সেবার অধিকার পাইয়া আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি, আমার বরের প্রয়োজন নাই।" দেবী-কৃপার

অহংকাররূপী মহিষাসুর বিলয় হওয়ায়, শরণাগত সাধকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হইয়াছে; তাই তিনি ইষ্ট দেবীর জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ সন্দর্শনের পর, তাঁহার শ্রীমুখের অভয় বাণী শ্রবণের পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এইরূপে সাধক প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, স্থূলে এবং সূক্ষ্মে তাঁহার অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে; তাই তিনি উপলব্ধি করিলেন—"ভগবত্যা কৃতং সর্ব্বং"—ভগবতীই ইচ্ছা, ক্রিয়া এবং জ্ঞান-শক্তিরূপে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করিতেছেন—তিনিই সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তৃ—ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত একটী বৃক্ষপত্রও সঞ্চালিত হইতে পারে না—একটী ধূলিকণাও স্থান-চ্যুত হওয়ার উপায় নাই! এজন্য মন্ত্রে আছে—"ন কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে" অর্থাৎ এমন কোন কার্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহার মূলে বা অন্তরালে ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী ভগবতী মায়ের কর্ত্তৃত্ব নাই। যতদিন মানব অহংকারী হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমানে প্রমত্ত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রাণময় সত্য উপলব্ধি হয় না, মানবের অহংকার বিশুদ্ধ হইয়া মাতৃ-চরণে অবনত ও শরণাগত হইলেই অর্থাৎ আত্ম-নিবেদন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই, সাধকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া এইপ্রকার সত্য উপলব্ধি হইয়া থাকে! তখন সাধক অনুভব করেন—আমার দেহের কোন কার্য্যেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই; সকলি মাতৃময়—সকলি মা সম্পন্ন করিয়া আমাকে কল্যাণময় পথে লইয়া যাইতেছেন!—আমাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন!

দেবগণ ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—"যে কোন মর্ত্ত্যবাসী এই সকল স্তবদ্বারা স্তুতি করেন" ইত্যাদি; ইহাতেও মহান্ এবং সার্ব্বভৌমিক উদার ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডের কীলক-ব্যাখ্যাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। হে সচ্চিদানন্দময়ি মা! তোমার ধ্যানে এবং পুনঃ পুনঃ তোমার লীলা

পরিচিন্তনে জীবের জীবভাব বিশোধিত হইয়া পরম ভাব বা সারূপ্য লাভ হইয়া থাকে—বাহ্য-জগতে তাঁহার ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হয়; আর অন্তর্জগতেও পরম আপদরূপ আসুরিক অত্যাচার বিলয় হইয়া চির-প্রশান্তি লাভ হইয়া থাকে।—(৩০—৩৭)

ঋষিরুবাচ ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈ র্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগত্রয়-হিতৈষিণী ॥ ৪০
পুনশ্চ গৌরীদেহাসা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৪১
রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃনুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ৪২

—ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদি স্তুতির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। শ্লোকসংখ্যা—৩৬, মন্ত্র সংখ্যা—৪২

সত্ত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—হে রাজন্! দেবগণ জগতের নিমিত্ত এবং আপনাদের নিমিত্ত এইরূপে দেবীকে প্রসন্না করিলে, দেবী ভদ্রকালী (দেবগণের প্রতি) "তথাস্তু", অর্থাৎ 'তাই হোক্' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।—(৩৯)॥ হে ভূপতি! ত্রিভুবন-হিতৈষিণী সেই দেবী, দেবগণের শরীর হইতে পূর্ব্বকালে যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা এই বলিলাম।—(৪০)॥ দেবগণের উপকারিণী সেই দেবী (ধূম্রলোচনাদি) দুষ্ট দৈত্যগণসহ শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশার্থে এবং জগতের রক্ষণার্থে পুনরায় গৌরী-দেহ হইতে (কৌশিকীরূপে) যেরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বর্ণন করিতেছি—আমার নিকট শ্রবণ কর।—(৪১।৪২)

তত্ত্ব সুধা। মহাশক্তিরূপিণী মঙ্গলময়ী ভগবতী ভদ্রকালী, লোক-লোচনের অন্তরালে অন্তর্ধ্যান করিলেন; মহাশক্তির বাহ্যিক লীলা-খেলা সসীম; কিন্তু এই বহির্ম্মুখী লীলার অভ্যন্তরে বা অন্তরালে যে অপরিসীম শক্তিময় অনন্ত নিত্য-খেলা চলিতেছে—সে লীলা-খেলার বিশ্রাম বা বিরাম নাই; উহা অফুরন্ত-ধারায় নিত্য প্রবাহিত!—সে মহাশক্তির ক্রিয়াশীলতা বা স্পন্দন ক্ষণিকের তরে উপশমিত হইলে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে!—বিশ্বের সর্ব্ববিধ চৈতন্যময় কর্ম্মশীলতা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে এবং সেখানে মহাশ্মশানের স্তব্ধময় জড়ভাব অবস্থিতি করিবে! বৈজ্ঞানিকগণ এই মহাশক্তি বা অনন্ত সূক্ষ্মশক্তির কণিকা মাত্র আবিষ্কার করিয়া, পার্থিব যশোলাভে ধন্য হইতেছেন। সৌভাগ্যবান সাধক এই মহাশক্তিকে জানিবার অভিপ্রায়ে শক্তি-সাগরের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া দুই একটী মহারত্ন আহরণ করত, জগতবাসীর গলে উপহার দিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই মহাশক্তিকে আত্মশক্তির ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা জানা যায় না—শরণাগত হইয়া মায়ের কৃপালাভই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র পন্থা; তাই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—"অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্ বিজ্ঞাতম-বিজানতাম্॥" যিনি জানেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহার নিকটে ইনি (আত্মা বা শক্তি) অবিজ্ঞাত; আর যাঁহার জ্ঞানের অভিমান নাই এবং যিনি মাতৃ-কৃপাপ্রাপ্ত, তাঁহার নিকট ইনি বিজ্ঞাত!—"ইনি যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকেন।"

রাজা সুরথ মহামায়া সম্বন্ধে বিশেষরূপে জানিবার জন্য জ্ঞান-গুরু ঋষিকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তিনি মহামায়ার মহাশক্তিময় সূক্ষ্ম-লীলাসমূহের অপূর্ব্ব চরিত্র অভিব্যক্ত করিলেন—অতঃপর মায়ের কারণ-লীলাসমূহ বর্ণন করিলেই, শক্তি-তত্ত্বের বা শক্তিলীলার পরিপূর্ণত্ব সংসাধিত হইবে এবং রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য

মহামায়া মায়ের পূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন।

সাধক প্রাণময় ক্ষেত্রের যুদ্ধ-মহোৎসবে সময়পরায়ণা দুর্গামূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাকে আকাশ-তত্ত্বময় বিশুদ্ধচক্র অতিক্রম করত মনোময় আজ্ঞা-চক্রে উপস্থিত হইতে হইবে—সেখানে পরমাত্মময় মহাশিবের অঙ্ক-বিহারিণী 'তুহিনাচল নিবাসিনী' মহাসৌন্দর্য্য-ময়ী আনন্দদায়িনী গৌরী দেবীকে দর্শন করিতে হইবে!—এইরূপে কারণ-জগতের কারণময় আসুরিক ভাবসমূহ, কারণে বা বীজাংশে লয় করিয়া জ্ঞানময় রুদ্র-গ্রন্থি ভেদ করত পরমাত্মার সহিত বিশুদ্ধ জীবাত্মার মহামিলন সংসাধিত করিতে হইবে! সেই মহামহোৎসবের শুভক্ষণ সমাগতপ্রায়; তাই জ্ঞান-গুরু ঋষি সাধক-ভক্তকে সেই পরমানন্দময় প্রেমের স্তরে সমুত্থিত করিবার জন্য সাদরে এবং সস্নেহে আহ্বান্ করিতেছেন! হে অমৃতের সন্তানগণ! আপন আপন অন্তরস্থিত আনন্দময় রস-ধারাকে বিশুষ্ক করিয়া, কিম্বা তিক্ততার দুঃখময় রসে ডুবাইয়া জীবনকে দুর্ব্বহ ও ভারাক্রান্ত করিলে আর চলিবে না!—জীবত্বের অবিশুদ্ধ মায়িক মুখোস্ পরিধান করিয়া মায়ামোহময় জড়ত্বের বিলাসে আর কত দিন মুগ্ধ থাকিবে? তোমরা জগন্মাত্মার সত্যের এবং প্রাণের খেলা দেখিয়াছ; এক্ষণে বিশ্বময় প্রেমানন্দের খেলা দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও!—উঠ, জাগ—ঐ শোন—আর্য্যঋষি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি—কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়!—অমরত্ব লাভের আর অন্য উপায় নাই—ইহাই একমাত্র উপায়।" সুতরাং এস, আমরা বিশ্বজননীর চরণপ্রান্তে প্রণতিপূর্ব্বক আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হই এবং জয়ধ্বনি করিয়া বলিতে থাকি—"জয় জয় হে মহিষাসুর-মর্দ্দিনি-রম্যকপর্দ্দি শৈলসুতে।"—(৩৮-৪২)

এক্ষণে দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্র সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করত মধ্যম খণ্ডের উপসংহার করিব। প্রথম চরিত্রে সাধক জগন্মাতার নিত্য-জগন্ময়ী সত্যরূপ বিশ্বের সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এই চরিত্রে ঋষি, মায়ের চিন্ময়ী ও প্রাণময়ী রূপটি উদ্ঘাটন করত সাধকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। মধ্যম চরিত্রের আদিতে মধ্যে এবং অন্তে সর্ব্বত্রই প্রাণের বিকাশ!— সকল ভাবেই 'চিৎ'এর ছড়াছড়ি। প্রথমেই ঋষি দেবগণের প্রাণময় ও শক্তিময় তেজ সমূহ বাহির করত সংঘবদ্ধ ও একীভূত করিয়া অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্ত-জন-বিমোহিনী অপূর্ব্ব দুর্গামূর্ত্তিতে পরিণত করত মহাপ্রাণের সর্ব্বোত্তম বিকাশ দেখাইয়াছেন। তৎপর অস্ত্ররূপী দেব-শক্তিসমূহ এক একটি গ্রহণ করিয়া, আবার অস্ত্ররাশির স্থূলাংশ পরিত্যাগ করত প্রাণময় শক্তি-অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবী, প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অপূর্ব্ব কৌশল প্রকট করিয়াছেন! এইরূপে অন্যান্য দেবগণের * বসন-ভূষণাদি প্রদান ব্যাপারেও অপূর্ব্ব প্রাণের খেলাই অভিব্যক্ত! অতঃপর মায়ের অট্টহাসি, নাদের অভিব্যক্তি, আসমুদ্র-মহীধর বসুধার প্রকম্পন, দেবতাগণের জয়ধ্বনি, অসুরগণের তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-কবচাদি ধারণ, মায়ের শ্রীচরণ-স্পর্শে পৃথিবীর নম্রতা, শেষ ও পাতালের বিক্ষোভ, ধনুর্জ্যা-নিঃসৃত টঙ্কার বা প্রণব-ধ্বনি প্রভৃতি মাতৃ-আচরণে সেই মহাপ্রাণময়ীর চৈতন্যময় অনন্ত লীলা-চাতুর্য্য অভিব্যক্ত।

'যুদ্ধ-মহোৎসবে'ও মা অস্ত্ররূপ দিব্যশক্তির আঘাতদ্বারা অসুরগণকে দিব্যভাবে বিভাবিত করিয়া তাহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন

* এখানে অস্ত্র সমর্পণ-লীলার একটী বিশিষ্ট ভাব দ্রষ্টব্য, যথা—পুরুষ-দেবতাগণই অস্ত্রাদি সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনন্ত স্ত্রী-দেবতাগণের মধ্যে কাহারও অস্ত্রসমর্পণ করিতে হয় নাই; কেননা স্ত্রী-দেবতাগণ সকলেই একমাত্র মহাশক্তিরূপিণী দুর্গামাতারই অংশ স্বরূপা।

১৪

কিম্বা মুক্তি প্রদানে ধন্য করিয়াছিলেন। এইরূপে মা, নিশ্বাসদ্বারা প্রাণময় প্রমথসৈন্য সৃষ্টি করিয়া, প্রাণের দিব্য অভিব্যক্তি দেখাইলেন; তাঁহার পদাশ্রিত সিংহটী পর্য্যন্ত, অসুরগণের প্রাণসমূহ পুষ্প-চয়নের মত একটী একটী চয়ন করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কণ্ঠচ্ছেদন হওয়ার পরও কবন্ধগণের তাল-মান-লয়ে বিচিত্র নৃত্য-ভঙ্গিমাতে প্রাণের অপূর্ব্ব ক্রিয়াশীলতা অভিব্যক্ত। বিলোম-গতিপ্রাপ্ত রজোগুণময় শোণিত-প্রবাহ, প্রেমানুরাগে রঞ্জিত হইয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠিত ভক্তের হৃদয়ে মন্দাকিনীর পুত-ধারার মত উচ্ছ্বসিত চিন্ময় ভাব-ধারার বিকাশ করিয়াছিল। দেবগণের পুষ্প-বৃষ্টি, অসুর সেনাপতিগণের যুদ্ধ-কৌশল, দেবীর হুঙ্কার, মহিষাসুরের বিবিধ রূপ ধারণ এবং প্রপঞ্চময় যুদ্ধ-বিলাস, মায়ের মধুপান, গদগদ ভাষণ, অসুরের বীর্য্য-নিরোধ এবং মুক্তি প্রদান; গন্ধর্ব্বপতিগণের জয়োল্লাস সঙ্গীত, অপ্সরাগণের দিব্য-নৃত্য, দেবগণ ও মহর্ষিগণের সম্মিলিত স্তব, প্রার্থনা এবং বর-প্রাপ্তি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাবলীতে, সর্ব্বত্রই ধারাবাহিক-রূপে যেন প্রাণের একটা বিচিত্র লীলা-তরঙ্গ উদ্বেলিত!—সকলের প্রাণেই যেন প্রাণময়ী মহাশক্তি মায়ের চৈতন্যময় স্পন্দন ও বিলাস তরঙ্গায়িত এবং লীলায়িত !!

শুধু লীলাতে নয়, মায়ের এবম্বিধ প্রাণের খেলা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল!—জীব-জগতের সর্ব্বত্র চিন্ময়ী মা বিশ্বের মহাপ্রাণ-রূপে প্রাণের খেলাই খেলিতেছেন! শুধু জড়ভাব লইয়া মানুষও, মায়িক খেলাও খেলিতে চাহেনা—মৃত-দেহের সহিত কাহারও ভালবাসা উৎপন্ন হইতে পারেনা! সকলেই চিদানন্দময় প্রাণের খেলা চায়! শিশুগণের সুকোমল চাহনি বা বদন-মণ্ডলের হাস্য বিকাশ দেখিলে, অতি কঠোর ব্যক্তির প্রাণেও স্নেহের বা আনন্দের স্পন্দন কোন না কোন আকারে ক্রিয়াশীল হয়। পালোয়ানের বীর্য্যময় শক্তি-বিলাসে,

সুন্দরী রমণীর কমনীয় কান্তি ও সৌন্দর্য্যে, পূর্ণচন্দ্রের বিমল সুধাময় জ্যোৎস্নাতে, কে না প্রীতি অনুভব করে? কিন্তু সেই শক্তি সেই সৌন্দর্য্য সেই জ্যোৎস্না এবং কোমলতা, মহা প্রাণময়ী, জগদম্বা মায়েরই যৎকিঞ্চিৎ বাহ্য-বিকাশ মাত্র। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— "কি কার্য্যইবা করিব, কোথায়বা যাইব? কোন বস্তু গ্রহণ করিব, আর কাহাকেইবা ত্যাগ করিব! আমি দেখিতেছি—যেমন মহা-প্রলয়ের পর একমাত্র জলমগ্ন অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্যময় আত্মা দ্বারাই সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে!" * উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঈশাবাস্যমিদং জগৎ।"

হে বিশ্ববাসী মায়ের অমৃতময় সন্তানগণ! তোমরা বিশ্বময় সর্ব্ববিধ প্রাণের খেলার অন্তরালে সেই মহাপ্রাণময়ী চিন্ময়ী মাকে দর্শন স্পর্শন এবং অনুভব করিতে অভ্যস্ত হও; মাগো তোমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র প্রাণময় চিদানন্দের বিলাস করিতেছেন!— তোমাদের মোহান্ধ নয়ন কি কোন অবস্থাতেই মাতৃ-রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হইতে চাহেনা?—তোমাদের মায়ালুব্ধ কর্ণ কি জাগতিক অনন্ত ধ্বনির অন্তরালে মায়ের সুমধুর গুঞ্জন-ধ্বনি এতটুকুও কোনদিন শুনিয়া তৃপ্তি-বোধ করে নাই?—অনিলের শান্তিপ্রদ সুখময় স্পর্শাদিতে জগন্মাতার আত্ম-হারা স্নেহময় সুকোমল স্পর্শ কি তোমাদের পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করিয়া কোন সময়েই পুলকিত বা কণ্টকিত করে নাই? মাতৃ-প্রদত্ত জাগতিক অনন্ত রসময় ভোগ্য দ্রব্যাদি ভোগে

---

* নিরালম্বোপনিষদে জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যাখ্যায় করিয়া, ঋষি বলিয়াছেন— কিং জ্ঞানমিতি?—"একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেন সদ্গুরূপাসনয়া শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন দিক্ দৃশ্য প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তি ইতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানং॥ কিং অজ্ঞানমিতি—রজ্জু-সর্পজ্ঞানমিব অদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দেবে তির্য্যগ্ বানর স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধ-মোক্ষাদি ন্যানা কল্পনয়া জ্ঞানমজ্ঞানং॥"

আসক্ত থাকিয়াও, তোমাদের ভেক-জিহ্বা কি মাতৃ-স্তন্য পানের আনন্দ-মধু কিছুমাত্রও আস্বাদন করিতে অসমর্থ?—সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদানস্বরূপ অনন্ত পুষ্প-সম্ভারের সুবাসে এবং দেবভোগ্য অগুরু চন্দনাদির সুগন্ধে, যদি তোমাদের নাসিকা, সর্ব্বগন্ধের আধার-স্বরূপা চিন্ময়ী মায়ের অঙ্গ-গন্ধ তিলেকের তরেও কিছুমাত্র আঘ্রাণ করিতে অপারগ হয়, তবে সেই নাসা-রন্ধ্রকে, মোহ-বিবর ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? সুতরাং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী বা গ্রন্থি ভেদ করিয়া আমিত্বের প্রসার করিতে হইবে!—অমৃতের পুত্র হইয়াও মৃত্যুর দিকে প্রধাবিত হইলে চলিবে না।

হে প্রেমাস্পদ ভ্রাতা-ভগ্নিগণ, একবার মাতৃ-কৃপায় দেহের প্রতি জ্ঞানময় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে সক্ষম হইলে দেখিতে পাইবে যে—দেহরূপেও মা, দেহের ইন্দ্রিয়াদিরূপেও প্রাণময়ী মা, ইন্দ্রিয়গণের অধি-পতিরূপেও মা; প্রপঞ্চময় দেহে অষ্টধা প্রকৃতিরূপে মায়েরই অভিব্যক্তি, আবার দেহী বা আত্মারূপেও পরমাত্মময়ী মায়ের নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিতি! এমনিভাবে বিশ্ব-জননী আমাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সংমিশ্রণ করিয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন। জগদম্বা মা আমা-দিগকে তাঁহার ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক বিষময় দুঃখদায়ী বিষয়কেও রসময় করিয়া স্তন্যরূপে যেন পরিচ্ছিন্ন আনন্দ-মধু সতত পান করাইতেছেন। রূপ-রসাদি বিষয়ের বিলোল বিলাসযুক্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, কল্পতরুরূপা জগন্মাতা, নানাবিধ লীলাদ্বারা আমাদেরই আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতেছেন। জড়ত্বে ডুবিয়া প্রাণহীনের মত ঘুমাইলে আর চলিবে না—জাগ্রত হইয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত প্রাপ্য বর লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের পবিত্র মানব-জীবন সফলতায়, বিমলতায় এবং উজ্জ্বলতায় দীপ্ত হইয়া উঠিবে!—আমরা ভগ্ন-পিঞ্জর হইতে মুক্ত কেশরীর ন্যায়, আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ এবং বিশ্ব-জননীর কৃতী-সন্তানরূপে, মাতৃ-কৃপা

লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব !—এইরূপে আমরা চিন্ময়ী ও প্রাণময়ী মায়ের ব্রহ্মানন্দময় কোলে অধিষ্ঠিত হইব এবং 'মা—মা' বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিব !—জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী !! ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !!!

জয় জয় তারে দেবি নমস্তে, প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে।
প্রজ্ঞা-পারমিতামিত-চরিতে, প্রণত জনানাং দুরিত-ক্ষয়িতে ॥
সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ।
অতোহহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥

পরিশিষ্ট

দেবী-মাহাত্ম্যে—চতুর্ব্বর্গ রহস্য

দেবী-মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চারিটী ভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত। এই চতুর্ব্বর্গ লাভ—সকাম সাধক এবং নিষ্কাম সাধকভেদে দ্বিবিধ। সকাম সাধকের পক্ষে—ধর্ম্মাচরণ দ্বারা অর্থ বা ধনৈশ্বর্য্য লাভ, কামনা পূরণ এবং অক্ষয় স্বর্গরূপ * মোক্ষ লাভই উদ্দেশ্য (স্বর্গভোগই সকামীগণের চরম কাম্য ফল, এজন্য তাঁহাদের নিকটে উহাই মোক্ষ স্বরূপ)। আর নিষ্কামীগণের পক্ষে —ধর্ম্মাচরণকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ ও পরমাত্মাভিমুখী করিতে হয়। সত্যের অপলাপ বা অবমাননাই অধর্ম্মরূপী অসুরের বল; সুতরাং

* সকাম ও সসীম কর্ম্মফলদ্বারা লব্ধ স্বর্গ অক্ষয় হইতে পারেনা ; তবে উহা এক কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে ; এজন্য সুদীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্বহেতু উহাকে অক্ষয় স্বর্গ বলা যাইতে পারে।

এই আসুরিক বল বা প্রভাব হইতে ধর্ম্মকে সতত রক্ষা করিতে হয় —এই ভাবটীই প্রথম চরিত্রে ধর্ম্ম-ভাবসৃষ্টিকারী ব্রহ্মার প্রতি-মধু কৈটভের অত্যাচার প্রভৃতিরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। ধর্ম্মাচরণ রূপ যুদ্ধ দ্বারা মধু-কৈটভরূপ মদ-মাৎসর্য্যাত্মক অসত্যকে বিলয় করত, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই প্রথম চরিত্রের—'ধর্ম্ম'। তৎপর সাধককে পরমার্থ লাভ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাণময় জ্ঞান লাভ দ্বারা আমিত্বের চরম প্রসার করত আত্মারাম হইতে হইবে এবং কামকে প্রেমে পরিণত করিয়া জীবন্মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করিতে হইবে—ইহাই মানবের চরম সাধ্য।

যাহারা সকামভাবে ধন প্রার্থী তাহাদের কার্য্যতাতেও কতক পরিমাণে আমিত্বের প্রসার-ভাব নিহিত থাকে; কেননা অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টার মূলেও 'বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আমি আরও বড় বা উন্নত হইব; আরও সুখ ভোগ করিব' এবম্বিধ প্রসারমূলক ভাব বিদ্যমান। বিশেষতঃ ধন পাইলেও আরও ধন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয়; 'আরও ঐশ্বর্য্য চাই—আরও সুন্দর বাগান কিম্বা বড় বাড়ী চাই' এই প্রকার অনন্ত অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার মূলেও আমিকে বিস্তৃত করার গোপন ইচ্ছা নিহিত। আমিত্বের চরম প্রসার বা স্বরূপত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত, কিছুতেই এই দুষ্পূরণীয় কামনা বা আশা-আকাঙ্খার নিবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি হইবেনা! সুতরাং অর্থলাভের মূলে পরমার্থভাব বিদ্যমান; ব্যবহারিক জগতে 'আমিকে বাহ্যিক সম্মান দেওয়ার অর্থ—তাঁহাকে অপমান করা!—আমিকে সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে বড় এবং সম্মানিত করা হইবে, যেদিন জীব-জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করা যাইবে; তখন দেখা যাইবে—'আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে এক আত্মা, সমস্তই আত্মময়—সমস্তই ভালবাসার বস্তু—সমস্তই প্রেমময় শক্তিময় এবং

ভগবৎময়।'—ইহাই আমির চরম প্রসার বা পরমার্থ। সুতরাং অহং-কাররূপী মহিষাসুরের রজোগুণময় সূক্ষ্ম মালিন্য ও চাঞ্চল্য প্রভৃতি আসক্তিময় ভাব, বিলয় বা সংযমিত করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপ পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপ পরমার্থ লাভের সুকৌশল দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্রে নানাপ্রকারে অভিব্যক্ত।

নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের কাম-কামনা, চণ্ডী-সাধনা দ্বারা প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। রুদ্রতেজময় অপ্রতিহত কাম, ত্রিলোক-বাসীকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে; ভোগদ্বারা উহার লেলিহান্ জিহ্বা, অগ্নিতে ঘৃত হুতির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। যতদিন দেহেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি বা নিজের স্বার্থময় সুখের প্রতিই দৃষ্টি থাকবে, ততদিনই দুঃখ এবং অতৃপ্তি; কেননা বিষয়াত্মক বিষয়বুদ্ধিতে সেবাদ্বারা নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারেনা! যখন সাধক প্রবৃত্তি-পথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া 'ত্যাগ-মন্ত্রে' দীক্ষিত হন, কিম্বা বিষয় সেবা দ্বারা ভগবৎ সেবার প্রাণময় মহাভাব আস্বাদন করিতে অভ্যস্ত হন, তখনই তিনি প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পান। বিশ্ব-যজ্ঞে ভগবান নিজকে আহুতি দিয়া অনন্ত ভেদভাবে অবস্থিতি করত, পরিচ্ছিন্ন সুখ-দুঃখ ভোগের বিচিত্র অভিনয় করিতেছেন ভগবানের এই বিসর্গ বা ত্যাগ-ভাবই জীব-জগতে প্রেমরূপে অভিব্যক্ত। এই প্রেমরূপী ভগবানের স্বভাব দেওয়া—প্রেম চিরদিনই দাতা!! আত্মত্যাগ দ্বারাই প্রেমময় আত্ম-স্বরূপ বা অমৃতত্ব লাভ করিতে হয়; অতএব কাম-কামনাকে প্রেমে পর্য্যবসিত করিয়া অর্থাৎ প্রেমময় হইয়া, এই প্রেমের জগতে প্রেমানন্দময় ভগবানকে দর্শন ও আস্বাদন করাই জীবের পরম সাধ্য। শুম্ভরূপী কাম-কামনাকে ভগবৎ প্রেমে বা বিশ্ব-প্রেমে বিভাবিত করিতে হইবে!—তখন ভক্তের বিশুদ্ধ দেহে রজোগুণময় কাম, প্রেমানুরাগরূপে রঞ্জিত হইয়া রক্তিম আভাতে ব্রহ্মতেজ-

রূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে!—এইরূপে প্রেমিক-ভক্ত ক্রমে জীব-জগতকে ভগবানের বা ভগবতীর অনন্ত প্রেমমূর্ত্তিরূপে দর্শন ও আস্বাদন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইবেন; এমনকি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে বা অনু-পরমাণুতে প্রেমানন্দের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইবেন!—ইহাই নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের "কাম"!—দেবী মহাত্ম্যের উত্তম চরিত্রে ইহার অভিব্যক্তি।

পরিশেষে মোক্ষ—ইহাই নিবৃত্তি-সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জীব-জগত, চর অচর, ব্যক্ত অব্যক্ত, সমস্তই সেই অরূপের রূপ, সেই অসীমের সসীম ভাব, সমস্তই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের বা মহামায়া ভগবতীর অনন্ত অভিব্যক্তি! এই প্রকার ভগবৎ তত্ত্ব, লীলা এবং শক্তি-রহস্য প্রভৃতি আস্বাদন করাই জীবন্মুক্তি —আর এই চরম তত্ত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করাই কৈবল্য বা "মোক্ষ"। উত্তম চরিত্রের উত্তরাংশে এই প্রকার জীবন্মুক্ত বা মোক্ষ লাভের সাধনা এবং ভক্তের সংসিদ্ধি লাভের বৃত্তান্ত সুন্দর-রূপে বর্ণিত—ইহাই দেবীমাহাত্ম্যের মোক্ষ; সুতরাং চণ্ডী মহাগ্রন্থ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায় নির্দ্দেশক অত্যুজ্জ্বল দিব্যজ্যোতিঃস্বরূপ !!

এক্ষণে প্রেমানন্দদায়িনী করুণারূপিণী বিশ্বব্যাপিনী শিব-সিমন্তিনী জগজ্জননীর অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত ভ্রমর-গুঞ্জিত ত্রিলোক-বাঞ্ছিত অভয় পদারবিন্দে প্রণতি পূর্ব্বক মধ্যম খণ্ডের উপসংহার করিলাম।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্‌ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্‌ বন্দ্য-পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ওঁ মহাশান্তি ওম্‌

সমাপ্ত

আনন্দ-সংবাদ !!

গারোহিল-যোগাশ্রম, কাঁথি—শান্তি আশ্রম, কলিকাতা—যোগশ্রী-নিকেতন,সুন্দরবন—পঞ্চবটী আশ্রম এবং ময়মনসিংহ যোগানন্দ-কুটিরের অধ্যক্ষ—যোগাচার্য্য স্বামী-যোগানন্দ প্রণীত—"সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী"—ধর্ম্ম-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। —যিনি পূর্ব্বে ময়মনসিংহ-জজকোর্টের একজন সমুন্নত উকিল ছিলেন,ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত উদাসীন ভাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং দ্বাদশ বর্ষাধিক কাল সাধুসঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তীর্থবাসে ও সাধন অবস্থায় ছিলেন ; তৎপর যিনি বিগত ১৩২৬ সন হইতে জনহিতকর ধর্ম্ম-পুস্তকাদি ক্রমে প্রকাশ করত, জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া সনাতন ভাব-ধারা প্রচার করিতেছেন ! এই অমূল্য গ্রন্থাবলী তাঁহারই সুদীর্ঘ ধর্ম্ম-জীবন লাভের অমৃতোপম সুফল ! একবার পাঠ করিলে নব-জীবন লাভ হইবে—শান্তি এবং আনন্দে মন-প্রাণ পুলকিত হইবে। স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর প্রশংসা-বাণী সর্ব্বত্র শতমুখে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকগুলি বঙ্গের ও ভারতের শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত এবং সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্চভাবে প্রশংসিত। সংক্ষেপে এখানে পুস্তকের বিবরণ ও কতিপয় মন্তব্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

১। "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।"

এই পুস্তকখানা আর্য্য-শাস্ত্র মন্থনোদ্ভূত সুধাস্বরূপ! আর বহু সাধু মহাত্মা এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বাক্য ও ভাব অবলম্বনে এই অমূল্য গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মানব-জীবন গঠনের সর্ব্ববিধ সাধনা ও সহজ উপায় বর্ণিত হইয়াছে ; মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক কিরূপে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এমন কি ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত পৌছা যায়, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সারাংশ অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত ও বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠ করিলে বুঝিবেন, ইহা কি অমূল্য রত্ন !—কি অমৃতময় আনন্দের বাণী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। নিম্নে সূচী পত্রের কিয়দংশ উল্লেখ করা হইল—এই পুস্তকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, প্রবৃত্তি, যম নিয়ম, পুরুষকার-দৈব, আসক্তি ও ভক্তি, নামকীর্ত্তন, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা, ষট্‌ক সম্পত্তি, চিন্তা ও ধ্যান, অষ্টপাশ, মুক্তি, পঞ্চআশ্রয়, সাকার নিরাকার, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, পঞ্চভাব ও সাধনা, মহাবাক্য, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, জীবদেহ-রহস্য, পঞ্চকোষ, নির্ব্বাণ, সাধনার ক্রম, প্রতিমাপূজা, সুখের সন্ধান, দেব-দেবিগণের তত্ত্ব, প্রণব-তত্ত্ব, গায়ত্রী-তত্ত্ব, যোগ-তত্ত্ব, পঞ্চ-মকার তত্ত্ব, কর্ম্ম-রহস্য, হরিনাম-তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে ! অল্প সময়ে গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত ; চতুর্থ সংস্করণ মূল্য—২৲ টাকা।

বঙ্গবাসী :—"শত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান ; সুতরাং পশুত্ব মোচনের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায় হইবে…সবই সুধা—আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে এই গ্রন্থ পড়িয়া সেই সুধাধারা পান করিতে বলি।" **বসুমতী** :—"গ্রন্থকার যোগী সাধক, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি একে একে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।… ধর্ম্মতত্ত্ব-পিপাসু সাধারণ এই পুস্তক হইতে উপকৃত হইবেন।" **হিতবাদী** :—"পুস্তকখানা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, হিন্দুর চরম লক্ষ্য কি, তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,…তত্ত্ব বুঝাইতে গ্রন্থকার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে সমাজের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

Amrita Bazar Patrica :—…"Author's attempts are crowned with admirable success……"

Servant :—"The book is an excellent publication…it reflects great credit on the author's devotional life."

মহাত্মা শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুর (পাগল হরনাথ):—"সকল রকমে আশা করা যায়, এই পুস্তক পড়িলে নিতান্ত ঘৃণিতেরও চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে! প্রভু করুন, এই পুস্তকের বহুল প্রচার হোক্; আবার সেই আর্য্যঋষিদের সময় ফিরে আসুক।"

বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র বসু—শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী বিশিষ্টরূপে আমার পরিচিত। এরূপ স্বার্থত্যাগ ও পরার্থব্রত আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।...পড়িয়া মনে হইল, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী, এই পুস্তক লিখিত পথ ধরিয়া চলিলে, বোধ হয় প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী হইবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, বীর-কেশরী স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ—"ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ছেলেদের ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার, কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষকের বড়ই অভাব,...আপনার পুস্তকদ্বারা ছেলেদেরও বিশেষ উপকার হবে!"

আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ্ মিঃ কে, সি, নাগ—..."ইহাতে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও মানব-জীবনের ইহ-পরকালের সমস্যা সমাধানে আপনার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে।"

গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড মাষ্টার দুর্গাদাস রায়—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিরূপ শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম—চারিটী অধ্যায় যেন চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ।"

"নিখিল ভারত সাহিত্য-সঙ্ঘের" সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র কুমার কাব্যার্ণব, বেদান্তরত্ন—"মহাভাগ, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম; একমাত্র ভগবৎশক্তির প্রেরণা ভিন্ন কখনই লেখনী হইতে এরূপ পীযুষ বর্ষিত হইতে পারে না, ইহা অকুতোভয়ে বলিতে পারি।"

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম, গ্রন্থখানি অমূল্য রত্ন...ইহা তাঁহার যোগজ অপরোক্ষানুভূতির ফল; এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।"

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জন-নায়ক স্বর্গীয় **অশ্বিনীকুমার দত্ত**—"শ্রীচরণেষু, আপনার পুস্তকখানার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি•••।"

প্রথম সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত **উপেন্দ্রনাথ কর**—"হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ স্বল্প পরিসরের মধ্যে, এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক **অক্ষয় কুমার** বন্দ্যোপাধ্যায়—•••"মানব-জীবনের ক্রম বিকাশ তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মৌলিক গবেষণা পাওয়া যায়।"

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **হেমচন্দ্র** মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"ভবদীয় লেখনী-নিস্থত সুধাবিন্দু—"সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" পুস্তকখানি **পঁচিশ ত্রিশবার পাঠ করিয়াও** তৃপ্তি না পাওয়ায়, পরিশেষে স্বাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছি।"

হাইকোর্টের স্বনামধন্য জজ সারজন **উড্‌রফ**—"পুস্তক খানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম ; আপনাকে ধন্যবাদ"।

কাঁথি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার **কালীপদ** মৈত্র—"একবার পড়িয়াও যেন তৃপ্তি হয় না, তাই আবার পড়িতে ইচ্ছা হয়। এমন সরলভাবে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় জটিল তত্ত্বগুলির সমাধান করিতে অপর পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, ইহা স্বামীজির ধর্ম্ম-জীবনের অনুভূতির ফল।"

জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীযুক্ত **বিপিন** চন্দ্র চন্দ—"একবার পাঠ করার পর আরও কয়েকবার পাঠ না করিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। এই বইখানা **সরস উপন্যাসাদির** চেয়েও মনোমুগ্ধকর।"...

বৈদ্য-সম্মিলনীর সভাপতি কবিবর **গিরিশ** চন্দ্র সেনগুপ্ত—"ইহা যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আনন্দানুভব করিতে পারিবেন !•••এরূপ গ্রন্থ ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় থাকা উচিত।"

২। "শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত।"

ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র। ইহাতে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, জন্ম, গোকুলের যাবতীয় লীলা, বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকা-লীলা কুরুক্ষেত্র-লীলা প্রভাস-মিলন, মহাপ্রস্থান প্রভৃতি যাবতীয় লীলাদি, ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে—শাস্ত্রোক্ত একটী লীলাও বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহার আরও **বিশেষত্ব** এই যে—কালীয়-দমন, **রাসলীলা,** বস্ত্রহরণ, **দোললীলা** প্রভৃতি ব্রজলীলা, মধুপুরে দশবিধ রস-লীলা, দ্বারকায় গার্হস্থ্যলীলা প্রভৃতি বিশিষ্ট লীলাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদি সাধু-মহাত্মাগণের মতাবলম্বনে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে; **রাসলীলাই** ৬০ পৃষ্ঠার উপর আলোচিত। গ্রন্থশেষে **সাধনার ক্রম,** কৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনা এবং **লীলাতত্ত্ব** প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে চান, যদি ভগবানের তত্ত্বময় ও মধুময় লীলামৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই অমূল্য গ্রন্থখানা একবার পাঠ করুন। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যদুবংশ এবং পাণ্ডবগণের সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী বিস্তৃত বংশাবলীর তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে।

জ্ঞাতার্থে—সূচীপত্রের কয়েকটী বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইল যথা—সূচনা ও জন্ম, গোকুলে শৈশব ও বাল্যলীলাদি, ননীচুরী, চৌর্য্যলীলা রহস্য, **বৃন্দাবনলীলা**—ব্রহ্ম মোহন, কালীয়-দমনের তাৎপর্য্য, বংশীর ত্রিবিধভাব, বস্ত্রহরণ, বস্ত্রহরণ-রহস্য, গোবিন্দাভিষেক, বৈকুণ্ঠ দর্শন, রাসলীলার অবতরণিকা, রাসের মূল বিবরণ, রাসলীলার ব্যাখ্যা ও উপসংহার, শিবরাত্রি, দোললীলা, শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি ইত্যাদি। **মথুরা-লীলা,**—দশবিধ রসের বিকাশ, কংস-বধ, গুরুগৃহে বাস, উদ্ধব-সংবাদ প্রভৃতি। **দ্বারকালীলা**—অষ্ট-মহিষী রহস্য, পতিভক্তির আদর্শ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা, যোগৈশ্বর্য্য, সুদামের প্রতি কৃপা প্রভৃতি। **'কুরুক্ষেত্রলীলা'**—প্রভাস-

মিলন, মহাপ্রস্থান এবং গ্রন্থের উপসংহার বা লীলামৃতের সবিশেষ আলোচনা ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আছে। তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য ২৲ টাকা

বঙ্গবাসী :—"একে মধুর কৃষ্ণলীলামৃত, তাহা আবার পাকা হাতের পাকা পাকে প্রস্তুত, সুতরাং এ অমৃতের তুলনা আর কি দিব ?······ কৃষ্ণলীলামৃত-পিপাসু পাঠকগণ, এই পুস্তক পাঠে প্রীতি প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের কামনা।"

হিতবাদী :—"আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, একত্রে তাহার সমাবেশ করিয়া, গ্রন্থকার পুস্তকের উপযোগীতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, পুস্তকের ভাষা সুন্দর ··· ··· আমরা পুস্তকখানা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

পল্লীসেবক—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা উচিৎ।"

ভারতবরেণ্য, বঙ্গের গৌরব মহাত্মা **শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ (পাগল হরনাথ)** এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—

"পুস্তকখানি পড়ে আনন্দ রাখবার স্থান হতেছে না, যতটুকু পড়ি ততটুকুই মধুর···প্রভুর ইচ্ছায় এই পুস্তক সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে ডুবাইরা দেক্।"

হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত **দুর্গাদাস রায়**—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম ; গ্রন্থকার ভাবুক ও প্রেমিক, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, সাধনাত্মিকা ভক্তি এবং প্রেমনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়, পুস্তকের মধ্যে প্রভূতপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়···রাসলীলা বর্ণনে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ সুন্দর ও বিশুদ্ধ বিবৃতি অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই···এই অপূর্ব্ব লীলামৃত পানে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

সাহিত্যিক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার **নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী**—"পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঘটনাবলীর ধারাবাহিক সন্নিবেশ, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং রচনার কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়, সর্ব্বোপরি ভক্ত-হৃদয়ের আনন্দ-ধারা সমগ্র গ্রন্থখানিকে সরস করিয়া রাখিয়াছে।"

৩। "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য"।

(প্রথম খণ্ড—মধ্যম খণ্ড—উত্তর খণ্ড)

প্রথম খণ্ডে—মধু-কৈটভ বধ—যোগ-শাস্ত্রের **মূলাধার** ও **স্বাধিষ্ঠান** চক্র ভেদ। সাধক কিরূপে অহমিকা ও মমতার "মোহ-গর্ত্তে" এবং "মমতাবর্ত্তে" পতিত হন, কিরূপে মহামায়া মায়ের কৃপায় অহমিকা-মমতার স্থুল-গ্রন্থি ভেদ করিয়া মদ-মাৎসর্য্যরূপী মধু-কৈটভকে দলন পূর্ব্বক সত্যলাভ করিতে পারেন, সেই সকল অপূর্ব্ব অভিনব তত্ত্ব, রহস্য এবং বিবরণ দ্বারা প্রথম খণ্ড অলঙ্কৃত এবং ঝঙ্কৃত!—নন্দনের দিব্যালোক সমন্বিত এইগ্রন্থ পাঠ করিলে, ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হইবে এবং সাধন-পথ সমুজ্জলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংসা-বাণী শতমুখে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। নিম্নে কতিপয় মন্তব্য, আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হইল।—পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য—২৲ টাকা

মধ্যম খণ্ডে—মহিষাসুর বধ—অহংকাররূপী মহিষাসুরকে বধ করিয়া মাতৃচরণে শরণাপন্ন হওয়ার বহুবিধ সাধন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত—মহামায়া ভগবতীর অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস আস্বাদন করিবার বিচিত্র প্রণালী প্রদর্শিত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিবিধ মূল্যবান উক্তির দ্বারা ইহা অলঙ্কৃত!—এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সাধন-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও করিবে। এতৎব্যতীত যোগ-শাস্ত্রের **মণিপুর** এবং **অনাহত**-চক্রভেদের রহস্য প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ [শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবে]

উত্তর খণ্ডে—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—কাম-ক্রোধের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধদ্বারা সাধক সর্ব্ববিধ সাধনার গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য অবগত হইয়া, কাম-কামনা ও ক্রোধের অভেদ্য পাশ হইতে মুক্ত হইবেন—তখন সাধকের কাম-ক্রোধ, প্রেমানুরাগরূপে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার দেহে প্রেমানন্দের দীপ্তি আনয়ন করিবে! ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শুম্ভ কিরূপে মাতৃকৃপা লাভ করিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন! কিরূপে সাধকের জীবভাব

বিশুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হইল, এই সকল অভূতপূর্ব্ব রহস্য অবগত হইয়া, পাঠক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবেন এবং ভগবৎ চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্রের **বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র**-ভেদ-রহস্য এবং দেবী-মাহাত্ম্যের সহিত ভগবানের **রাস-লীলার** অতি-বিস্ময়জনক সামঞ্জস্য ও রহস্য এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে সাধকগণ একদিকে যেমন মাতৃলীলার অপূর্ব্ব রহস্য আস্বাদনে পুলকিত হইবেন, সেইরূপ অন্যদিকে বিবিধ সাধন-কৌশল ও রহস্য অবগত হইয়া, নিজ নিজ জীবনে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন!—সুতরাং ইহা অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ৩৲ টাকা [**উত্তর খণ্ডের** দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে কাগজ ও ছাপাখরচাদির অত্যধিক মূল্য হেতু, মূল্য ৪৲ ধার্য্য হইবে] উত্তর খণ্ড—১ম সংস্করণ ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠা।

জ্ঞাতার্থে **তিন খণ্ডেরই বিশিষ্ট সূচীর কতকাংশ** এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—**প্রথম খণ্ডে**—সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ও শিব চতুর্দ্দশী-তত্ত্ব চণ্ডীপাঠে সর্ব্বজনীন অধিকার, আমি কে?—ইহার সমাধান, মহামায়া-তত্ত্ব, শরণাগতি রহস্য, সংসার-লীলা, কালের নৃত্য, জীবন-নদীর বৈশিষ্ট, কুণ্ডলিনীর শেষ-শয্যা বা অনন্ত-শয্যা, চণ্ডীতে দশমহাবিদ্যা-স্তব, বলি-রহস্য, শাক্ত বৈষ্ণব মিলন, দোলমঞ্চ, ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, গায়ত্রী-রহস্য ইত্যাদি। **মধ্যম খণ্ডে**—বিরহী জীবের **রথযাত্রা**, অধিকার ভোগ রহস্য, রক্তনদী ও দোল-রহস্য, তান্ত্রিক সিদ্ধি, গায়ত্রী দর্শন, শব্দ-তরঙ্গের রূপ, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন, কর্ম্ম-সংস্কার ও নাগহার, অস্ত্র-সমর্পণ রহস্য, নাদরহস্য, পঞ্চানন ও পঞ্চপ্রদীপ রহস্য, অদৃষ্টশক্তি ও ভবনাট্য, প্রণব-তত্ত্ব, ত্রিপুটি, বিয়াল্লিশ-তত্ত্ব ঘণ্টাধ্বনি রহস্য, রক্তময় রজোগুণ, দেশ ও কালতত্ত্ব, কবন্ধ বা প্রতিক্রিয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ভূতশুদ্ধি, হুঙ্কার রহস্য, অমৃতকুম্ভ, জগদ্ধাত্রী পূজা রহস্য, মৃত্যুভয় রহস্য, শক্তিতত্ত্ব, ধর্ম্মের আড়ম্বর, **মধুলীলা** ও মদনোৎসব, বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ, ইন্দ্রিয়রূপী গোপী ও কৃষ্ণসেবা, চতুর্ব্বর্গ-রহস্য ইত্যাদি; **উত্তর খণ্ডে**—চণ্ডী-সাধনায় জীবন্মুক্ত অবস্থা, নিদ্রাতত্ত্ব, নারী

মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য, দ্বিদল পদ্মের বৈশিষ্ট্য, সরস্বতী তত্ত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্য রহস্য, সংসারে দক্ষযজ্ঞ, মদন ভস্ম, চণ্ডীর পঞ্চ মহাভাব, ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধি. মদনের শর ও কামতত্ত্ব, কেশাকর্ষণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, যুদ্ধে লৌকিক রহস্য, পঞ্চ মহাবীজ তত্ত্ব, মুণ্ডমালা তত্ত্ব, মহাঅসিতত্ত্ব, কশাঘাত না আশীর্ব্বাদ ? অষ্ট জীব ধর্ম্ম, অষ্টশক্তির আবির্ভাব রহস্য, দেহে আসুরিক শ্রেণী বিভাগ, জপমালা রহস্য, গরুড় তত্ত্ব, অষ্ট ঈশ্বর ধর্ম্ম, গুরুশক্তি শিবদূতী, জীবের ত্রিবিধ গর্ভ, ভাবোচ্ছ্বাস তত্ত্ব, কামের অষ্টবাহু রহস্য, সংখ্যা-বিজ্ঞান রহস্য, চতুর্জ্জগৎ রহস্য, উত্থান পতনে অগ্র গমন, চণ্ডীতে দোললীলা, রুদ্র গ্রন্থিভেদ, দশ মহাশিব, ক্রমোন্নতির স্তর, কামকলাতত্ত্ব (স্থূল ভাব)— তিথিভেদে কামকলা ও সোমকলার দেহ-পরিভ্রমণ রহস্য, মানব দেহে অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থা, সূক্ষ্ম কামকলাতত্ত্ব, ষড়রিপু বলিতত্ত্ব, মানসপূজা রহস্য, শরৎকাল ও বর্ষ রহস্য, সাম্বৎসরিক পূজাদিতে সাধনার ক্রম, দুর্গাপূজার মহিমা, ষড়ঋতুতে ষট্‌চক্রভেদ, গীতা ও চণ্ডীর সমন্বয়, দেবী-মাহাত্ম্যে ষট্‌চক্রভেদ [অর্থাৎ ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত অভিনব বিবরণ] এবং **দেবী-রাসলীলা** প্রভৃতি !!

আনন্দ বাজার পত্রিকা—“ইহা মাতৃমন্ত্রে সিদ্ধ পরম যোগী যোগানন্দের গূঢ়তত্ত্ব উপলব্ধির সার বস্তু। গ্রন্থকারের প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত চিত্তে প্রতিফলিত সাধন-কৌশলের মর্ম্মবাণীরূপে আমরা দেখিতে পাই, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধদ্বারা কাম-ক্রোধাদির দুর্ভেদ্য পাশমুক্ত হইয়া সাধক সর্ব্ববিধ সাধনার রহস্যের সহিত পরিচিত হন। এই গ্রন্থ পাঠে সাধক যেমন মাতৃ-লীলার সুধা-রসপানে পুলকিত হইবেন, তেমনি জটিল সাধন-প্রণালীর অন্তর্নিহিত রহস্য অনুভূতি দ্বারা জীবনে চিরশান্তি আনয়ন করিতে পারিবেন।”

বঙ্গবাসী—......“সম্পাদক তদীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত করিয়াছেন ; ব্যাখ্যা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু চণ্ডীগ্রন্থের অন্যান্য টীকাকারগণ, স্থান বিশেষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন ; ঐ সকল

ভাব সাধারণের বোধগম্য নহে···উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিরল প্রচার ছিল ; কিন্তু স্বামী যোগানন্দের ব্যাখ্যা সেরূপ নহে ; তাঁহার মনে প্রাণে ক্রিয়ায় সাধনায় ঐক্য আছে—**সর্ব্বত্রই সনাতন ভাব অনুস্যূত** ; তাঁহার ব্যাখ্যা অনাবিল অজটিল সনাতন-ধারার প্রস্রবণ···এই গ্রন্থ সাধন-পথের প্রধান প্রদর্শক, সন্দেহ নাই।......এইরূপ উপাদেয় পুস্তকের প্রচার বিস্তার সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

হিতবাদী—"মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদের কথা শুনাইবার জন্য স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন··· আর্য্য-গ্রন্থমাত্রই যে অধ্যাত্মবাদপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। **প্রবল কলির** প্রবাহে আজ সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত প্রায় হইলেও, ভারতে এখনও যে সাধক ও সাধনার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই, তাহা অবিসংবাদিত রূপে সত্য। যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু অধ্যাত্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক শ্রীশ্রীচণ্ডীর সত্য বিবরণের সহিত অন্তর্নিহিত সাধন-কৌশল অবগত হইতে পারেন, স্বামিজী তজ্জন্য 'তত্ত্ব-সুধা' নামক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।······ তিনি এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধন-সমরে সাধকের হৃদয়ে আনন্দদান করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ; আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ পাঠক-মাত্রই ইহা পাঠে আনন্দলাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।"

দেশ—"যে ভাবে পরম ভাগবত শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ অতি সরল সহজ ভাব ও ভাষায় বিবিধ সাধন-কৌশল, অভিনব তত্ত্ব রহস্য প্রভৃতির সাহায্যে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমানুরাগী সাধক মাত্রেরই সাধন-পথ অপূর্ব্ব আলোকে প্রভান্বিত হইবে। ··· যাহাতে ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সন্তান চণ্ডী-সাধনার গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া বিমল আনন্দে বিভোর হইতে পারেন, তাহার জন্য স্বামিজী সুস্পষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার যৌগিক ব্যাখ্যা, দার্শনিক বিশ্লেষণ, নিগূঢ় তত্ত্ব-উদ্ঘাটন সমস্তই তাঁহার গভীর সাধনা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। ধর্ম্ম-

তত্ত্ব-পিপাসুদের নিকট ইহা শাশ্বত অমৃতনিষেক তুল্যই সমাদৃত হইবে।"

Amrita Bazar Patrika—"The erudite Scholar and Philosopher is to be congratulated on this work of solid and lasting value The author is himself a Yogi, one who is eminently fit to undertake the task of commentaries on the topics connected with Hindu Philosophy...We have nothing but praise for his simple presentment which will enable the Public to get an inkling into the fundamentals of the *Chandi* Cult, It ought to be in the hands of every religious-minded Bengalee."

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"একবার মাত্র পড়িয়া উহা আমার নিকট সংসার-দাবদগ্ধ হৃদয়-মরুতে অমৃতাভিষেকতুল্য উপলব্ধি হওয়ায়, সেইদিন হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেছি···এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রবীণ উকীল প্রকাশচন্দ্র রায়—"যৌগিক ব্যাখ্যাসমন্বিত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ আদৌ পাঠ করি নাই··· যতই পাঠ করিতেছি ততই নিত্য নব নব রসের আনন্দ অনুভব করিতেছি। ···এই গ্রন্থদ্বারা আপনি আমার সাধন-ভজনের পথটী আরও সরল ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন! ··· আপনার ব্যাখ্যা ভব-বন্ধন ছেদনের পথ প্রদর্শক; আপনাকে প্রণতি শত কোটিবার।"

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অক্ষয় কুমার বন্দোপাধ্যায়—"পাঠ করিয়া আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম...যোগ-সাধনার নিগূঢ় রহস্য সমূহ, বেদ-বেদান্তের চরম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে! গভীর সাধনাকে মানুষের সহজ জীবনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে, যথাযথ ব্যাখ্যানের অভাবে, চণ্ডীর সুগভীর অর্থ, বিদ্বৎসমাজেও অপ্রচারিত।···স্বামী যোগানন্দ চণ্ডীর আভ্যন্তরীণ অর্থসমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া, হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

তিনি যৌগিক দৃষ্টি, ও তত্ত্বদৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব-সুধা যথার্থই তত্ত্বামৃতে পরিপূর্ণ; —তিনি সত্য সত্যই ভাবাবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন মনে হয়।”

পঞ্চায়েৎ—“এই বিরাট গ্রন্থ সমগ্র হিন্দু-জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ আখ্যা প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযোগী। জ্ঞানরূপিণী পরমেশ্বরী স্বয়ং গ্রন্থকারের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রতি পংক্তি হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের দিব্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে!—নিখিল গুরুশক্তি যেন পতিত হিন্দু জাতির তথা পতিত মানবের পরিত্রাণের জন্য গ্রন্থরূপে প্রকট্‌ হইয়াছেন!···স্বয়ং দেবীই যেন গ্রন্থকারের লেখনী-গোমুখী মুখে পতিতোদ্ধারিণী ভাগিরথীর অমৃত ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার দেবীর প্রিয় পুত্র গণপতির ন্যায়, দেবী-শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যন্ত্রবৎ ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন!! —এই গ্রন্থখানা যদি দেশে সমাদর লাভ না করে, তবে বুঝিব ভারতের তিমির-যুগের অবসানের এখনও বহু বিলম্ব আছে।”

৪। “যোগানন্দ-লহরী।”

ইহা বহু সঙ্গীত ও স্তব প্রণামাদি সম্বলিত সুন্দর পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে—স্বামীজির স্বরচিত গুরু, শিব ও অন্যান্য দেব-দেবী বিষয়ক বহু ভাবোদ্দীপক্‌ তালমানযুক্ত শতাধিক সঙ্গীতের সমাবেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের “বসন্তোৎসব” বা “দোল-লীলার” একটি গীতি-নাটক; তৃতীয় খণ্ডে—সুপ্রসিদ্ধ সাধকগণের কতকগুলি বিশিষ্ট সাধক-সঙ্গীত এবং চতুর্থ খণ্ডে—“স্তবমালা” অর্থাৎ বহু দেব-দেবীর প্রণাম ও স্তোত্রাদি ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই ঘরে নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে। ইহাও সমস্ত পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। পরিবর্দ্ধিত চতুর্থ সংস্করণ (যন্ত্রস্থ); মূল্য ১৷০

হিতবাদী—"ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ক নানাপ্রকার গীত আছে।…নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকটে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।"

বঙ্গবাসী—* * "সুতরাং পাঠক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পাইলেন। "আগমনী" "উমা" ও "দুর্গা" এই গান তিনটী এখানে উদ্ধৃত হইল। * * এই গ্রন্থের আর অধিক পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক।"

নায়ক—"ইহা ভক্তিরসাত্মক গানের বই। * * নানা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।"

মহাকালী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত **যতীন্দ্র নাথ শর্ম্মা**—"গ্রন্থকার সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবনে" যে জ্ঞান ও সাধন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই এখানে অন্য আকারে প্রকাশিত * * ভাব ভাষা উভয়ই সুন্দর।"

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **উপেন্দ্র কিশোর** বিদ্যাবিনোদ—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম ; প্রত্যেক সঙ্গীতেই ভগবৎ ভক্তি বিকাশের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় * * শেষভাগে স্তোত্র ও ধ্যান-মালা সংযুক্ত হওয়ায়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে।"

অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার **দুর্গাদাস রায়**—"যোগানন্দ-লহরী" প্রকৃতই যোগানন্দ লহরী, এই পুস্তক পাঠে যেরূপ উল্লসিত পুলকিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা অবর্ণনীয়! ভাষার বা শব্দ যোজনার অপূর্ব্ব কথা ছাড়িয়া দিলেও, সঙ্গীতগুলি ভাব, ভক্তি, প্রেম ও রসে পরিপূর্ণ, তাহা পাঠমাত্রই পাঠকের উপলব্ধি হইবে!……নিত্যকর্ম্ম সমাধানের পর ইহা নিত্যপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।"

৫। "দেব-দর্শন"।

ইহা সুদৃশ্য সুচারুরূপে মুদ্রিত, দেব দেবীর ছোট ছবি সম্বলিত সুন্দর পুস্তক। ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কবিতাকারে দুর্গা, কালী, দশ-

মহাবিদ্যা, দশাবতার, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি ত্রিমূর্ত্তি, মহাদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেব-দেবিগণের তত্ত্ব ও কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়ার এবং প্রাইজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; আংশিকভাবে অভিনয়ও করা যায়। গ্রন্থশেষে শিব-স্তব এবং বাল্য-জীবন গঠনের বিবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাও সংবাদপত্রে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ ভাবে প্রশংসিত। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ৷৷০ আনা

৬। "করুণা-ধারা বা সংসার-রহস্য"।

মহাশক্তিময় ভগবানের এই সংসার-লীলা-চক্রটী একটী মহাবিদ্যালয় বা বিরাট্ শিক্ষাকেন্দ্র স্বরূপ; ইহাতে পশুত্ব মোচন সমৃদ্ধ জীবন এবং মুক্তির সন্ধান, এই তিনটী সার্ব্বভৌম বিভাগ বর্ত্তমান। শ্রীভগবানের করুণায় সাধারণ মানুষ, কিরূপে পশুত্বের নিম্নস্তর হইতে ক্রমোন্নতিতে মুক্তি লাভের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়া পরিশেষে ভগবদ্দর্শন, আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হন, এই পুস্তকে তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাগতিক দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অভিযোগ প্রভৃতি সমস্তই যে ভগবৎ করুণা; অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও যে ভগবানের বিশেষ করুণার পাত্র, ইহা প্রতিপন্ন এবং সাংসারিক নিত্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার মূলে যে সাধু মহা-পুরুষগণের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা এবং ভারতের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য, ভারত-দেহে মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীর চক্রময় পরিভ্রমণাদি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাও সংবাদ পত্রে ও শিক্ষিত সমাজে উচ্চ প্রশংসিত। আর্ট কাগজে মুদ্রিত, মূল্য ৷৷৵০ বার আনা।

আনন্দ বাজার পত্রিকা—"আত্মিক কল্যাণ ও পরমার্থিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে আর্য্যঋষিগণ মানবের জন্য যে চারি আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার অন্যতম সংসার আশ্রম। স্বামী যোগানন্দ আলোচিত সংসার-রহস্য পাঠে গৃহী মাত্রই উপকৃত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্ন লিখিয়াছেন—"এই পুস্তকে স্বামিজী যে অমৃত পরিপূর্ণ বিষয়াদির সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন এবং সংসার-লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করত জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতে পারিবেন।"

৭। "জয়গুরু কীর্ত্তন-মালা"—ইহা কবিতাকারে গ্রথিত অষ্টোত্তর শত "জয়গুরু" নাম যুক্ত পুস্তিকা। গুরুনাম এবং গুরুভাব অসম্প্রদায়িক; সুতরাং ইহা সকলেরই নিত্য পাঠ্য হওয়া উচিৎ। এতৎসহ চৌষট্টি মাতৃনাম-মালা সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারিটী আধুনিক গুরুকীর্ত্তন ও ভজন দ্বারা এই পুস্তিকাখানা অলঙ্কৃত। সর্ব্বত্র উচ্চ ভাবে গৃহীত ও প্রশংসিত মূল্য।০ চারি আনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

৮। "হরিদ্বারে কুম্ভমেলা" - (কুম্ভযোগ)—ইহাতে কুম্ভমেলা কি? ইহার প্রতিষ্ঠাতা কে? অমৃত-কুম্ভযোগ, এ বিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ, কুম্ভমেলার ইতিহাস প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও তথ্যে এই পুস্তকখানা পরিপূর্ণ। এতৎব্যতীত ১৩২১ সালে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল. তাহার ধারাবাহিক বিস্তৃত কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত। (তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য ১৲

৯। "অমিয় বাণী ও পূর্ণিমা-রহস্য"—প্রতি পূর্ণিমা উৎসবে পঠিতব্য অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও রহস্য সম্বলিত উপদেশাবলী—মূল্য ৶০

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী—

নানাকারণে এবং কাগজের অভাবে এপর্য্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই; তবে আশা করা যায়, শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে, যথা—

১০। "কীর্ত্তন পদ-রত্নাবলী" (গীতি নাটক)—ইহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস, মান ও মাথুর লীলার অন্তর্নিহিত রস এবং উহার সহিত মানবের সংসার-লীলার সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক নবভাবে গীতিনাট্যা-কারে লিখিত। প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলীর "আখর" যথাসাধ্য

বজায় রাখিয়া লীলা-তত্ত্বাদি উদ্ঘাটিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "নিমাই-সন্ন্যাসের" একটি গীতি নাটকও ইহাতে সন্নিবেশিত ; মূল্য—১৲ একটাকা

১১। **"অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অলৌকিক রহস্য"**—ইহাতে স্বামীজি ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক দৃষ্ট অনুভূতি ও অলৌকিক দর্শনাদি বর্ণিত। মূল্য ॥০ আনা।

১২। **"শিবরাত্রি-তত্ত্ব ও দোললীলা-রহস্য"**—মূল্য—॥০ (ছাপা যন্ত্রস্থ)।

১৩। **"সাধনার ক্রম ও সিদ্ধি।"**—ইহাতে বিভিন্ন সাধকগণের নানাপ্রকার সিদ্ধির বিবরণ, দৃষ্টান্ত সহ প্রদর্শিত হইয়াছে। (শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)। মূল্য ১॥০ টাকা

১৪। **"গুরু-শিষ্য সংবাদ"**—ইহাতে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও ভগবান সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা।

১৫। **"যোগানন্দ পত্রাবলী"** — শিষ্যগণের নিকট স্বামীজির লিখিত পত্রাবলী ও তদীয় গুরুদেবের লিখিত পত্রাবলী।

"SANATAN-DHARMA O MANAB-JIBAN".—It is an English translation from Swamiji's well renowned Bengali Book named—**"Sanatan Dharma O Manab-Jiban"**

গ্রন্থাবলীর বিশেষ প্রাপ্তিস্থান :—

(১) ভারত সাহিত্য ভবন ২০৩৷২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

(২) মহেশ লাইব্রেরী—২৷১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান—(১) যোগশ্রী-নিকেতন—৫৮ নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা (২) যোগানন্দ-কুটির—ময়মনসিংহ (৩) শান্তি আশ্রম—কাঁথি (মেদিনীপুর) এবং কলিকাতাস্থ হরিহর লাইব্রেরী, শ্রীগুরু লাইব্রেরী ; ডি, এম, লাইব্রেরী, সাধনা লাইব্রেরী, কার্ত্তিকচন্দ্র ধরের টাউন লাইব্রেরী প্রভৃতি এবং শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ বেরার দোকান, স্কুল বাজার (কাঁথি)।